বাংলার সামাজিক ডাকাতি
একটি প্রাথমিক প্রতিরোধ
১৭৫৭-১৭৯৩

রঞ্জিত সেন

অরুণা প্রকাশনী
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ, ১৩৯৭

প্রকাশক

শ্যামল ভট্টাচার্য্য
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

লেজার কম্পোজ ও মুদ্রণে

অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অনুবাদ ঃ শ্রীপ্রবীর রায়

সহযোগিতায় ঃ ডঃ রঞ্জিত সেন

প্রচ্ছদ ঃ লেখকের প্রয়াত অগ্রজ সুবীর সেনকৃত বাঁশপাতার কাজ
'বাংলার ডাকাত'

শ্রী প্রবীর রায়

অনুবাদকের মুখবন্ধ

মাতৃভাষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ আমাদের সামনে এলেও বিদেশী ভাষার ওপর দখল না থাকার জন্য আজও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্য অনেকেব কাছেই অজানা থেকে গিয়েছে। আর শুধু তা-ই বা কেন, আমার মনে হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে কোন বিষয়ের যতটা রসাস্বাদন করা যায়, জটিল বিষয়কে যতটা সহজে বোঝা যায় ততটা বোধ হয় আর কিছুতে সম্ভব হয় না। ছাত্রাবস্থায়, এমনকি আজও এই বোধটা আমাব মধ্যে তীব্রভাবে বর্তমান আছে আর সেই বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রঞ্জিত সেনের এই তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনার বঙ্গানুবাদের প্রয়াস। বিষয়টিকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। তবে সে চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে সুধী পাঠকেরাই তার শ্রেষ্ঠ বিচারক। তথ্যকে অবিকৃত রেখে বিষয়টিকে সহজ ও সরলভাবে পরিবেশন করে থাকতে পারলেই আমার এই প্রয়াসকে সার্থক বলে মনে করব। সর্বোপরি জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, যাঁর কাছ থেকে ইতিহাসের অনেক জটিল বিষয়কে সহজ করে জেনেছি, সেই স্বনামধন্য অধ্যাপক রঞ্জিত সেন মহাশয়ের আগ্রহ, অনুপ্রেরণা, আশীর্বাদ ও সাহায্য ছাড়া একাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হোত না; আমার চিন্তা বাস্তবায়িত হোত না। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

সূচিপত্র

ভূমিকা

ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক হওয়ার জন্য পাঠান, মোগল ও ইংরেজ শাসকরা সকলেই গ্রামকে রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এঁদের রাজস্ব-লোভ আর তা আদায়ের কৌশলের সঙ্গে গ্রাম্যজনের সুখ, সমৃদ্ধি এবং গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নটা জড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, গ্রাম-সমাজের গতি নির্ধারণে বড় ভূমিকা ছিল রাজস্বের। মোগলরা একথা জানতেন। তাঁদের আমলে রাজস্ব ও শাসন ক্ষমতাকে স্তরভিত্তিক শাসন কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানরত সম্রাট থেকে শুরু করে নীচের তলার জমিদার পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা রাজস্ব আদায় ও আঞ্চলিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, নিষ্কর জমি ও আবওয়াব নামের আড়ালে অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা দিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা শাসকদের প্রাপ্য রাজস্বটুকু পাঠিয়ে উদ্বৃত্ত অংশটুকু নিজেরা ভোগ করতেন। অহেতুক এঁদের কাজে হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁদের উচ্ছেদ করা হোত না। নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জমিদারেরা আবার নানান ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করতেন। এইভাবে মোগল আমলে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল যে শ্রেণীকাঠামো গড়ে উঠেছিল তারই সাহায্যে শাসকবর্গ একদিকে যেমন গ্রাম থেকে বহুদূরে প্রাসাদে বসেও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাসনকার্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতেন তেমনি সম্পদ আর ক্ষমতা লাভের দরুন তুষ্ট জমিদার শ্রেণীও নিজেদের মধ্যেকার সংঘাতকে এড়িয়ে চলতেন।

ইংরেজ শাসনকালে মোগলদের সৃষ্ট এই কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজস্বের তলানিটুকু পর্যন্ত গ্রাস করতে চেয়ে ইংরেজ শাসকেরা অহেতুক জমিদারদের কাজে বারবার হস্তক্ষেপ করেছেন, তাঁদের জমিদারিচ্যুত করেছেন, প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচনের নামে কর্মচারী সংখ্যা হ্রাস করেছেন। এইভাবে মোগল আমলের বিশ্বাসের ভিত্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে তার জায়গায় অবিশ্বাস দানা বেঁধেছিল। ইংরেজের কাজে জমিদার এবং তাঁদের অধস্তন কর্মচারী থেকে শুরু করে ভবঘুরে সন্ন্যাসী, চুয়াড়, সাধারণ মানুষ সকলের মনেই ক্ষোভ জমেছিল ধীরে ধীরে। আর সেজন্যই কখনো নিজেদের অধিকার রক্ষার তাগিদে কখনো বা বিদেশী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য জমিদার কিংবা তাঁদেরই কর্মচারীর নেতৃত্বে এইসব মানুষেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন— একবার নয়, বারবার। সরকারী অর্থ লুঠ হচ্ছিল, জমিদারদের নিজেদের মধ্যেও সংঘাত দেখা দিচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকের সরকারী চিঠি ও নথিপত্রে এ ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। ইংরেজ সরকার একে শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসাবে দেখেছিলেন। শক্তি প্রয়োগে তা দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের কাজে প্রতিরোধ আন্দোলনই জোরদার হয়েছিল। তবুও সমস্যার মূলে যে রাজস্বের প্রশ্ন সেটাই অনুচ্চারিত থেকে গিয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন চিঠি ও নথি থেকে প্রাপ্ত ঘটনার উল্লেখ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই তথ্যকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই তথ্যকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা হয়েছে

বাংলার ডাকাত বলে যাদের অভিহিত করা হয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত সমাজেরই বাসিন্দা—সমাজ সীমার বাইরে কোন সুস্থিত-জীবন-সংহারক ছিন্নমূল, আজব উপাদান নয়। বাংলার ডাকাত সমাজের বুকে লালিত এবং সমাজের দ্বারা তাড়িত; রাষ্ট্রিক শোষণকে সীমার মধ্যে বাঁধতে না পেরে তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। আঠারোশতকে বাংলার ডাকাতরা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ, কৃষক বা অন্য কেউ যাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে কেড়ে নেবার চেষ্টা হয়েছিল বিভিন্ন পর্বে। এই রাষ্ট্রিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করার সঙ্কল্প করেছিল তারা। পেশাগতভাবে তারা অভিনব কিন্তু ইতিহাসের অলিন্দে তারা অকারণ হিংসায় উদ্যত, উদ্বাহু বলে নিন্দিত। ডাকাত হিসাবে তারা নিন্দিত না সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিরোধ বিন্দুতে আত্মপ্রত্যয়শীল লড়াকু মানুষ বলে তা নন্দিত-সেই প্রশ্নই এখানে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

রঞ্জিত সেন

পূর্বকথা

ডাকাত হল এক বিরাট চরিত্র — 'a colossal figure' – যে কোন দেশে যে কোন সময়ে। ডাকাত কোথাও কোন বিশ্লেষণের ধার ধারে না কারণ সুশৃঙ্খলার বাইরে সে অরাজকতার দূত। তাকে নিয়ে কোন পরিমাপ হয় না কারণ নিয়মতান্ত্রিকতার পরপারে তার বাস। সমস্ত শুভবুদ্ধি আর বিচারকে সে স্তব্ধ করে দেয় কারণ যাবতীয় সামাজিক ন্যায়নীতির প্রান্তভাগে তার গোপন আস্তানা। অথচ সুস্থ, স্থিতিশীল, নিয়মতান্ত্রিক জীবনের মধ্যেই সে থাকে। সমাজের মধ্যেই তার আবাসভূমি। তা সত্ত্বেও তার অবস্থান শেষপর্যন্ত দৃশ্যমান ভূতলের নীচে কোন অদৃশ্য অপরাধের অলিন্দে, কোন পাতালমুখী বসুধায় যেখানে আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, নৈতিকতা — এককথায় সভ্যতার কোন দ্যুতিই পৌঁছায় না। আইনকে অস্বীকার করার সাহস তার আছে। আর আছে সমাজকে উপেক্ষা করার বেপরোয়া উদ্দীপনা। এটি কম কথা নয়। বাহুবল, অস্ত্রবল, কৌশল এই তিনের সঙ্গে সে যুক্ত করে অন্য একটি জিনিষ — তার মনোবল। সে হয়ে দাঁড়ায় দুর্জ্জেয়।

ডাকাত হচ্ছে এই রকম মানুষ — সামাজিক হয়েও সমাজ বহির্ভূত, মানুষ হয়েও অমানবিক, আইন মেনেও আইন লঙ্ঘনে উদ্যত, দুই বিপরীতের সমাহার। ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের যে নৈতিক দ্বন্দ্ব তাকে সমাজে প্রতিস্থাপন করে সে, আর এই প্রতিস্থাপনার মধ্য দিয়ে সে শুরু করে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লড়াই, ব্যষ্টির সঙ্গে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই ডাকাতকে দেয় তার কুহক। ডাকাতের জন্য মানুষের থাকে ঘৃণামিশ্রিত ভয়। কিন্তু কোন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকাতি সংঘটিত হলে আমরা মনের মধ্যে সম্ভ্রম পোষণ করি ডাকাতের জন্য — যেমন করতাম ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামী ডাকাতদের জন্য। মানুষের ইতিহাসে ন্যায়-অন্যায়ের চলমান ভারসাম্য যদি কোন মানববিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় তবে সে মানববিন্দু হল ডাকাত। ডাকাতের এই দ্বান্দ্বিক অস্তিত্বের কথা জেনেই আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে আমি ডাকাতদের নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করি। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার সাহিত্যে এবং বাঙালীর মানসলোকে ডাকাতের অবস্থান বড় ব্যাপক এবং স্থায়ী এ কথা জেনে বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে ডাকাতদের সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য জাগে। আমি ডাকাতদের জানতে চেয়েছিলাম একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। যেহেতু আঠারো শতকের বাংলা আমার গবেষণার বিষয় সেহেতু আমি এই প্রারম্ভিক ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে ডাকাতিকে বাংলার ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য ঘটনা হিসাবে দেখতে এবং বুঝতে চেয়েছিলাম। আমার এই বোঝার প্রয়াস থেকে ১৯১৮-র এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় আমার গ্রন্থ *Social Banditry in Bengal 1757-1793 : A Study in Primary Resistance*। ডাকাতি ইতিহাসের অন্য ঘটনাগুলি থেকে ভিন্ন — এটি থেমে থাকে না দেশের সীমায়। কালের গণ্ডি তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। ডাকাতি লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, প্রবঞ্চিত মানুষের মর্মবেদনার থেকে জন্ম নেয়। তার বীজ থাকে

অর্থনীতিতে, শিকড় প্রোথিত থাকে সমাজের প্রত্ন-গভীরে। তাই ডাকাত ধরা পড়লেও ডাকাতি থাকে ইতিহাসের অধরা ঘটনা হয়ে — দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। বুভুক্ষু মানুষ মেটাতে চায় তার ক্ষুধা, নিরন্ন মানুষ চায় তার আহার। নিরাশ্রয় মানুষ চায় আশ্রয়, সহায়হীন মানুষ গড়ে তুলতে চায় তার সম্বল। আর যে আয়হীন নিরুপায় সে দেখে আয়ের স্বপ্ন। কিন্তু আহার, আয়, সহায়, সম্বল কী পাওয়া যায় আইনের আশ্রয়ের বাইরে গিয়ে, সমাজ সুস্থিতির বাইরে থেকে, নৈতিকতার দাবিকে অস্বীকার করে? ডাকাত তা বোঝে না। ব্যর্থ আর প্রবঞ্চিত মানুষের রুদ্ধ আক্রোশে সে ভেঙ্গে দিতে চায় সমাজ। তাই আঠারো শতকে বাংলার ডাকাতি নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার পড়াশুনা চলতে লাগল সেই শতাব্দীর রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে। আসলে ১৯৬৭ সাল থেকেই আমার গবেষণা চলছিল আঠারো শতক নিয়ে — সর্বাঙ্গীনভাবে তার রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে — ডাকাতি ছিল তারই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এই গবেষণা থেকে পর পর প্রকাশিত হয়েছিল আমার কয়েকটি বই — আঠারো শতকের রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে রচিত হয়েছিল *The Metamorphosis of the Bengal Polity, 1700-1793*। একই শতাব্দীর অর্থনৈতিক শোষণ ও তার নীতিসমূহ নিয়ে রচিত হল দুটি বই — *Economics of Revenue Maninization in Bengal, 1757-1793* ও *Property, Aristocray and the Raj*। বাঙালী সমাজের অভ্যন্তরীন পরিবর্তন নিয়ে রচিত হল *New Elite and New Collaboration*। আমার এই সমস্ত আলোচনা একটা প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। সেই প্রেক্ষাপটে আমার *Social Banditry* গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।

একটি পূর্ণ শতাব্দীকে বোঝার চেষ্টা খুব দুরূহ। এই দুরূহ চেষ্টায় ১৯৬৭ সালে আমি একটি গবেষণা প্রজেক্টে হাত দিই। সেই প্রজেক্টের শিরোনাম ছিল — *The Growth of the British Power in Bengal and Its Impact on the Bengali Society*। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এই প্রজেক্টের কাজ শেষ করার জন্য যৎসামান্য অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন। ততদিনে আমার গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এইবার শুরু হল বই প্রকাশের পালা। আমার মত সাধারণ মানুষকে বই ছাপানোর অর্থ কে দেবে? দিল্লিতে অবস্থিত ভারতীয় ইতিহাস গবেষণার সংস্থা Indian Camil for Historical Research আমার Social Bonditry বইটি ছাপার জন্য কিছু অনুদান দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছেপেছিল আমার The Metamorphosis of Bengal Polity বইটি। নালন্দা পাবলিশার্সের কর্ণধার শ্রী অনন্ত ঘোষ ছেপে দিয়েছিলেন আমার Economics of Revenue Maximizations গ্রন্থটি। এর সঙ্গে সঙ্গে Papyrus থেকে প্রকাশিত হয় New Elite and New Collaboration বইটি। আর Firma K. L. Mukhopadhyay থেকে প্রকাশিত হয় আমার Understanding Indian History বইটি। এরপর বিদ্বৎসমাজে আঠারো শতক নিয়ে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ইতিহাস পঠন পাঠনে আমার Economics of Revenue Maximization অত্যন্ত জোর দিয়ে পড়ানো শুরু হয়। এরপর থেকে বাংলার ডাকাতির ইতিহাস বাংলার তথা ভারতের

প্রতিরোধ ইতিহাস চর্চার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। এর আগে বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক হবস্‌বম (Hobsbawm) ডাকাতি নিয়ে গবেষণা করে বিশ্বপাঠক সমাজকে বুঝিয়ে ছিলেন যে ডাকাতি একটা বিশ্ব ঐতিহাসিক ঘটনা, দেশ, কাল ও সমাজের অভ্যন্তরীণ বিবর্তনের সঙ্গে ডাকাতি হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাসের একটা চলমান ঘটনা। ১৯৬৭ সালে যখন গবেষণা শুরু করি তখন আমি ইতিহাসের বিষয় হিসাবে ডাকাতের গুরুত্বকে সম্যক বুঝতে পারিনি। পরে কলকাতায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানা বা লেখ্যাগারে (Archives) আঠারো শতকের ব্রিটিশ দলিল ও দস্তাবেজ দেখতে দেখতে বাংলা দেশে ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে ডাকাতির আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি আমার কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। এর পরে যখন হবস্‌বম-এর *Bandits* বইটি পড়ার সুযোগ পেলাম তখন ডাকাতির পার্সপেকটিভটি আমি বুঝতে পারলাম। ততদিনে ডাকাতি প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা দেশে ডাকাতি নিয়ে গবেষণা করতে করতে তার যে পার্সপেকটিভ আমি পেয়েছিলাম তা নিম্নরূপ।

কলকাতা শহর গড়ে উঠেছিল এক বিপজনক কোলাবরেশনের মধ্য দিয়ে (পঠিতব্য পুস্তক বর্তমান লেখকের *New Elite and New Collaboration*)। শেঠ বসাক ও তাদের মতো কিছু বৈশ্য বণিকের হাত ধরে এই কোলাবরেশন শুরু হলেও শেষপর্যন্ত তা রাজা নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, গোকুল ঘোষাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতার দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল। কলকাতায় গড়ে উঠেছিল আঠারো শতকের বিখ্যাত বেনিয়ানের (Banian) দল — যারা ছিল ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলির সাকরেদ — তাদের ব্যবসার ও বাণিজ্যের পুঁজির যোগানদার, তাদের হিসাবরক্ষক — এককথায় তাদের এজেন্ট, তাদের সহযোগী মিত্র। এরা বিদেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে পেয়েছিল অর্থ, আদায় করেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশভাগ, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল ইতিহাসের সক্রিয় সঞ্চালক শক্তি হিসাবে। আর এ সবের মধ্য দিয়ে তারা ইংরাজদের সাহায্য করেছিল কলকাতা নগরকে গড়ে তুলতে (পাঠিতব্য গ্রন্থ বর্তমান লেখকের *Calcutta in the Eighteenth Century, Vol. I* এবং *The Stagnating City : Calcutta in the Eighteenth Century*)। এর পরিবর্তে এই বেনিয়ান, মুন্সি, মুৎসুদ্দিরা ইংরাজ ও ইউরোপীয়দের দিয়েছিল তাদের সর্বস্ব — তাদের আর্থিক সহযোগিতা, তাদের শ্রম ও সময়, বৌদ্ধিক সরঞ্জাম এবং শেষপর্যন্ত তাদের আত্মসমর্পণ।

এই আত্মসমর্পণের যা বিপরীত তা হয়েছিল গ্রাম বাংলায়। সেখানে কৃষক ও ভূমিলগ্ন মানুষরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শোষণের মুখে বাংলার কৃষক বিদ্রোহ খুব অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ছিল না। এ কথা ঠিক যে দেবীসিংহের বিরুদ্ধে রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, শতাব্দীর শেষে মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহ কিংবা দীর্ঘসময় ধরে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ ছাড়া বড় মাপের কৃষক বিদ্রোহ বাংলাদেশে হয়নি। জমিদার, ঠিকাদার বা রাষ্ট্রের অন্য কোন এজেন্টের শোষণ মাত্রা ছাড়ালে কৃষকরা জোত-জমি ছেড়ে পালিয়ে

যেত। কৃষক পলায়নের এ ইতিহাস লিখেছেন অদিতি নাগ চৌধুরী জিলি। এই পলায়নের ঘটনাকে তিনি নাম দিয়েছেন — *Peasant Vagrancy* — *কৃষক ভ্রাম্যমানতা*। শোষণে শোষণে জর্জরিত কৃষক মাটির সঙ্গে তার শিকড় ছিন্ন করে উধাও হয়ে যেত ঠিকানাহীন ভিন গাঁয়ে। এইভাবে শুরু হয় তার পর্যটনশীল জীবন। তার অস্তিত্ব হীন থেকে হীনতর হতে থাকে। শেষপর্যন্ত কৃষক পরিণত হয় ক্ষেতমজুরে। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ঘটনা একটা রীতিমত নিয়মে পরিণত হয়েছিল। হান্টার যখন লেখেন যে ৩০০ থেকে ১০০০ মানুষ ডাকাতি করার জন্য বীরভূম থেকে নেমে আসছিল দক্ষিণবঙ্গে তখন সেই মানবস্রোতের মধ্যে এই ছিন্নমূল কৃষকের সংখ্যা ছিল বিপুল। এই সময়কার ইংরেজ দলিল পড়লে প্রায়ই দেখা যায় যে কৃষকরা দলবদ্ধভাবে কলকাতায় আসছে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কোন জমিদার, ঠিকাদার, সুপারভাইজার, কালেক্টর, আমিল ও সাজাওয়ালের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। এটিও কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের একটি রূপ। যে শোষিত কৃষক দিওয়ানা হয়ে ভিটে-মাটি ছাড়ল তার জমিকে ইংরেজ দলিলে 'পলাতকা' (*Palataka*) বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। যে কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কলকাতায় আসছে তাদের জমিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। 'পলাতকা' জমির থেকে খাজনা পাওয়া যেত না বলে সেই খাজনার সমান অর্থ জমিদারের বা ঠিকাদারের (farmers) দেয় রাজস্ব থেকে ছাড় দেওয়া হত। ছাড় পাওয়া যেত বলে জমিদাররা অনেক জমিকে 'পলাতকা' বলে দাগ মেড়ে তাদের দেয় রাজস্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইতেন। সরকার তা মানতে চাইতেন না। এ নিয়ে জমিদার ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ বেধে থাকত। কৃষকদের জমি থেকে পলায়ন ছিল কৃষক প্রতিরোধের একটি নঞর্থক দিক। এটি একটি নেতিবাচক প্রতিরোধ প্রথা। অন্যদিকে কলকাতায় এসে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করাটা হল প্রতিরোধের ইতিবাচক দিক। যে তথ্য গ্রাম বা জেলা থেকে শহর কলকাতার সদরে পৌঁছাত না তাকে সশরীরে বহন করে আনার মত সাহস, সামর্থ্য ও সংগঠন তৈরী করাটা একটি পশ্চাৎপদ গ্রাম্য অর্থনীতিতে কম কথা ছিল না। এ সাহস কৃষকরা অনেক সময়ে সরকারের কাজের মধ্য দিয়ে লাভ করত। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ হচ্ছিল; আর তৈরী হচ্ছিল ইটের নানা ধরনের বাড়ি। এটি ছিল নগরায়ণের প্রক্রিয়া। (*পঠিতব্য গ্রন্থ বর্তমান লেখকের The Stagnating City : Calcutta in the Eighteenth Century*)। এর জন্য দরকার ছিল বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের। এই শ্রমশক্তির যোগান আসত গ্রাম থেকে। ইংরেজ কালেক্টর, সুপারভাইসার, ফারমার বা ঠিকাদার, আমিল, জমিদার, সাজাওয়ালা, মজমুহদার, ওয়াদেদার, গোমস্তা এবং অন্যান্য এজেন্টদের দিয়ে গ্রামের কৃষকদের ধরে আনা হত কলকাতায়। অর্থাভাবে যে কৃষকরা ক্রমশ নিঃস্ব হত তারা প্রলুব্ধ হয়ে ঠিকাদারদের ফাঁদে পা দিত। ফলে গ্রাম থেকে কৃষকদের শহরে আসার একটা ধারা ইতিমধ্যেই তৈরী হচ্ছিল। এই ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক কলকাতায় আসত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে।

তাহলে আমরা কৃষক প্রতিরোধের তিনরকম ধারা দেখতে পাই — (১) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ধারা যেমনটি হয়েছিল রংপুরে দেবীসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বা মেদিনীপুরে পাইক ও

চুয়াড় বিদ্রোহে; (২) আইনের পথে সঙ্ঘবদ্ধ নালিশ জানানোর ধারা; (৩) জমিছেড়ে ভবঘুরে হওয়ার ধারা --- অর্থাৎ নেতিবাচক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টির ধারা। এর সঙ্গে প্রতিরোধের চতুর্থ ধারা হল ডাকাতি। গোপন সংগঠন ও সশস্ত্র আক্রমণের ধারা — সমাজবদ্ধ মানুষের অসামাজিক অভ্যুত্থানের ধারা যা একান্তভাবে গুপ্ত, প্রতিহিংসাপরায়ণ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি উদ্দিষ্ট, ভয়ানক এবং শেষপর্যন্ত আইনবদ্ধ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। এই চার রকম পদ্ধতিতে যে কৃষককুল, যে গ্রামের মানুষজন সংঘবদ্ধ হচ্ছে তারা কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের যে অস্তিত্ব চাপা পড়ে গিয়েছিল বিদেশী বণিক শাসনের জগদ্দল পাথরের নীচে, সেই অস্তিত্বের সর্বশেষ স্ফুরণ সশস্ত্র আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল গ্রামবাংলায়। ডাকাতির মূলকথা লুণ্ঠন। যার পেছনে থাকে আপাতভাবে অর্থের লালসা, কিন্তু অন্তরালে থাকে নিজের নিমজ্জমানতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বাসনা, মার খেয়ে পাল্টা মার দেওয়ার জেদ, অত্যাচারের গলা টিপে ধরার প্রতিহিংসা। ডাকাতের হাতে যে ধন লুণ্ঠিত হয় তা সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পদ। এই অর্থে ডাকাতি সমাজের উদ্বৃত্ত বণ্টনের এক বড় মাধ্যম। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাম থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হত তা গ্রামে ব্যয়িত হত না। তার অধিকাংশই চলে আসত শহরে — সদর কার্যালয়ে — এবং সেখান থেকে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। এটি ছিল গ্রাম থেকে সম্পদের একতরফা নিষ্কাশন (Unilateral Drain of Wealth)। অর্থাভাবে গ্রামবাংলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। জমিদাররা নিঃস্ব হচ্ছিল, অর্থের যোগানদার সরফরা (Saraf) ভেঙে পড়ছিল। রাষ্ট্রের ও জমিদারদের একসময়ের ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠদের কুঠিগুলি ধ্বসে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় নিরন্তর বেড়ে চলছিল সরকারের রাজস্ব লুঠের ঘটনা। এই লুণ্ঠিত রাজস্ব গ্রামেই থেকে যাচ্ছিল, কৃষিকাজে অর্থের চাহিদা মেটাচ্ছিল আর রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের বিপরীত দিক থেকে গড়ে তুলছিল অন্য এক সন্ত্রাস যার মধ্যে বিলীন মানুষের বিবশ অস্তিত্বের শেষ প্রতিরোধকে বহ্নিময় উদ্দীপন দেওয়ার চেষ্টা লুকিয়েছিল। এই অর্থে আঠারো শতকের ঔপনিবেশিক সময়ের ডাকতি এক অর্থবহ ঘটনা। কলকাতার এলিট সমাজের কোলাবরেশনে উনিশ শতকে বঙ্গীয় রেনেশাঁসের প্রস্তুতিপর্বে যখন নগর কলকাতার রোশনাই ফুটে উঠছিল একটু একটু করে ঠিক তখনই নির্বাপিতদীপ গ্রাম্য কুটিরে ফুটে উঠছিল শোষণের প্রতিরোধে জেগে ওঠার আত্মপ্রত্যয়। যারা রংপুরে দেবীসিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ জানিয়েছিল তাদের সমাজের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছিল আরও অসংখ্য বিদ্রোহী মানুষ যাদের নিরুচ্চ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে দলিতের সন্তাপ কোলাবরেশনের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছিল। মেদিনীপুরের বিদ্রোহী পাইক বা চুয়াড়, রংপুরের প্রতিরোধী কৃষক, রাজশাহী বা বাহারবন্ধের ডাকাত, দেশময় ছড়ানো সন্ন্যাসী আর ফকির — কেউ পৃথক মানুষ নয় — তারা একই মানুষের নানা রূপ — শোষণে জীর্ণ, বঞ্চনায় দীর্ণ, হতাশা-পরিকীর্ণ সেই মরিয়ার দল যারা নিজেদের অস্তিত্বের ভগ্ন অংশগুলিকে জোড়া দেওয়ার রসদ খুঁজছিল, দেখছিল মার খেয়ে পাল্টা মার দেওয়ার প্রত্যয়, আইনের লাঠির বদলে আইনভাঙার যষ্টি তাদের আছে কিনা। তাই অনেকদিন আগে আঠারো শতকে বাংলার ডাকাতদের সম্বন্ধে আমি যে কথা লিখেছিলাম সে কথা নীচে উদ্ধৃত করলাম — যে বিশ্বাস থেকে তা লিখেছিলাম এতবছর বাদে তার থেকে সরে আসার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

"... The study deals with Bengal's reactions which were opposite of collaboration. It was an assertion of Bengal's ownself and its outburst in violence within a general milieu of fragmented life and closing animation. Banditry in Bengal was this — a desperate assertion of one part of Bengal's society that refused to live on mortgage like the collaborators, the new elite that grew here under the patronage of the British."

"In the formative years of the British imperialism in Bengal attempts were made to extract the last dreg of social surplus from the soil. The result was catastrophic. A vast agrarian multitude, *zamindars, amlas, ryots, pykes, barkandazes*, etc. who lived in a society of mutual interdependence were suddenly squeezed tight against the margin of subsistence. The morbid contraction of economic solvency bred in the mind of the people a psychology of deprivation. Out of this emerged the urge on the part of the people to challenge the self assured, tribute-hungry and profit crazy rule of the Englishmen in Bengal and shake the pillars of complascence wherever that was possible. Banditry in Bengal in the eighteenth century was precisely this. It satisfied double passions class hatred and hatred against foreigners. Economically banditry represented as urge to cut short the unilateral British extration of wealth from the interior and thereby secure compensation for the society that had been deprived of its accustomed sources of living. Socially it represented an urge to regroup its identity debased by an alien rule. Politically it showed an urge to adjust the Bengal society with the ruling top in an antithetical balance of terror. Three points of banditry in Bengal were significant — the participation of men of all shades of life in it, the vast area over which it was rampant and the duration of the event as a persistant factor through decades heedless of the success of British imperialism on many other fronts. Banditry was certainly the most substantial expression of violence in the country in the second half of the eighteenth century. It showed mass coalescence at one level and popular self assertion on the other. At one end it was the anger of a mass for their blurred identity and on the other it was their passion released in search for a transparent one. But at no end banditry appeared to be only a sign of lawlessness as the British administrators of the time in Calcutta believed it to be."

উপরের যে বক্তব্য আমি ডাকাতির উপর আমার ইংরাজি গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলাম তারই নির্যাস আমার বর্তমান বাংলা বইতে প্রকাশ করেছি। আমার .বক্তব্য সঠিক কিনা ঐতিহাসিকরা বিচার করবেন। কিন্তু একজন মার্ক্সবাদী লেখক হিসাবে আমি আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার জনগণের রোষ ও হিংসাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত সেইভাবেই ব্যাখ্যা করেছি। তথ্যকে অবিকৃত রেখে এবং এতকালের অনাবিষ্কৃত নতুন তথ্যকে পাঠক

১৮ শতকে বাংলাদেশের চৌকিদার

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

ও গবেষকদের সামনে উপস্থিত করে আমি চেষ্টা করেছি দূরে থাকতে। তথ্যই তার কথা বলবে — জনগণের জীবনের তথ্য জনগণের জীবনের কথাই বলবে — এই বিশ্বাস নিয়ে আমি নির্লিপ্ত থেকেছি। তবে প্রশ্ন ওঠে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক হিসাবে আমার ভূমিকা কী? আমার ভূমিকা খুব সরল — বিষয় নির্বাচনে, তথ্যের অনুসন্ধানে. বক্তব্যের অগ্রপশ্চাৎ পরম্পরার সোপান নির্মাণে এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী এবং পরবর্তীকালের বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের প্রচারের দূষণ থেকে স্বচ্ছ ইতিহাসের সংরক্ষণে আমি মার্ক্সবাদের সচেতন হাতিয়ার রূপে কাজ করেছি। আমার ভূমিকা এইটুকু। আমার নিষ্ঠা যে আলস্যের সঙ্গে আপোষ করেনি, আমার জীবনের নাম-যশ-অর্থ-খ্যাতির অলক্ষ্য প্রলোভন যে ঐতিহাসিক হিসাবে আমার দায়বদ্ধতার উপর থাবা বসাতে পারেনি তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। ইতিহাসের ধারা অমোঘ, তার গতি বিচিত্র, তার লক্ষ্য নিশ্চিত। একটি সময়কালের মধ্যে একটি ছোট মানবগোষ্ঠীর যন্ত্রণা ও উদ্দীপনা তার অস্তিত্বের কোন সংগোপন বিকাশের রূপ নেয় তা বুঝবার জন্য আমি বাংলার ইতিহাসে ডাকাতিকে নজির রূপে গ্রহণ করেছি। ডাকাতির মধ্যে আছে সমাজ-বিপন্নতার ও বিপন্ন মানুষের প্রতিরোধের কাহিনী। এই কাহিনী এই গ্রন্থে আলোচিত হল।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন অনেকে। শ্রী প্রবীর রায় — আমার সুযোগ্য ছাত্র — আমার ইংরাজি বই থেকে প্রায় আক্ষরিক অর্থে আমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনূদিত হওয়ার পর স্থানে স্থানে আমি তার সংস্কার করেছি মাত্র। তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা, সাধনার প্রতি আনুগত্য — এ সব মানবিক গুণাবলী আজ বহুক্ষেত্রে অপসৃয়মান। আমি প্রবীরকে ধন্যবাদ দিই। তিনি শিক্ষক, শিক্ষকের ছাত্র শিক্ষক-শিক্ষকতার পরম্পরায় তিনি অভিনিবিষ্ট একজন শিক্ষক। এই গৌরবের অধিকারী বলেই তিনি একটি কঠিন ইংরাজি বইয়ের বঙ্গানুবাদ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রয়াস অভিনন্দিত হোক এই আশা প্রকাশ করি। এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য এবং অরুণা প্রকাশনীর কর্মচারীবৃন্দের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁদের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা এবং একটি দুরূহ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করার ও ছাপার যে অধ্যাবসায় তাঁরা দেখিয়েছেন তা আমার প্রতিমুহূর্তের পাথেয় হয়েছিল। আমার স্ত্রী ডঃ স্নিগ্ধা সেন আমার গবেষণার যাবতীয় পরিশ্রমের অংশীদার, আমার সকল রচনার দিবারাত্রের পাহারাদার, আমার সমস্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠের সমালোচক ও সমঝদার — অতএব আমার ছোট-বড় সব সাফল্যের ভাগিদারও তিনি। যখন সহধর্মিণী সহকর্মিণী হন তখন তাঁকে আর আলাদা করে ধন্যবাদ জানানোর অবকাশ থাকে না।

প্রস্তাবনা

বাংলার গ্রামঞ্চলে ডাকাতি ঃ অষ্টাদশ শতকের একটি সামাজিক প্রতিরোধ*

অনেক বছর আগে *Social Banditry In Bengal* নামে একটি বই আমি লিখেছিলাম। তারপর থেকে এই গবেষণার ধারা বন্ধ হয়নি। নানা দিকে, নানা খাতে তা প্রবাহিত হয়েছে। সেখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে একদল মানুষ সারা বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণের মধ্যে থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে কিভাবে এক বিপরীত প্রতিক্রিয়াকে গড়ে তুলেছিল, রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা এক বিপ্রতীপ সন্ত্রাস তারা তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। আমি মনে কবি মানুষের জীবনে এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন সে জীবনমৃত্যুর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে বাঁচতে চায়, প্রবল শক্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেচায়, প্রতিপক্ষকে পাল্টা আঘাত করে, প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করে সে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়। যেমন ব্যক্তিমানুষের জীবনে, ঠিক তেমনই জাতির জীবনে একই ঘটনা ঘটে। শাসন ও শোষণে নিষ্পেষিত জাতির অন্তরে জাগে ঘুরে দাঁড়োনোর বাসনা, যুথবদ্ধতার অটল অঙ্গীকারকে নিজের শোণিত ধারার মধ্যে বহন করে সে নিজের অস্তিত্বের নিশানকে পুনরায় তুলে ধরতে চায়। ঠিক এমনটিই ঘটেছিল বাংলায়, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

সিরাজের প্রতিরোধ যখন ধূলিসাৎ হল, মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদদের চক্রান্তে যখন ধসে গেল স্বাধীন বাংলার সার্বভৌমত্ব, এমন কি যখন মীরকাসিমের কামান হার মানল ঘেরিয়া বা বক্সারের যুদ্ধে, তখন সেই মুহূর্তে বাংলার মাটিকে যারা দুর্জয় ঘাঁটি হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল, তারা ছিল নগণ্য মানুষ, নিরন্ন মানুষ। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারীর মধ্যেও তারা নিজেদের ধূলিমলিন অস্তিত্বকে রণরক্ত সফলতায় টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ইংরেজদের নথিপত্রে তারা পরিচিত 'ডাকাত' নামে, ওয়ারেন হেস্টিংস যাদের বলেছিলেন — 'Lawless Banditti'। কর্নেল স্লীম্যান (Sleeman) যখন ঠগীদের দমন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন — ভারতবর্ষের ডাকাতরা ইংরেজ ডাকাতদের মতো নয়। এরা অন্যরকম। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'কমিটি অব্ সার্কিট' বলছে বাংলার এই ডাকাতরা একেবারে অন্য ধরনের, সারা পৃথিবীর অন্য ডাকাতদের সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই চলে না। কেন চলে না? তার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে অন্য জায়গার ডাকতরা এই পেশাকে বেছে নেয় বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন বাঁচবার আর কোন আশা থাকে না, জীবিকার ভিন্ন কোন পথ থাকে না, তখনই তারা ডাকাত হয়। আর এখানে ডাকাত পুরুষানুক্রমে ডাকাত হয়, যেন একটি পুরুষানুক্রমিক জাতি — যাদের বলা হচ্ছে 'Race of Robbers'. এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে আরও নানান শব্দ — 'যথেচ্ছাচারী' (Lawless), 'অপরাধ জগতের

বাসিন্দা' (Denizens of the Underworld), *They are constantly in a state of warfare against the Government* নিরন্তর তারা সরকারের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অঘোষিত কিন্তু চলমান যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তার সঙ্গে আরও বলা হচ্ছে যে, শুধু তারা নয়, তাদের পরিবার, বংশ, প্রতিবেশী সকলেই এই ডাকাতির মাধ্যমে সংগঠিত লুটকে, লুটের সম্পদকে নিজেদের সম্পদ বলে জেনে নিয়েছে এবং বুঝে গেছে এভাবেই বাঁচতে হবে। কর্নেল স্লীম্যানের বক্তব্যে আছে, যে ঠগীদের তিনি দমন করেন সেই ঠগীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি নাকি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, সেই সব ডাকাতদের চোখ চিক্‌চিক্‌ করছে। কেন করছে? আসলে তারা তাদের স্মৃতি-স্মরণ করছে, সেই সমস্ত সুন্দর সুন্দর ডাকাতির মুহূর্ত তাদের মনে পড়ছে, যখন তারা বেরিয়ে পড়ে ডাকাতি করত, মানুষ খুন করত, নিয়ে আসত বিপুল সম্পদ। সেই সমস্ত স্মৃতিকে মনে করে তারা উল্লসিত হচ্ছে আবার যুগপৎভাবে দুঃখিতও হচ্ছে যে, ঐ সব মুহূর্ত ইংরেজ শাসনে আর ফিরে আসবে না। অর্থাৎ ইংরেজ শাসন আইন প্রতিষ্ঠা করেছে, 'Robbers'-কে নিশ্চিহ্ন করেছে। চমৎকার! ১৭৭২-এর 'কমিটি অব্ সার্কিট' থেকে শুরু করে ওয়ারেন হেস্টিংস — সকলেরই এক কথা। হান্টার লিখেছেন (*Annals of Rural Bengal*) বীরভূমের বিপুল সংখ্যক ডাকাত নেমে আসছে, উত্তর ও মধ্যবঙ্গ থেকে নেমে আসছে দক্ষিণবঙ্গে, তাদের সংখ্যা কোথাও ৩০০, কোথাও ৪০০, কোথাও বা ১০০০। যশোরের 'কালেক্টর' বলছেন যশোরের চারপাশে ১০০ মাইল এলাকায় ডাকাতরা তাদের রাজত্ব কায়েম করেছে। মালদা থেকে চার্লস গ্রান্ট লিখছেন—

> *এই কয়েকদিন আগে আমাদের এখানে কুঠি লুঠ হয়ে গেল, বিরাট চৌকির ব্যবস্থা করেছিলাম, করেছিলাম বিরাট প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও। কোন নিরাপত্তাই টিকল না, কি করে আমাদের মালখানা থেকে ডাকাতরা মাল লুঠ করে নিয়ে গেল তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়!*

রাজসাহী থেকে খবর আসছে দুর্ধর্ষ ডাকাতির। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আসছিল কলকাতায়। রানী ভবানীর মালখানায় (Strong-room of the Treasury) তা পাহারায় রাখা হয়েছিল। সেই মালখানা ভেঙ্গে রাতের অন্ধকারে সমস্ত রাজস্ব চুরি হয়ে গেল, লোপাট হয়ে গেল। বিশাল এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাশী চালানো হল। বহুলোককে ধরা হয়েছিল। কারা ছিল তাদের মধ্যে? ছিল ব্রাহ্মণ থেকে লঙ্কা বিক্রেতা, ছোট ব্যবসায়ী পর্যন্ত সকলে, উৎখাত হয়ে যাওয়া বরকন্দাজ, জমিদারের অধস্তন আমলা, ছিল নিজামত থেকে হটে যাওয়া মুৎসুদ্দি। দেখা গেল সম্মিলিতভাবে এরা দীর্ঘদিন ধরে চক্রান্ত করেছে, যে রাস্তা দিয়ে রাজস্ব যাতায়াত করে সেই রাস্তাকে তারা দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে জাল পেতেছে, যে খবর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কাছেও এসে পৌঁছয়নি। এদেরই বলা হচ্ছে 'Lawless banditti'; একেই বলা হচ্ছে ডাকাতি।

ডাকাতরা যা করেছে তাকে আমি মহৎ বলছি না। আমি এমনও বলছি না যে ডাকাতি মানুষের একটা জীবিকা হতে পারে বা হওয়া উচিত। আবার ডাকাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এমনটিও আমি ভাবি না যে, কোম্পানি যে শাসনকাঠামো তৈরি করেছিল তার সমস্তটাই ভুল। কিন্তু কোম্পানি আমলে শাসকরা যে সন্ত্রাসকে ওপর থেকে নামিয়ে এনেছিল সে সন্ত্রাসকে দু-এককথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। তার উপর প্রতি দশকে একটা করে আকাল, দুর্ভিক্ষ। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে অর্থনীতি কায়েম হয়েছিল তার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একটাই, যা আমি আমার *Economics of Revenue Maximisation* বইতে দেখিয়েছি—সামাজিক উদ্বৃত্তের শেষ বিন্দুটুকু নিঃশেষে আত্মসাৎ করে নেবে এবং নিয়েছে কোম্পানি। ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কোথাও কোন সামাজিক উদ্বৃত্ত থাকবে না, গ্রামে থাকবে না, শহরেও থাকবে না। নবাবী আমলে শোষণেরও একটা ব্যাপ্তি ছিল ঠিকই। কিন্তু একটি কথা মাথায় রাখতে হবে, তা হল নবাবরা এখানে থাকতেন। শোষিত অর্থ দেশের বাইরে যেত না। যদুনাথ সরকার[১] ও এস. ভট্টাচার্য্য[২] দেখিয়েছেন—অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বছরে একবার করে টাকা-পয়সার মারাত্মক একটা সঙ্কট দেখা দিত। যেমন মুর্শিদকুলী খাঁর সময় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পরিমাণ (আনুমানিক) সোনা-রূপা দিল্লীতে যেত। এর ফলে সাত থেকে দশদিন বাজারে টাকা থাকত না। জনগণের হাতে পয়সা নেই, তাই লেনদেন বন্ধ, বাজারহাট বন্ধ, কারণ টাঁকশালে মুদ্রা তৈরির মত যথেষ্ট সোনা-রূপা নেই। সাত থেকে পনের দিনের মধ্যেই ইউরোপীয় কোম্পানির কোন জাহাজে সোনা-রূপা এল, আবার টাকাও যথারীতি তৈরি হল। কিন্তু কোম্পানির শাসন যে সঙ্কট তৈরি করল তার ফলে গ্রামঞ্চল সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে গেল। কিভাবে এটা হল?

প্রথমেই বলা যেতে পারে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা। এর ফলে বিপুল পরিমাণ চাষীর খাজনা বাড়ল। নবাবী আমলে দেখা গেছে একজন বড় কৃষকের জমির পরিমাণ ছিল চার থেকে পাঁচ একর। ছোট কৃষকের আর একটু কম। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে চরম অবস্থায় একজন কৃষককে খাজনা দিতে হত আট আনা, কোম্পানির আমলে তা দাঁড়ায় এক থেকে দুই টাকায়, কখনও কখনও তা আরও ওপরে ওঠে। কিন্তু কথা হল যে যুগে দুই থেকে চার আনায় একটা পরিবারের সারা মাস চলে যেত, টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেত সেই যুগে এই পরিমাণ খাজনা কৃষকরা কোত্থেকে দেবে? আর এত খাজনা দেওয়ার পর কি থাকবে তাদের হাতে?

দ্বিতীয়ত, বলা যায়—নিষ্কর জমির উপরে কর বসেছিল। হেস্টিংস লিখছেন—

> *আমি খবর পেলাম যে মেদিনীপুরে পাইক বিদ্রোহ হচ্ছে, কারণ হল চাকরান জমি আমরা পরিমাপ করে ফেলেছি। চাকরান জমি আমরা কেড়ে নিয়েছি, ফলে পাইকদের বিদ্রোহ হচ্ছে।*

পাইকদের ডাকা হল। সে পাইক কারা? তারা হল 'চুয়াড় পাইক'। কোম্পানির শাসকরা বললেন খাজনা দিতে। তারা বলল—

খাজনা! কিসের খাজনা? আমরা যোদ্ধার জাত, হুজুর ডাকলে লড়াই করি, আমাদের বাবা-ঠাকুর্দারা কেউই খাজনা দেয়নি। এই জিনিসটাই আমরা জানি না. কোত্থেকে দেব?

কিন্তু কোম্পানি এতে সন্তুষ্ট হওয়ার নয়, তারা শোষণ-পীড়ন অব্যাহত রাখল. শেষ-পর্যন্ত এর ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষে এই নিয়ে শুরু হল পাইক বিদ্রোহ।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট প্রয়োজনে অর্থ জোগাত যে সরফরা তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল। তাহলে খাজনা বাড়ল, শিবোত্তর, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর থেকে শুরু করে যাবতীয় নিষ্কর জমি চলে গেল, ধর্মাধিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ হল, সরফরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। গ্রামাঞ্চলে টাকা তাহলে কোত্থেকে আসবে? স্ক্র্যাফটন লিখছেন যে, আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি ধারা চালু হয়—প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজারা বা জমিদাররা যার যেটুকু টাকা ছিল সবটাই কোলকাতায় পাঠিয়ে দিতে লাগল এবং কোলকাতায় জমি কিনতে লাগল। প্রদীপ সিংহের *Calcutta in Urban History* বইয়ের অর্ধাংশ জুড়ে আছে সেই সব কথা, সেই সব নথি—এক একজন রাজা বা জমিদার কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ জমি কিনেছেন. ভূসম্পত্তি বাড়ীঘর কিনেছেন।

গ্রাম থেকে সম্পদের বহির্নিষ্কাশন হচ্ছে, গ্রামে কিছুই ফিরে আসছে না। এই অবস্থায় কৃষিকাজ চলবে কি করে? মোগল আমলে 'তাকাভি' (taqavi) ঋণ দেওয়া হত। সেদিন আর নেই, মোগল আমলে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, আকাল হলে যে ছাড় দেওয়া হত তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা তাদের যে নিজস্ব জীবিকা তা থেকে তাদের উৎখাত করা হচ্ছে। সকলেরই জানা আছে এখানে যে বিপুল পরিমাণ জমিদার ও নিজামতের বরকন্দাজদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তাদের একটি বিরাট অংশ চলে গিয়েছিল আসামে এবং সেখানকার ইতিহাসে বরকন্দাজদের এই চলে যাওয়াটা একটা বড় ঘটনা। সুতরাং এই যে যাদের হাতে লাঠি আছে. অস্ত্র আছে আর যাদের হাতে নেই—তারাও, পাইক, রাজপুত (কর্নওয়ালিসের কাছে খবর আসছে রাজপুতরাও ডাকাতি করছে), মুৎসুদ্দি, ছোট ব্যবসায়ী সকলেই—সম্মিলিতভাবে এই জীবিকাচ্যুত নিরন্ন, ছিন্নমূল মানুষেরা একত্রিত হল, গ্রাম সমাজের যে বন্ধনটা ছিল সেই বন্ধনটাই এবার কাজে লাগল ভিন্নভাবে। নতুনভাবে তারা দানা বাঁধল, কে তাদের নেতৃত্ব দিল? হেস্টিংসের কাছে খবর আছে জমিদাররা এর নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে। কিন্তু কোন জমিদারই ডাকাতির খবর দিচ্ছে না। জেলায় নিজেদের লোকজনের মাধ্যমে হেস্টিংস এই খবর পেতেন। আসল কথা জমিদাররা খবর দেবেন কিভাবে? এই মহিষাদলের রাজারই বেতনভুক ডাকাত ছিল। সরকারী প্রতিবেদন বলছে বিশেষ বিশেষ সময়ে এই ডাকাতদের ছেড়ে দেওয়া হত। হেস্টিংস লিখছেন যখন এই রাজারা রাজস্ব দিতে পারত না তখন আমরা সাজাওয়াল পাঠাতাম। এই খবর অবশ্য ওদের কোলকাতায় থাকা গুপ্তচররা আগেই রাজাদের দিয়ে দিত। রাজা তখন মেদিনীপুর থেকে কোলকাতার পুরো পথটাতে এই ডাকাতদের ছেড়ে দিত। মহিষাদল, বীরকুল—এরকম সব নাম করে দেওয়া আছে। বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার তো এই ডাকাতদেব আলাদা বাড়িঘরই

দিয়ে দিয়েছিল। এরা কি ডাকাত? জমিদাররা এদের পুষত কেন? এর দু'টি কারণ। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বর্ধমান ও বীরভূম রাজাদের দখলে থাকা ডাকাতদের কথা। মজাটা হল বর্ধমানের রাজা যে ডাকাতদের পুষতেন তারা বর্ধমানে ডাকাতি করত না। ডাকাতদের অঞ্চল ভাগ করা ছিল। সব ডাকাত সব জায়গায় কাজ করত না। বর্ধমানের ডাকতরা চলে যেত বীরভূমে। বীরভূমের মূল এলাকাগুলোতে তারা ডাকাতি করত না। যেখানে ডাকাতি করলে রাজার অসুবিধা হবে সেখানে তারা ডাকাতি করত না। আবার বীরভূমের ডাকতরা চলে যেত বর্ধমানে। যখন বীরভূমে ডাকাতি হত তখন বীরভূমের রাজা কোম্পানিকে বলতেন যে তার জমিদারিতে এই পরিমাণ ডাকাতি হয়েছে। প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়েছে অতএব তার পক্ষে রাজস্ব দেওয়া সম্ভব নয়। পরের বার হয়ত বর্ধমানের রাজা আবার একই কথাই বলছেন। আবার ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আলিগহর (তখনও দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম হননি) যখন বিহার পর্যন্ত এলেন, তখন মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমানের রাজারা একযোগে তাকে সাহায্য করেছিল। আর এই ডাকাতরাই তখন 'পিয়ন' হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ কাগজপত্র বলছে এই 'পিয়ন'রা পরবর্তী দশবছর জমিদারদের পোষ্য ডাকাত হিসাবে কাজ করেছিল। আসল কথা একটা সুসংগঠিত সন্ত্রাসকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল গ্রামবাংলা। তাব কারণ শহর বাংলা তখন আত্মসমর্পণ করেছে, শহর কোলকাতার নবকুমাররা, নবকৃষ্ণ, গোকুল ঘোষাল, কান্তবাবুরা নিজেদের তখন বন্ধক দিয়ে দিয়েছে, সাম্রাজ্যের সহযোগী কোলাবরেটর (Collaborator) হয়ে গেছে, সেখান থেকে প্রতিরোধ গড়ে উঠবার কোন সম্ভাবনা নেই। বিকল্প প্রতিরোধের ক্ষেত্রটা গড়ে উঠছে গ্রামবাংলায়। এই প্রতিরোধটা আত্মপ্রকাশ করেছে অর্থনৈতিক শোষণের প্রেক্ষিত থেকে।

ডাকাতি সংক্রান্ত তত্ত্বের মূল জায়গা হল এই যে, ডাকাতির দ্বারা দু'টি বাসনা, বা দুটি আবেগ (Passion) পরিতৃপ্ত হয়েছিল। একটি হল শ্রেণী ঘৃণা 'Class Hatred', আর একটি হল ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা 'Hatred against the English'. বহু জায়গায় এই ডাকাতরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে জমিদারের বিরুদ্ধে, মহাজনদের বিরুদ্ধে, যারা অত্যাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে, আবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে। হয় তাদের মালখানা, না হয় তাদের কাছারি আক্রমণ করছে, বা এক-দু'জন ইংরেজ পেলেই খুন করেছে। যেমন বাখরগঞ্জে খুন করেছিল রোজাকে, যোগীগোপায় খুন করেছে ব্রিটিশ রাজপুরুষ পার্সেলকে। একটা সময় কোলকাতা ও গ্রামাঞ্চলের বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিজেদের কোন লোক থাকবে কিনা সে ব্যাপারেই ইংরেজরা ভীত হয়ে পড়ল। এলাকা ভাগ করে দিল ইংরেজরা. কয়েকটা এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়ে নিজেদের বিশেষ খাতিরের লোককে সেখানে পাঠাতে নিষেধ করল। এর মধ্যে একটা অঞ্চল ছিল এই মেদিনীপুর থেকে কোলকাতার রাস্তাটা, আর একটা ছিল কোলকাতার গঙ্গানদীর চারপাশটা। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বলছে খুব সতর্কভাবে এখানে লোক পাঠাবে।

সবশেষে বলি এই ডাকাতরা এক সামাজিক প্রতিরোধের ধারা তৈরি করেছে। আমি বলিনি যে ডাকাতি একটি মহৎ কাজ। আসলে ইতিহাসের বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ

মুহূর্তে বিকল্প জীবিকা হিসাবে আমাদের বাংলাদেশে ডাকাতির উদ্ভব হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যখন অবনমিত হচ্ছে, তখন তারা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, জীবন-মৃত্যুর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের বাঁচার অধিকারকে, অস্তিত্বের সার্বভৌমত্বকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। আর তা করেছে বলেই শুধু হেস্টিংসের সময় নয়, উনবিংশ শতকের শেষে গিয়েও দেখেছি ভূপেন্দ্রনাথ বোস বলছেন উফ! কি ডাকাতি! ইংরেজ শাসনও এদের নির্মূল করতে পারল না। তাহলে ডাকাতিটা বাংলাদেশে একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা, একটা স্থায়ী সন্ত্রাস। ডাকাতি শেষপর্যন্ত মানুষের বেঁচে থাকার উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে যে পরিস্থিতিতে আর বেঁচে থাকার বিকল্প পথ নেই, ইতিহাস যখন ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না সেই ঘুরে দাঁড়াতে না পারার ইতিহাসকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে ডাকাতরা। এখানেই তাদের ভূমিকা, এখানেই তাদের গুরুত্ব।

(১) Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II. Dacca University Publication.

(২) S. Bhattacharya. *The East India Company and the Economy of Bengal.*

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দসংক্ষেপ

ABBREVIATION

BOR— Board of Reveune

CC— Committee of Circuit

CCR— Controlling Council of Revenue

Dist.— District

GG— Governor General

Prodgs— Proceedings

Rev.— Revenue

BPP— *Bengal Past and Present*

CPC— *Calendar of Persian Correspondence*

[referred to in terms of letter number and volume number]

Fifth Report— *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report*

HB— *History of Bengal, Vol. II*, ed. by Sir Jadunath Sarkar and published by the Dacca University

LCBR— *Letter Copy Books of the Resident at the Durbar at Murshidabad*

[referred to in terms of the volume number]

Mid. Dist. Recds.— *Midnapore District Records*

[referred to in terms of the volume number]

MR— *Midnapore Letters Received 1777-1800*

[*West Bengal District Records New Series edited by J. C. Sengupta and Sanat Kumar Bose.*]

MRR— *Miscellaneous Revenue Records*

[referred to in terms of the catalogue number available in the catalogue of records of the West Bengal State Archives, Calcutta, for example *Miscellaneous Revenue Records Number 95*]

Mid. Sal. Pap— *Midnapur Salt Papers*

[referred to in terms of the date of letters received and issued]

Jud. (Crim) Prodgs— *Judicial Criminal Proceedings*

[referred to in terms of the date of the proceedings]

Prodgs. BOR— *Proceedings of the Board of Revenue*

[referred to in terms of the date of the proceedings]

Prodgs CC— *Proceedings of the Committee of Circuit*

[referred to in terms of the place of sitting of the Committee and the date of proceedings]

Prodgs. CCR— *Proceedings of the Controlling Council of Revenue at Murshidabad*

[referred to in terms of the date of the proceedings]

Rev. Jud. Prodgs— *Revenue Judicial Proceedings*

[referred to in terms of the date of the proceedings]

Reflections— *Reflections on the government etc. Indostan etc.* by Scrafton

Rung. Dist. Recds.— *Rungpore District Records*

[referred to in terms of the volume number]

Seir— *Seir-ul-Mutakharin*

Selections— *Selections from Unpublished Records,* ed. by James Long

[referred to in terms of the date of the proceedings]

প্রথম অধ্যায়
ডাকাত

ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়ার পর্বের সরকারী কাগজপত্রগুলো ডাকাত কাহিনীতে ভরে আছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের উত্থানের সঙ্গে তারই সমান্তরাল শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবার পর সরকারীভাবে নানান নামে ভূষিত হয়ে এরাই গড়ে তুলেছিল এক চতুর, পলায়নপটু, বিশাল, অধরা গোষ্ঠী। মোগলদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার সময় মোরল্যাণ্ড এদের নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ খুব বেশী পাননি।[১] অথচ ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়ার দিককার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে উইলিযাম কে কিন্তু পুরো একটা অধ্যায়[২] জুড়েই এদের কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। কাজেই এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার প্রায় সমকালেই বিপুল সংখ্যায় এইসব মানুষদেরও উদ্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশে ডাকাতদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে হেস্টিংস আর কর্ণওয়ালিস কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে লর্ড মিন্টো লিখেছিলেন 'দেশবাসীর ওপর এদের ভয়াবহ কর্তৃত্বের কথা'।[৩] আর দু'দশক পরে ডাকাত নিধনে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে বাধ্য হয়েছিলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তবে এ পর্যন্ত দলিল, দস্তাবেজ, সরকারী কার্যবিবরণী আর স্মারকলিপিতে ছড়িয়ে থাকা ইংরেজের সরকারী ধারণাটা অবশ্য বিধিবদ্ধ রূপ পেতে আরও কয়েকটা বছর সময়ের প্রয়োজন ছিল।[৪]

সুতরাং হেস্টিংসের সময় থেকে বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত ডাকাতরা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছে একটা স্থায়ী আলোচনার বিষয় ও আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় ধরে গঙ্গানদীর উচ্চ ও নিম্ন উভয় অববাহিকা অঞ্চলেই এইসব ডাকাতেরা ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বড় বড় ভারতীয় রাজ্যগুলো ধরা দিয়েছিল অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফাঁদে। আর ভারতীয় প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছিল ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই। তবুও কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিজয়রথের এই অগ্রগমনকে উপেক্ষা করে ভয়ঙ্করভাবে ও বিপুল সংখ্যায় মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল চতুর, ছায়াময়, প্রত্যাঘাত-দক্ষ ভারতীয় ডাকাতের দল।

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হোল শুধুমাত্র বাংলার ডাকাত। সময়কাল হোল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার কয়েকটা বছর। অর্থাৎ পূর্ব ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য দৃঢ়মূল হওয়ার কাল। আমাদের এই আলোচনা মুখ্যত তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবে — (১) ডাকাতদের সম্পর্কে ইংরেজের সরকারী মনোভাব এবং পরবর্তী পর্বের অ-ভারতীয় ঐতিহাসিকদের চিন্তাধারা। (২) ডাকাতদের কর্মক্ষেত্র। (৩) ডাকাতদলের গঠন ও প্রকৃতি।

(১) ডাকাতদের সম্পর্কে ইংরেজের সরকারী মনোভাব

ডাকাতদের সম্পর্কে ইংরেজের সরকারী মনোভাবের প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছরেই কাশিমবাজার থেকে 'কমিটি অফ সার্কিট' জানিয়েছিল যে, "বাংলার ডাকাতেরা ইংলণ্ডের দস্যুদের মতন নয়। সেখানে আকস্মিক প্রয়োজনের তাগিদে ব্যক্তিবিশেষ এ রকম বেপরোয়া কাজের পথে চালিত হয়। এখানে এরা পেশায় এবং এমনকি জন্মসূত্রেও ডাকাত। এরা এক নিয়মিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এদের পরিবারবর্গ এদের আনা লুণ্ঠিত দ্রব্যের সাহায্যেই জীবনধারণ করে থাকে।"[৮] এরা সকলে একই রকম। এই দুরাত্মারা সরকারের বিরুদ্ধে যুযুধান থাকার ফলে আইনের সবরকম সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিল।

কাজেই এদেশে একজনের ডাকাতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করাটা কোন দুর্গত অবস্থার পরিণতি নয়। উত্তর ভারতের একজন হিন্দুস্থানী ডাকাতের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনকে লিপিবদ্ধ করার সময় কর্ণেল স্লীম্যানের একজন সহকারী ক্যাপ্টেন ডব্লু. এম. র‍্যামজেও বোধ হয় এটাকেই বেশ জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন — "আমার কাছে যেটা সত্যিই খুব কৌতূহলজনক ছিল সেটা হল যে সেই অভিযান সম্বন্ধে কথা বলার সময় তাদের চোখ আনন্দে চক্‌চক্‌ করে উঠছিল আর তারা তাদের কপালে ও বক্ষে করাঘাত করছিল এবং মৃদুস্বরে কিছু বলছিল, এই ধরনের আনন্দদায়ক কাজে আর কখনই তাদের অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না এটা এখন নিশ্চিত হওয়ায় তারা তাদের মন্দভাগ্যের জন্য বিলাপ করছিল।"[৯]

সুতরাং ইংরেজের চোখে ডাকিতাটা ছিল এমনই এক সম্প্রদায়গত ও আনন্দদায়ক বৃত্তি যার ওপর মানুষ পুরুষানুক্রমে নির্ভর করেছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তো সুস্পষ্টভাবেই এইসব ডাকাতদের পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত সমাজের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে জীবনধারণের রসদ সংগ্রহকারী দস্যুকুল বলে অভিহিত করেছেন[১]। কাজেই ইংরেজ শাসকদের চোখে বাংলার ডাকাতরা ছিল এমনই সব মানুষ যারা দৈবক্রমে কিংবা আকস্মিক ঘটনার বদলে বংশগতবৃত্তির টানেই দলবদ্ধ ডাকাতে পরিণত হয়েছিল। গ্রাম সমাজের কৃষকদের মতন এদেরও বন্ধনটা ছিল সম্প্রদায়গত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এবং নিপুণতা গুণে এরা দেশের এক অখণ্ড সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সমাজতত্ত্ববিদেরা প্রায়ই যেসব নিষ্ঠুর সামাজিক শক্তিগুলোকে দস্যুবৃত্তির সঙ্গে জড়িত বলে নির্দেশ করে থাকেন, কোন ইংরেজ শাসকই কিন্তু সেসব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেননি। ডাকাতেরা, তা সে বাংলারই হোক আর চম্বলেরই হোক, একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে ইংরেজের এই ধারণাটাই আজকের দিনের ঐতিহাসিকদের মধ্যেও থেকে গিয়েছে এবং সে কারণেই দেশের ডাকাতদের বাস্তব বা বস্তুগত মূল্যায়নও উপেক্ষিত হয়েছে।

ভাগ্যবিড়ম্বিত এইসব মানুষদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনটা ছিল কঠোরভাবে সরকারী চিন্তাধারারই অনুবর্তী। বহুদিন আগে, ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দেই এদের সম্বন্ধে কে লিখেছিলেন ঃ "সে সময় এটা দেখা গিয়েছিল যে, ডাকাতিটা ছিল এই পেশায় বেড়ে ওঠা সমস্ত উপজাতিগুলোর কাছেই এক সাধারণ ব্যাপার, ভারতবর্ষে যেমন সৈনিক শ্রেণী বা লেখক শ্রেণী ছিল ঠিক তেমনিই ছিল দস্যু শ্রেণী এবং ঐসব মানুষেরা কঠোর ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বলিদান করে আর কেবলমাত্র নিয়তি নির্দেশিত কর্মসম্পাদন ও আরাধ্য দেবতার মঙ্গলাচরণ করছে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নিজ সমাজভুক্ত লোকজনের সম্পত্তি ও প্রয়োজনে তাদের জীবনের উপরও আক্রমণ চালাত"।[৮]

কে'র পবে হান্টাব এই বলে ডাকাতদের বর্ণনা করেছিলেন ঃ "অসংখ্য ও সমৃদ্ধশালী গোষ্ঠী যারা বংশগত জীবিকা হিসাবেই ডাকাতিকে অবলম্বন করেছে"।[৯] নিজেব বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাব সরকারী সাক্ষ্য প্রমাণ[১০] এবং ধারণাকে উদ্ধৃত করেছেন। এই সরকারী ধারণাকেই মেনে নিয়েছিলেন ফারমিঙ্গারও।[১১] আবার, পরবর্তী পর্বের সকল অ-ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাই ডাকাতদের দেখেছেন 'ধর্মপ্রাণ ঠগী' হিসাবে। এ্যাঙ্গাস মাডিসন ছিলেন এইসব ঐতিহাসিকদেরই সর্বশেষ প্রতিনিধি।[১২] ডাকাতদের সম্বন্ধে সম্ভাব্য দুর্বলতার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে দু'জন ঐতিহাসিক জানিয়েছিলেন "ডাকাতেরা এমন মানুষ যাদের জন্য আমাদের করুণা দেখানোর দরকার নেই"।[১৩] প্রথম থেকেই ইংরেজ শাসকেরা ডাকাতিকে শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসাবেই দেখেছিলেন। তখন চুয়াড়, সন্ন্যাসী, কৃষক আর ভেঙ্গে দেওয়া দেশীয় সৈন্যদল ইত্যাদি সকলকে বোঝাতেই নির্বিচারে 'অরাজক দস্যু' শব্দটা ব্যবহার করা হোত। জেলা থেকে খবর যেত কলকাতায়, সেখানে শাসকেরা দেশের সাধারণ অরাজক অবস্থা যাকে তাঁরা প্রাচ্যের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জের হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তাকে নিয়ে আলোচনা করতেন।

ভারতীয় ডাকাতদের 'শঠ ও ঘৃণ্য দস্যু' বলে একবার মেনে নেবার পর তাদের প্রতি ইসলামিক আইন সিদ্ধ করুণা বা উদারতা দেখাবার চিন্তাটাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে চুরির সঙ্গে নরহত্যার প্রশ্ন জড়িত নয়, মুসলমান শাসকদের আইনের গ্রন্থ পবিত্র কোরাণ সেখানে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়নি।[১৩ক] এই শরিয়তী বিধানকে ছাড়িয়ে গিয়ে হেস্টিংস[১৩খ] আদেশ দিয়েছিলেন যে, ডাকাতদের তাদের গ্রামেই ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে, তাদের পরিবারবর্গকে রাষ্ট্রে দাসে পরিণত করতে হবে এবং তাদের গ্রামের ওপর জরিমানা ধার্য করতে হবে।[১৪] আবার দেশের থানাদারী ব্যবস্থার জন্য অর্থ দিতে জনগণকে কিভাবে বাধ্য করা হবে সে সম্বন্ধে তাঁর কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য কর্ণওয়ালিস জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশ দিয়েছিলেন।[১৫] কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত পুলিশী ব্যবস্থা তার

লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। আর সেজন্যই এক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হিসাবে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা, ঢাকা আর মুর্শিদাবাদ ডিভিশনে একজন করে পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট[১৬] নিয়োগ করা হয়েছিল। "শান্তিকে সুনিশ্চিত করা এবং বিশেষ করে ডাকাতদলের অনুসন্ধান এবং গ্রেপ্তারের জন্য ব্যাপকতর ও ঐক্যবদ্ধ অভিযানের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্যই এই পদ সৃষ্টি হয়েছিল।"[১৭] এই পদে আসীন সুপারিন্টেডেন্ট নিজেই ২৪ পরগণার শাসকের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন জেলা ও নগর শাসকদের সমান উচ্চতর ফৌজদারী কর্তৃত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এই সুপারিন্টেডেন্ট পদটা এতই কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছিল যে, ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে পাটনা, বেনারস এবং বেরিলী ডিভিসনেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছিল। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, একই ধরনের ব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য অংশ্যেও গৃহীত হয়েছিল। তবে কর্ণওয়ালিসের পুলিশী ব্যবস্থা অবশ্য ডাকাত আর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ওয়েলেসলি।[১৮] আর বাংলার ঘটনার পুনরাবৃত্তিকে রোধ করার জন্য ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মাদ্রাজে এক পুলিশ কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নটা কোর্ট অফ ডিরেকটর্স নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ঐ বছরেই আবার ভারতবর্ষে কোম্পানী অধিকৃত অঞ্চলসমূহের বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য এক বিশেষ কমিটিও তাঁরা গঠন করেছিলেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে এ বিষয়ে তাঁরা এক আদেশ জারী করেছিলেন।[১৮ক] দীর্ঘকাল ধরেই থানার দারোগারা ছিলেন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। প্রশাসনিক স্তরে এরকম একটা বিশ্বাস ব্যাপকভাবেই গড়ে উঠেছিল যে, দারোগাদের সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগ থাকার জন্যই তাদের দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কাজেই কোর্ট অফ ডিরেকটর্সও দারোগা আর তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের ওপর দোষারাপ করে প্রাচীন গ্রামীণ পুলিশী ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন। ডিরেকটরদের সুপারিশ বাস্তবরূপ পেয়েছিল ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের একাদশ মাদ্রাজ রেগুলেশনে (Madras Regulation XI of 1816)। তাছাড়াও তাঁদের সুপারিশ কার্যকরী হয়েছিল বোম্বাইতে, প্রধানত দেশের প্রাচীন প্রথার ওপর ভিত্তি করেই ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের দ্বাদশ রেগুলেশন সেখানে পুলিশী ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছিল।[১৯]

কাজেই এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ডাকাতদের প্রতি ইংরেজের সাধারণ মনোভাবটা ছিল বাংলাদেশ থেকে পাওয়া তাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতারই ফসল। আর এই অভিজ্ঞতাই কোর্ট অফ ডিরেকটর্স হয়ে অপরাপর প্রেসিডেন্সীগুলোতে সঞ্চারিত হয়। অন্যান্য স্থানীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে উনিশ শতকে এই বোধ ডাকাত সমস্যা সম্বন্ধে যে মনোভাবকে গড়ে তুলেছিল তাকে ইঙ্গ-ভারতীয় মনোভাব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে পড়ে। প্রথমত, কর্নেল স্লীম্যানের ঠগীদমনের এবং উত্তর ভারতে

হিন্দুস্থানে ডাকাতদের অনুসন্ধানরত ইংরেজ লেখকদের রচনায় ডাকাতদের মনস্তাত্ত্বিক আচরণ এবং তাদের বৃত্তির অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার বহু আগে থেকেই এ রকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় ডাকাতেরা দারিদ্র্যের বদলে বংশগত বৃত্তির টানেই ডাকাতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য অংশের ডাকাতদের সঙ্গে তাদের কোনও মিল ছিল না। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত বাংলার পুলিশী ব্যবস্থা ব্যর্থ হবার পর ইংরেজ শাসকেরা প্রধানত বংশগতভাবে নিয়োজিত ও গ্রাম প্রধানদের নির্দেশে চালিত গ্রামের চৌকিদার, জেলার তহশীলদার এবং প্রদেশের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে দেশের প্রাচীন পুলিশী ব্যবস্থাতেই ফিরে গিয়েছিলেন। তবে তহশীলদারদের অবশ্য নির্দিষ্ট কোন একটামাত্র দায়িত্ব না দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সমভাবে রাজস্ব অথবা পুলিশী কাজে তাদের লাগান হয়েছিল।

প্রাচীন পুলিশী ব্যবস্থায় এই প্রত্যাবর্তনটা ছিল খুবই কৌতূহলজনক। বাংলাদেশে ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে ইংবেজ নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। প্রারম্ভিক অসুবিধার পর তারা সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রে প্রাচীন জমিদারী ব্যবস্থার মৌলিক নীতকেই ফিরিয়ে এনেছিলেন। আবার একইভাবে বাংলাদেশে নতুন পুলিশী ব্যবস্থা ব্যর্থ হবার পরও তাঁরা দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাতেই ফিরে গিয়েছিলেন। এটা মেনে নেবার পর এখন প্রশ্ন ওঠে ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে গড়ে ওঠা দেশের রাজস্ব ও পুলিশী ব্যবস্থা সম্পর্কে ইংরেজের ধারণা যদি পুরোপুরি ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয় তবে অত আগে, ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে, ভারতীয় ডাকাতদের সম্বন্ধে ইংরেজ প্রশাসনের মূল্যায়নকে কি নিশ্চিতভাবেই সঠিক বলা যেতে পারে? সরকারী নথিতে 'ডাকাতি' নামে পরিচিত এই বিরাট সমস্যার অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে শাসকবর্গ কি অবহিত ছিলেন না? অবহিত তাঁরা যে অবশ্যই ছিলেন তার অজস্র প্রমাণ তো ঔপনিবেশিক দলিলেই রয়েছে যার মধ্যে থেকে দু'টোর উল্লেখ আমরা এখানে করব। বহুদিন আগে, সেই ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দেই, রাজশাহীর সুপারভাইজার বাউটন রাউস রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে (Controlling Counil of Revenue) লিখেছিলেন ঃ "পরগণাগুলো থেকে আমি লোকজন কর্তৃক গ্রামে বারংবার গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে থাকি, এদের দুর্গতিই এদের এধরনের হতাশাব্যঞ্জক ও পাপ কর্মে প্ররোচিত করে। বহু সংখ্যক কৃষক, যারা ইতিপূর্বে প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিল, নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য তারা এই চরম কেপরোয়া পথের আশ্রয় নিয়েছে।"[২০]

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল এক চিঠিতে হেস্টিংস মন্তব্য করেছিলেন ঃ "ডাকাতদের বিরুদ্ধে গ্রাম এবং বৃহত্তর জেলাগুলো পাহারার জন্য থানাদার এবং পাইকদের দেওয়া জমি বা চাকরান জমি ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বহু মানুষ তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেদের ডাকাতে পরিণত করেছে।"[২১]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ নীতি সমাজে যে ভীষণ দুর্গতিকে ডেকে এনেছিল সে সম্বন্ধে ইংরেজরা আমাদের আলোচ্যকালের সমস্ত সময়টা ধরেই কিছুটা সচেতন ছিল। ইংরেজের নামে অনুষ্ঠিত এ ধরনের বহু অত্যাচারের উল্লেখ অনেক লেখার মধ্যে হেস্টিংস নিজেই করেছেন। আবার হেস্টিংসের শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে সমভাবে ধবংসের পথে নামিয়ে এনেছিল এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই ফ্রান্সিস ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ঃ "মানুষের সমস্ত শ্রেণীকে বিশৃঙ্খল ও অপদস্থ করে এটা (হেস্টিংসেব শাসনব্যবস্থা) উচ্চতমকে নিম্নতমের নীতি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করেছে"।[২২]

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনোভাবটি ছিল তিক্ত। এমনকি যিনি বহু ব্যাপারে ইংরেজের প্রশংসা করেছিলেন সেই সিয়ার-উল-মুতাখেরিনের লেখক গুলাম হুসেনও নিষ্ঠুর উৎপীড়নের জন্য তাদের সমালোচনা করেছিলেন।[২৩]

এখন এটাই যদি সত্যি হয় যে, বাংলাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেওয়া কিছু কিছু অবিচারের বিষয়ে সামাজিক ও প্রশাসনিক সচেতনতা ছিল তবে কেন সরকারী নথিতে অতি স্পষ্ট একটা বিষয়ের অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আরও দুটো বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে হবে — (১) ডাকাতদের কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ তাদের সম্প্রদায়ের ব্যাপকতা এবং (২) ডাকাতদলের গঠন ও প্রকৃতি অর্থাৎ সমাজে তারা কতদূর প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

(২) ডাকাতদের কাজের এলাকা

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে শুরু করে বেন্টিঙ্কের কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ডাকাতিটা ভীষণভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় এমন একটা জেলাও ছিল না যেখানে সশস্ত্র মানুষজনের উদ্ভব আর সমাজকে উপেক্ষা করে তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়নি। সমকালীন সরকারী নথিতে এর অজস্র প্রমাণ থাকলেও এখানে দু'একটির উদাহরণ দেওয়া হোল। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে পূর্ণিয়া থেকে পাওয়া রিপোর্টে এমন সব মানুষজনের উল্লেখ করা হয়েছিল 'যারা সংখ্যায় অগণ্য এবং দীর্ঘদিন ধরে আইনকে প্রকাশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে বেঁচে আছে'।[২৪] যশোরের ডাকাতেরা 'ইংরেজ এবং কোম্পানীর সিপাইদের আক্রমণ করার মতন যথেষ্ট সাহসী' ছিল।[২৫] হুগলীতে 'বিভিন্ন গ্রামের পাহারাকে অগ্রাহ্য করে ডাকাতেরা বিপুল সংখ্যায় ঘুরে বেড়াত।'[২৬] ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বাখরগঞ্জের কাছে মিঃ রোজ নামে জনৈক ইংরেজ ডাকাতের হাতে নিহত হয়েছিলেন।[২৭] ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা কাউন্সিল লিখেছিলেন ঃ "সন্ন্যাসী

বা ফকির নামে পরিচিত একদল আইন অমান্যকারী দস্যু বহুকাল ধরেই এইসব দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"[২৮] সে সময়কার সাধারণ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রেগ লিখেছিলেন ঃ "কলকাতা ছাড়া বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার আর কোথাও বিচার অথবা আইন কিংবা জীবন বা সম্পত্তির পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বলে কোন কিছু ছিল না"।[২৯] তবে কলকাতাও যে বাদ পড়েছিল এমনও নয়। বাস্তিদ লিখেছিলেন ঃ "হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসের আমলে এবং তারপরেও অনেকদিন ধরে ডাকাতি আর রাজপথ রাহাজানির মতন অপরাধ শাসনকেন্দ্রের কাছেই অতিমাত্রায় অনুষ্ঠিত হোত"।[৩০] ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের কলকাতার পত্রিকাগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের এক মাইলের মধ্যেকার অঞ্চলের অবস্থাটা ছিল এইরকম ঃ

"বৈঠকখানা বৃক্ষের দিকে যাওয়া রাস্তার ধারের দেশীয় বাসিন্দারা সাধারণভাবে ডাকাতের ভয়ে এতই ভীত যে, রাত্রি আটটা বা ন'টা থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে তারা তাদের পলতেওয়ালা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ে . . . . সন্ধ্যা আটটাতেই ডাকাতদের বিশ, তিরিশ অথবা চল্লিশজনের দল কলকাতার কাছের বিভিন্ন রাস্তায় প্রকাশ্যেই চলাফেরা করে।"[৩১]

কাজেই দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সীমান্ত জেলাগুলোতেই নয়, নগর কলকাতাতেও ডাকাতেরা ইংরেজের আইন-শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তিন-চার দশক ধরে এইসব মানুষেরা বাংলাদেশে তাদের কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তাদের সম্বন্ধে মিন্টো লিখেছিলেন ঃ "যা ছিল ফরাসী রিপাবলিকান শক্তির ভিত্তি ঠিক তারই মতন এক পূর্ণাঙ্গ সন্ত্রাসবাদ এরা গড়ে তুলেছিল, আর সত্যি বলতে কি, জনগণের কাছ থেকে তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তার উপযোগী সামান্যতম সাহায্য পাওয়ার মতন যথেষ্ট কর্তৃত্ব কিংবা প্রভাব যখন প্রকৃত শাসকদের ছিল না তখন ডাকাতদের সর্দার এবং দলনায়কেরাই সেই মর্যাদা পেত, এমন কি হকিম বা শাসক বলেও তারা অভিহিত হত।"[৩২]

অথবা

"এইসব ব্যবস্থার দ্বারা ডাকাতেরা এই সমস্ত জেলায় এমন এক শক্তিশালী ও দক্ষ শাসন গড়ে তুলেছিল যে, তারা বিভিন্ন বাড়ী ও পরিবারগুলোর কাছে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষের যথাযথ তালিকা দিয়ে একজন মাত্র বার্তাবাহককে গ্রামগুলোতে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পাঠাতে পারত — কাউকে দিতে হোত শস্য, কাউকে গবাদি পশুর খাদ্য, কাউকে ঘোড়া, দলে যোগ দেবার জন্য কারও বা দু'জন ছেলে, কারোকে লুণ্ঠিত দ্রব্য বা মশাল বহনের জন্য শ্রমিক কিংবা চরের কাজ করার জন্য লোক; দলের সেবার জন্য কারোকে বা পাঠাতে হত স্ত্রী বা কন্যা।"[৩৩]

এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, ডাকাতেরা দেশে এক সুগঠিত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। এই সন্ত্রাসটা ছিল ব্যাপক সামাজিক হিংসা (violence) যাতে সাধারণভাবে গোটা সমাজটাই জড়িয়ে পড়েছিল। ডাকাতেরা তাদের নিজস্ব এমন এক রাজত্ব কায়েম করেছিল যেখানে তাদের সর্দারেরা সাধারণভাবে জনগণ কর্তৃক 'হাকিম' বলে অভিহিত হোত—এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, এর পিছনে একটা সাধারণ সামাজিক অনুমোদন ছিল আর সত্যি বলতে কি এটা ছাড়া একটা ডাকাতরাজ কায়েম হতেও পারত না। তাদের প্রভুত্বটা ছিল সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়া এক প্রচ্ছন্ন সন্ত্রাস যা দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্ট সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে বিপরীতমুখী অন্য এক সন্ত্রাসের ভারসাম্য গড়ে তুলেছিল। সন্ন্যাসীরা রঙপুর থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পরিভ্রমণের এলাকা গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে চুয়াড়রা দেশের পশ্চিম অংশে ব্রিটিশ রাজকে অগ্রাহ্য করেছিল। হান্টার যদি বীরভূমে ডাকাতদের অস্তিত্বের কথা বলেন তবে যশোরে তাদের অবস্থানের কথা জানান ওয়েস্টল্যাণ্ড; আবার যদি ফারমিঙ্গার মেদিনীপুর আর রঙপুরে তাদের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন তবে বাখরগঞ্জে তাদের অস্তিত্বের খবর দেন বেভেরিজ। তবে যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হোল বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিকেরা এইসব এলাকাগুলোকে বর্ণনা করেছেন গোলমালের বিচ্ছিন্ন কেন্দ্র হিসাবে। এখন যেহেতু ইংরাজ-কথিত বংশগতবৃত্তিকে অবলম্বন করে ডাকাতেরা সমাজে একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল এমনটা কোথাও দেখা যায়নি সেহেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইন মান্যকারী প্রজাদের সঙ্গে হিংসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী পরম্পরাগত এই আইনবর্হির্ভূতদের সত্যিই কোন গৃহযুদ্ধ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে একজনের মনে সন্দেহ দেখা দিতেই পারে।

(৩) ডাকাতদলের প্রকৃতি এবং গঠন

নানান ধরনের মানুষদের নিয়ে ডাকাতদল গঠিত হোত। জাতিগতভাবে আদিম উপজাতি চুয়াড় থেকে অসাধারণ যোদ্ধৃ জাতি রাজপুত পর্যন্ত নানান ধরনের মানুষ ছিল তারা। তাছাড়া তারা এসেছিল বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের মধ্যে থেকেও। পাইক, বরকন্দাজ, কৃষক, মহাজন, গ্রাম্য মোড়ল, সর্দার, ভবঘুরে, ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুক. বেদে, ছোট তালুকদার, মাঝারি জমিদার সকলেই ডাকাত দলকে স্ফীত করে তুলেছিল। এইসব মানুষদের মধ্যে চুয়াড়রা প্রথম থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তারা ছিল একাধারে কৃষক এবং যোদ্ধা দুইই ঃ "পাহাড়ের এইদিককার চুয়াড় প্রজারা এসেছে এবং তারা তাদের খাজনা ঠিক করতে আগ্রহী আছে"।[৩৪]

"যা ছিল চিরপ্রচলিত আমি তাদের তা দিতে আদেশ দিয়েছিলাম। তারা আমাকে বল্ল যে তারা যোদ্ধা এবং কৃষক নয়। তাই তারা কখনই কোনরকম রাজস্ব দেয়নি কিন্তু যখনই ডাক পড়েছে তারা যুদ্ধের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত থেকেছে . . ."[৩৫]

চুয়াড়রা ছাড়াও ছিল জমিদারদের সৈন্য রাজপুতেরা : "জমিদারদের আশ্রিত রাউতপোক (রাজপুত) নামক একদল মানুষ . এখন গ্রামগুলো লুঠ করে . . . .।"[৩৬] বা "একদল রাজাপুতও আছে যারা একই পরগণায় বিসগঞ্জ নামক গ্রামগুলোতে বাস করে, যারা — একই কৌশল অনুসরণ করে . . . তারা রাজস্ব দেয় না এবং এই প্রদেশ ও পাচেৎ দুটোই লুঠ করে।"[৩৭]

নথিগুলোতে আমরা প্রায়ই ডাকাত হিসাবে পাইক আর বরকন্দাজনদের উল্লেখ দেখি :

"সব থেকে ক্ষতিকর প্রবণতার মধ্যে . . . যা প্রতিকারের জন্য উচ্চ দাবী রাখে, তা হচ্ছে এখানে রাখা পাইকের সংখ্যা, তারা বিনা বেতনে কাজ করে এবং যাদের ওপর তাবা প্রতিষ্ঠিত সেই অসুখী ক্লেশভোগী মানুষদের কাছ থেকে যা সংগ্রহ করতে পারে তারই ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কবে নিজেদের ভরণপোষণ চালায়।"[৩৮]

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ডাকাতেরা ছিল সাধারণ মানুষ। রঙপুরের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল :

" . . . আমি বিশ্বাস করি ডাকাতেরা হচ্ছে এমন মানুষ যারা দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষক হিসাবে বাস করে।"[৩৯]

দিনাজপুর থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে "ফকির, ডাকাত এবং অন্যান্য আইন অমান্যকারী মানুষদের" দ্বারাই লুণ্ঠন কার্য সঙ্ঘটিত হয়েছিল।[৪০] তবে এটা বিবেচনা করা দরকার যে ফকিরদের সঙ্গে ডাকাতদের এবং ডাকাতদের সঙ্গে অন্যান্য আইন অমান্যকারী মানুষদের তফাৎ আছে। সাধারণভাবে ফকিরেরা ছিল মোটামুটি ভাল মানুষ যারা তেজারতী কারবারের সাহায্যেই জীবিকা নির্বাহ করত।[৪১] দিনের কৃষকই যে রাতে ডাকাত হয় ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে সে খবর দিয়েছিল রঙপুরের ফৌজদার। আবার গ্রামের চৌকিদাররা যে ডাকাত হোত তার প্রমাণ আমরা পাই নিম্নোক্ত বিবৃতির মধ্যে :

"বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী সে (চৌকিদার) কোন চোরের দলের সঙ্গে যুক্ত থাকত এবং চৌকিদার হিসাবে তার নিয়োগটা ছিল প্রকৃতপক্ষে এমনই একটা ব্যবস্থা যার দ্বারা গ্রামবাসীরা শত্রুপক্ষের একজনকে কিনে নিয়ে আক্রমণের হাত থেকে আংশিক মুক্তি নিশ্চিত করেছিল।"[৪২]

এটা পরিষ্কার যে সমস্ত পেশার মানুষদের মধ্যে থেকেই ডাকাতেরা এসেছিল। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগত দেশগত ও বৃত্তিগত দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যের অধিকারী নানান ধরনের একদল মানুষ সাধারণ সমাজের বাইরে একটা স্বতন্ত্র লোকসমাজ গড়ে তুলতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে অতিরিক্ত কোন জনসংখ্যা ছিল না।

যে প্রজন্ম আলিবর্দি খানের আমলে জীবিত ছিল এবং পলাশী ও বক্সারকে কাটিয়ে উঠেছিল ১৭৭০-এর মন্বন্তরে তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর মন্বন্তরের পরিণতিতে সৃষ্ট প্রজন্ম সাবালকত্ব পেয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ এমন একটা সময় যখন লর্ড মিন্টো বাংলাদেশে তথাকথিত ডাকাতরাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। এর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং উত্তর ভারতের কিছু অংশে সক্রিয় থাকা ভারতীয় ডাকাতদের সাধারণ কাহিনীর সঙ্গে বাংলার ডাকাতদের কাহিনী মিশে গিয়েছিল আর তার ফলেই আমরা দেখেছি যে মনরো, এলফিনস্টোন এবং বেন্টিঙ্কের দীর্ঘ আমলে ইংরেজ প্রশাসনকে অনেক বিষয়ের সঙ্গে ভারত জোড়া ডাকাতি সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামাতে হয়েছিল।

এখন ডাকাতিটা যদি সমাজে দৃঢ়মূলই হয়ে থাকে তবে কি জন্যে ইংরেজ এই ব্যাপক সামাজিক বিষয়টার অপব্যাখ্যা করেছিল, তাদের ডাকাত বলে কালিমালিপ্ত করেছিল? বাংলাদেশে ডাকাতিটা যে কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না ইংরেজ শাসকদের প্রথম প্রজন্ম তা জানতেন। সমাজের প্রতিটি স্তরের এবং প্রতিটি পেশার মানুষের মধ্যে এর আকর্ষণ ও সংযোগ থাকায় এটা এমন একটা ব্যাপক সামাজিক বৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল যার সঙ্গে ধনী, নির্ধন সকলেরই সংযোগ ছিল। এমন কি কোম্পানীর কর্মচারী এবং সেনাবাহিনীও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন ঃ

"বহু জায়গায় ফৌজদার, আমিল, এবং কোম্পানীর বাহিনী জনগণের অসহায়তার সুযোগ নিত এবং তাদের নিষ্ঠুরতা ও জুলুমের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।"[৪৩]

জেলা স্তরে প্রশাসকেরা ডাকাতদের প্রকৃতি এবং তাদের কাজের ধারা ও গতি সম্বন্ধে যথাযথ সচেতনতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার কেন্দ্রীয় প্রশাসন জেলাগুলো থেকে পাওয়া যে কোন তথ্যেরই অর্থ বিকৃত করেছিল বলে কলকাতার প্রশাসন এবং জেলাগুলোতে ছড়িয়ে থাকা তার প্রশাখাগুলোর মধ্যেকার এক সূক্ষ্ম বিরোধ সমকালীন সরকারী নথিগুলোতে চোখে পড়ে। যশোর থেকে একশ মাইল এলাকা জুড়ে ডাকাতেরা তাদের প্রভুত্ব গড়ে তুলেছিল যেখানে ইংরেজ শক্তি কোনরকম ছাপ ফেলতে পারেনি। এখান থেকে উইলমোট জানিয়েছিলেন ঃ "মাত্র কয়েকজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে এটা দমনের কাজ কার্যকরী হতে পারত, কিন্তু এটা নির্বিচারে সকলের অপরাধ, তার ফলে তারা (কোম্পানীর সৈন্যরা) যে কাজের জন্য নিযুক্ত সেই উপদ্রবগুলোর মূলোৎপাটন না করে সেগুলোকে তারা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।"[৪৪] বীরভূমে ডাকাতেরা এত বেশী শক্তি সংগ্রহ করেছিল যে, নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য কালেক্টর মিঃ কিটিং স্থানীয় আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেন নি। এরপর সন্নিহিত জেলাগুলোর কালেক্টরদের তাঁদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করার জন্য স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেল আদেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে প্রশাসনের 'বৈধ অধিকারে ক্ষেত্র সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নই ডুবে গিয়েছিল।' কিটিং যাকে 'তীব্র খণ্ড যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিলেন সেরকম

একটা যুদ্ধও হয়েছিল। তবুও কিন্তু ডাকাতদের দমন করা যায়নি।[২৫] অন্য এক জায়গায় হান্টাব লিখেছেন ঃ

"মুর্শিদাবাদের কালেক্টর যাঁর শাসন এলাকার প্রান্তে বীরভূম অবস্থিত ছিল, তিনি অসামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে 'এরকম এক সশস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী কোনরকম শক্তি নেই' বলে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং চারশ লোকের সমন্বয়ে গঠিত দস্যুদলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য সৈন্য চেয়েছিলেন। একমাস পরে ডাকাতেরা সংখ্যায় বেড়ে 'প্রায় হাজার জনে' দাঁড়িয়েছিল এবং নিম্নবঙ্গে এক সংগঠিত আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পরের বছর আমরা দেখি বীরভূমে ডাকাতেরা দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; তাদের স্থায়ী শিবিরগুলো শক্ত জায়গা দখল করেছিল; বংশানুক্রমিক রাজা এক ঘণ্টার জন্য তাঁর রাজ্যের গদিতে বসতে, অনেক কম সময়ের জন্য উন্মুক্ত স্থানে আসতে অক্ষম ছিলেন, কোষাগারে যাওয়ার পথে সরকারী রাজস্ব লুঠ হচ্ছিল এবং জেলার মধ্যে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কাজকর্ম অচল হয়ে পড়েছিল।"[২৫ক]

এইভাবে সমকালীন মতের ওপর ভিত্তি করেই হান্টার মেনে নিয়েছেন যে 'ডাকাত দল' 'নিম্নবঙ্গে একটা সংগঠিত আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল'। এই সংগঠনের ভিত্তির সঙ্গেই ফরাসী রিপাবলিকান শক্তির ভিত্তিস্থাপনকারী পূর্ণাঙ্গ সন্ত্রাসের তুলনা করেছিলেন লর্ড মিন্টো। এই সময় ১৭৮৩-'৮৪-র দুর্ভিক্ষের কেবলমাত্র অবসান ঘটেছিল এবং রঙপুর আর দিনাজপুরের কৃষকবিদ্রোহ সবে[২৫খ] মাত্র ব্যর্থ হয়েছিল। এরকমই একটা সময়ে 'এক সশস্ত্র জনতা'-- এক সাধারণ সশস্ত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নয় — নিম্নবঙ্গে কোম্পানীর প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। উৎপীড়িত হয়ে হিংসার আশ্রয় নেয় এমন সব মানুষকে বোঝাতেই ইংরেজরা সাধারণভাবে 'ডাকাত' কথাটা ব্যবহার করত। ইংরেজের নথিতে সন্ন্যাসী আর ফকিরেরাও ডাকাত বলে অভিহিত হয়েছিল।[২৫গ] ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের সরকারী নথিতে নিম্নবঙ্গে এদের আগমন কাহিনী এইভাবে বর্ণিত হয়েছিল ঃ

"দুর্ভিক্ষ পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের দল স্ফীত হয়ে উঠেছিল কৃষকদের দ্বারা, যাদের নতুন করে চাষ শুরু করার মতো বীজ কিংবা সরঞ্জাম ছিল না, আর ১৭৭২-এর শীত তাদের নামিয়ে এনেছিল নিম্নবঙ্গের শস্যক্ষেত্রে, পঞ্চাশ থেকে হাজার মানুষের দল মেতেছিল অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের কাজে।"[২৫ঘ]

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চাশ থেকে হাজার জন, ১৭৮৫-তে চারশ থেকে হাজার জন— কম-বেশী এটাই ছিল ১৭৭০ এবং ১৭৮৩-'৮৪ খ্রীস্টাব্দের দু'দুটো দুর্ভিক্ষের পরিণামে নিম্নবঙ্গে অতর্কিতে হানা দেওয়া ডাকাতদলের আয়তন।

সরকারের আইনমান্যকারী প্রজাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে এমন আইনভাঙ্গা লুঠেরা ডাকাত, সমাজের অন্ধকারে বসবাসকারী অপরাধীর দল তারা ছিল না। তারা ছিল সেই ডাকাত যারা কৃষকদের দ্বারা বর্ধিত ও শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। কোম্পানীর অসামরিক কর্তৃপক্ষও নিশ্চয়ই তা জানত এবং তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে অকারণে ডাকাতদলের মুখোমুখি অসহায় বোধ করতে পারে। সমকালীন নথি থেকে হান্টারের দেওয়া উদ্ধৃতির মধ্যে ফুটে ওঠা সরকারের অসহায় অবস্থা মেনে নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি যে, নিম্নবঙ্গে যারা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছিল তারা কারা? একজন আধুনিক ঐতিহাসিক এর জবাব দিয়েছেন এইভাবে ঃ "সুতরাং এমন কি ইংরেজের ভাষ্য অনুসারেও এ এক পূর্বলব্ধ সিদ্ধান্ত। যে কিছু সংখ্যক 'তথাকথিত' নগ্ন সন্ন্যাসী এবং ফকির যারা দেশকে লুণ্ঠন করেছিল বলে ধরা হয়েছিল তারা আদৌ সন্ন্যাসী ও ফকির ছিল না, ছিল বুভুক্ষু সাধারণ মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, কৃষির সরঞ্জামহীন, এমন কি পরিবারহীন যাদের পক্ষে মুসলমান শাসক ও ইংরেজ কালেক্টর উভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে কোন কিছুকে আঁকড়িয়ে ধরা ছাড়া উপায় ছিল না। অতএব, তারা ডাকাত ছিল না, কিন্তু ছিল মুসলমান ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।"[৪৫৬]

এইরকম বিদ্রোহীদের — ইংরেজ নথির ডাকাতদের — উত্তর ও পূর্ববাংলাতেও দেখা গিয়েছিল এবং সেখানে তাদের দমন করা প্রায় দুঃসাধ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।[৪৫৮] এর কারণ তারা ছিল সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় শোষণে জীর্ণ, হতাশ, অসহায় মানুষ যারা বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ হোল ঃ ঢাকা এবং মালদহে ইংরেজ পণ্য লুঠ হয়েছিল। জমিদারের লোকজনের দ্বারাই যে কোম্পানীর কুঠি লুণ্ঠিত হয়েছিল মালদহে বাণিজ্যিব প্রতিনিধি চার্লস গ্রান্ট তদন্তের মাধ্যমে তা জানতে পেরেছিলেন।[৪৫৯] রাজশাহী ও দিনাজপুরের ডাকাতদের দমন করার পক্ষে ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আর সেজন্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য আনতে হয়েছিল। ময়মনসিংহে দু'তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে ডাকাতেরা যেত দূরবর্তী অঞ্চলের ধনীদের সম্পদ লুঠ করতে। চৌধুরীরা তাদের দমন করতে ব্যর্থ হলে ইংরেজ সৈন্যকে কাজে লাগান হয়েছিল। কিন্তু এতেও কোন সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়নি। এমনকি বর্ধমানেও ব্যাপক ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়েছিল এবং মাঝে মধ্যে সেখানে ইংরেজরাও আক্রান্ত হয়েছিল। এই ক্রমবর্ধমান ডাকাতির ফলে জেলার সর্বত্রই গভীর উদ্বেগ আর হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। এই চাপা হতাশাকে কলকাতার কেন্দ্রীয় প্রশাসনও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর তাই কোম্পানীর কর্মচারীদের মনোবলকে কিছুটা চাঙ্গা করার জন্য তাঁরা ডাকাতদের দুষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে প্রমাণ করার

জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য গোটা সমাজটাই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল বললে তা যেমন অতিশয়োক্তির পর্যায়ে পড়বে ঠিক তেমনি ডাকাতিটা সব সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধেই হয়েছে এ বক্তব্যও ইতিহাসগ্রাহ্য হবে না। তবে এটাও ঠিক যে, আমাদের আলোচ্য সময়কাব ডাকাতির মধ্যে ইংরেজ বিরোধী একটা ছাপ অবশ্যই ছিল। যে ইংরেজ শক্তি নবাব এবং উজির, রাজা ও সর্দার আর সত্যি বলতে কি সম্রাটকেও দমন করেছিল ডাকাতিটা বহুলাংশে ছিল তার বিরুদ্ধে। ডাকাতদের নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে তারাই কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। তারা অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া এলিট শ্রেণীর সঙ্গে গোটা সমাজটাই একযোগে করজোড়ে দাঁড়ায়নি। লর্ড মিন্টো যখন লিখেছিলেন যে তাঁর "লজ্জিত না হয়ে উপায় ছিল না, যখন আমি সরকারের ঠিক চোখের সামনে অনুষ্ঠিত সমস্ত দেশকে বিপর্যস্ত করা ভয়াবহ হাঙ্গামার বিষয়ে পুরোপুরি অবগত হয়েছিলাম" তখন তিনি ঠিক সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথাই বলেছিলেন যার মধ্যে থেকে বাংলাদেশে ইংরেজকে কাজ করতে হয়েছিল। একজন গোকুল ঘোষাল কিংবা একজন নবকৃষ্ণের সম্পদ গ্রামের অসংখ্য নিঃস্ব মানুষকে আড়াল করতে পারেনি। এইসব নিঃস্ব মানুষেরা মোগল আমলেও ছিল। তবে কি করে তাদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যেই ধরে রাখতে হয় মোগলেরা সেটা জানতেন। আর সেজন্যই সমাজের উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করার সময় এর একটা অংশকে তাঁরা পরজীবী মধ্যস্বত্বভোগী মানুষদের ভোগের জন্য ছেড়ে দিতেন, সমাজে যাদের অবস্থানটা নীচের তলার এক ব্যাপক পরম্পরা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থার দ্বারা খাপ খেয়ে গিয়েছিল। তখন এক দল নিঃস্বকে কিছুটা সঙ্গতিপন্ন আর একদলকে দিয়ে দমিয়ে রাখা হোত এবং তার সামাজিক উত্তেজনা প্রধানতঃ শ্রেণী উত্তেজনার রূপ পেত। এই শ্রেণী উত্তেজনার মোকাবিলায় নিষ্করভূমি বণ্টন ব্যবস্থাকে প্রশংসনীয়ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন মোগলরা। সেই সময়কার পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থা গ্রামীণ জীবিকাকে প্রচণ্ড স্থিতিস্থাপক করে তুলেছিল। অথচ সামাজিক উদ্বৃত্তের সবটুকুই আত্মসাৎ করার ইংরেজের লক্ষ্যের সঙ্গে জমি থেকে পাওয়া মুনাফায় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর ভাগ বসানোর ব্যাপারটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বলে এই ব্যবস্থাকে আঘাত করেছিল ইংরেজ। জেলাগুলোতে প্রথম সুপারভাইজার পাঠানোর সময় থেকেই নিষ্কর রায়তি স্বত্ব প্রত্যাহার, জমিদারী আমলা ও নিজামত কর্মচারিদের বরখাস্ত করা এবং সর্বোপরি নবাব, রাজা ও জমিদারদের সৈন্যবাহিনী হটানো এই তিন বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজ শাসন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল।[২১জ] এর ওপর তারা নাজিমদের বা নবাবদের বৃত্তি এবং জমিদারদের আবওয়াব, নিষ্কর জমির স্বত্ব ও অন্যান্য উপরিপাওনাকেও ছাঁটাই করায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের নিয়োগ ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। এই নিষ্কর রায়তি স্বত্ব প্রত্যাহারের ফলে একদিকে যেমন শ্রেণী শোষণ ব্যবস্থার সেফটি ভালভটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি নীচু

তলার শ্রেণীবিন্যাসটাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এটা জমিদার, ফকির, সর্দার, ব্রাহ্মণ, কৃষক সকলকেই একই রেখায় টেনে এনেছিল আর স্বনির্ভর গ্রামের পুরনো ঐক্যটাই এ সময় এদের মিলনের সূত্র রচনা করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে বরখাস্ত আমলাদের সাহায্যপুষ্ট ডাকাতেরা জমিদারদের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। কৃষক ও পাইক সর্দার আর বরকন্দাজরা জমিদার এবং তাঁর লোকজনের নির্দেশই কাজ করত এই তথ্য প্রশাসনের সমালোচকদের জানা ছিল। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে জোরের সঙ্গে বলে আসছিলেন যে গ্রামের ভদ্রজনেরা অলস বলে অহেতুক নিন্দাভাগী হয়েছেন এবং এখনও তাঁরা সামাজিক নেতৃত্বদানের ক্ষমতা রাখেন। বাংলার অভ্যন্তরে ডাকাতি কৃষকদের কাজ এই বক্তব্যকে তাৎপর্য দান করেছিল। সেই সমালোচনাকে বন্ধ করার জন্যে শাসকগোষ্ঠী তাই বাংলাদেশের ডাকাতিকে বংশগতবৃত্তি এবং ডাকাতদের অসৎ সম্প্রদায় হিসাবে দেখাবার জন্য একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তবে শাসক গোষ্ঠীর এই প্রচার অবশ্য জনগণের সমর্থন আদায় করতে পারেনি। অতীতে সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষদের এক চওড়া প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে জনগণের এই অসন্তোষ বাইরে আসতে পারত না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সময়ে গ্রাম-সমাজে সঙ্গতিপন্ন মানুষ মোটেই ছিলেন না। ফলে নিম্নবর্গের অসন্তোষকে সীমার মধ্যে বেঁধে রাখার মানুষজনও ছিল না। ১৭৯৩-এর বন্দোবস্তে মাঝারি আকারের বহুসংখ্যক জমিদারের উদ্ভব হয়েছিল।[৪৬] কিন্তু নিম্নবর্গের অসন্তোষকে ঠেকিয়ে রাখার মত সঙ্ঘবদ্ধসম্পন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি। ইংরাজ শাসনে ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে আসাটাই ছিল মানুষের পরিণতি। ডাকাতি তারই ফল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কোর্ট অফ সার্কিট এ বিষয়ে জানিয়েছিল :

"আমাদের মনে হয়, ইংরেজ শাসনের পর থেকে ডাকাতিজনিত অপরাধ ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে আর এখন এটা কমেছে কিনা তা আমার জানা নেই।"[৪৭]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একটা ব্যাপক সামাজিক অনুমোদন এতে ছিল, যেমন একজন বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন :

"কিন্তু এটা খুব ভাল করেই জানা যে বহু জেলাতেই ডাকাতেরা জনগণের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছিল . . . . একই মানুষ যারা আক্রমণে উৎসাহ জুগিয়েছিল প্রতিরোধে তারাই এত কুণ্ঠিত এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে।"[৪৮]

এ ছিল এমনই এক আপাত বিরোধী সত্য যার ব্যাখ্যা ইংরেজ শাসকরা দিতে পারেন নি। ডাকাতিটা অব্যাহতই ছিল — তা তার ধরন যাই হোক না কেন। দলবদ্ধ ডাকাতি বেড়েই চলেছিল — ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে এ অভিযোগ করেছিলেন লর্ড ডালহৌসী আর ১৮৮০-র দশকে ডাকাতদের অস্তিত্ব বজায় থাকার কথা জানিয়েছিলেন স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বসু। "ব্যাপক ডাকাতিকে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা

হয়েছিল এবং এই প্রথা যে কতটা জোরালো সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক ডাকাতির পুনরুজ্জীবনই তা প্রমাণ করে।"[৭] অথচ আমাদের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা বিশেষ আলোচনা করেন নি। ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এক বিশাল ও অস্থির মানবগোষ্ঠী দু'শ বছর ধরে ইতিহাসের অন্ধকার অলিন্দে পড়ে ছিল। একমাত্র বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' কল্পনায় তারা কিছুটা মুক্তি পেয়েছে।

পাঠটীকা

(১) মোরল্যাণ্ড, **ইণ্ডিয়া এ্যাট দি ডেথ অব আকবর ঃ এ্যান ইকনমিক স্টাডি**, আত্মারাম এ্যাণ্ড সন্স, দিল্লী, ১৯৭২।

(২) উইলিয়াম কে'র **দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** দ্রষ্টব্য।

(৩) এডওয়ার্ড টমসন এবং জি. আর. গ্যারেট কর্তৃক উদ্ধৃত ১৮০৯ খ্রীঃ লেডি মিন্টোকে লেখা লর্ড মিন্টোর পত্র, **রাইজ এ্যাণ্ড ফুলফিলমেন্ট অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া**, সেন্ট্রাল বুক ডিপো, এলাহাবাদ, ১৯৬২, পৃঃ ২৪৭-৪৮।

(৪) ডাকাতদের সম্বন্ধে ইংরেজের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কর্নেল মিডোস টেলরের **কনফেশনস্ অফ এ ঠগ** এবং ডবল্যু. এইচ. স্লিম্যানের **র‍্যাম্বল্‌স্ এ্যাণ্ড রিফ্‌লেক্‌শন্‌স্** গ্রন্থে।

(৫) প্রসিডিংস অফ সি. সি. (অর্থাৎ কমিটি অফ সার্কিট) এ্যাট কাশিমবাজার, ১৫ই আগষ্ট, ১৭৭২, পৃঃ ১২৩। এই বক্তব্য ফরেস্টের **সিলেকশন ফ্রম দি স্টেট পেপারস অফ দি গভর্ণর জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস, ভল্যুম২**, পৃঃ ২৮৯-তেও পাওয়া যায়। সেখানে রিপোর্টের তারিখ হিসাবে ২৮শে জুন, ১৭৭২-এর উল্লেখ আছে। যাই হোক, প্রসিডিংস ভল্যুম অফ দি সি. সি. এ্যাট কাশিমবাজার, এটা ১৫ই আগষ্ট, ১৭৭২ তারিখে লেখা হয়েছিল।

(৬) হিন্দুস্থানী ডাকাতদের বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য টেলর এবং স্লিম্যানের রচনা দ্রষ্টব্য।

(৭) এই বক্তব্য উইলিয়াম হকিন্সের (১৬০৮ থেকে ১৬১১ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, তাঁর ভারত বিবরণের জন্য ডব্লু. ফস্টারের **আর্লি ট্র্যাভেলস ইন ইণ্ডিয়া** দ্রষ্টব্য)। এটি নিম্নলিখিত বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় ঃ "দস্যু ও তস্করে দেশ এমনই ভরে আছে যে, তাঁর (জাহাঙ্গীরের) সারা রাজত্বে প্রায় কোন লোকই প্রভূত শক্তি ব্যতিরেকে দরজার বাইরে যেতে পারে না" — ফস্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া, পৃঃ ১৫৭-৫৮, এস. এম. এডওয়ার্ড এবং এইচ. এল. ও গ্যারেট কতৃক উদ্ধৃত, **মুঘল রুল ইন ইণ্ডিয়া**, দিল্লী, ১৯৭৬,

পৃঃ ১৮৮-৮৯। পিটারমাল্ডী পাটনার চতুষ্পার্শে "দস্যু ও তস্করের" পরিবর্তে "বিদ্রোহী ও তস্করের" সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন (এডওয়ার্ড ও গ্যারেট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৭)। হকিন্সের "দস্যু ও তস্কর", মাণ্ডীর "বিদ্রোহী ও তস্কর", হেস্টিংসের "দস্যুকুল" সবই আইনমান্যকারী মানুষদের মুখোমুখি আইন অমান্যকারী মানব সমাজের অস্তিত্বকেই নির্দেশ করে। ডাকাতি হচ্ছে বংশগত তথা জাতিগত বৃত্তি — এই ধারণাটা ছিল অষ্টাদশ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসকদের সৃষ্টি। **তারাই এ ধারণা দিয়েছিল যে বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ হচ্ছে — আইন মান্যকারীদের সঙ্গে আইন অমান্যকারীদের।** বৃটিশ শোষণ ও শাসনে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষদের এইভাবে আইন অমান্যকারী বলে বিকৃত করা হয়েছিল।

(৮) কে, **দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।**

(৯) ডব্লু. ডব্লু. হান্টার, **অ্যান্যালস অফ রুরাল বেঙ্গল** (ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত), কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৪।

(১০) **ঠগী এ্যাণ্ড ড্যাকয়িটি কমিশনস্**-এর রিপোর্ট থেকে হান্টার উদ্ধৃত করেছেন।

(১১) ফারমিঙ্গার **ইনট্রোডাকশন টু দি ফিফথ রিপোর্ট, ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ ঃ পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট**, কলিকাতা, ১৯৬২-তে পুনর্মুদ্রিত, পৃঃ ২২৬-২২৭। সেইসব সরকারী কাগজপত্র থেকে তিনি ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যার মধ্যে ডাকাতদের "দুরাত্মা দস্যু", "নিষ্ঠুর অপরাধী", "পেশাদার ডাকাত", "পুরুষানুক্রমিক পেশা" অনুসারে ডাকাত এবং "সমাজের শত্রু" হিসাবে দেখানো হয়েছে। ৬১ পৃষ্ঠায় তাঁর যে বক্তব্য রয়েছে তা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এইসব মতকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন ঃ "ডাকাতেরা, যাদের সম্পর্কে ইংরেজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ছিল, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে নয়, বরং পূর্বপুরুষাগত বৃত্তির টানেই তারা ডাকাত হয়েছিল এর থেকে পরিষ্কার কিংবা বিশ্বাসযোগ্য বিষয় আর কিছুই হতে পারে না"।

(১২) একটা দ্রুত এবং অস্পষ্ট মন্তব্যের মাধ্যমে এ্যঙ্গাস মাডিসন ডাকাত বলতে 'ধর্মীয় ঠগ' বুঝিয়েছেন — **ক্লাস স্ট্রাকচার এ্যাণ্ড ইকনিমক গ্রথ ঃ ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড পাকিস্তান সিন্স দি মোগলস, লণ্ডন**, ১৯৭১, পৃঃ ৩৯।

(১৩) এডওয়ার্ড টমসন এবং জি. টি. গ্যারাট, **রাইজ এ্যাণ্ড ফুলফিলমেন্ট অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া**, পৃঃ ২৪৭।

(১৩ক) টমসন ও গ্যারাট, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ১২৭।

(১৩খ) ইংরেজরা আবিষ্কার করেছিল যে, মুসলিম আইন "অত্যন্ত নরম নীতি এবং রক্তপাতের প্রতি বিতৃষ্ণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রায়শ এই কারণেই অপরাধীর শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে পালাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য এবং যা আইনের নাগালের

বাইরে অবস্থিত এমন সব বিশৃঙ্খলার মূলোচ্ছেদের জন্য সম্রাটকে হস্তক্ষেপে বাধ্য করত"। (টমসন ও গ্যারাট কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ১২৭)। এজন্যই হেস্টিংস "কঠোর বৈধতার প্রতি উদাসীন" ছিলেন। কারণ বৈধতা দেখতে গেলে ডাকাতদের শাস্তি দেওয়া যেত না।

(১৪) টমসন ও গ্যারাট, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ১২৭। এছাড়া কিথ ***A Constitutional History of India*** দ্রষ্টব্য।

(১৫) এর বিশদ বিবরণ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় লেখ্যাগারে রক্ষিত রেভেনিউ জুডিসিয়াল এবং বোর্ড অফ রেভেন্যুর কার্যবিবরণীতে পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এইসব কার্যবিবরণীর উল্লেখ করার সুযোগ পাব।

(১৬) সুপারিন্টেডেন্ট অফ পুলিশ ছিলেন আমাদেব আমলের ইনস্‌পেক্টর জেনারেলের সমতুল্য।

(১৭) ***History of Police Organisation in India and Indian Village Police : 1902-3***-এ ভারতীয় পুলিশ কমিশনের রির্পোটের নির্বাচিত অধ্যায়। এর পর থেকে একে ইন্ডিযান বা ভারতীয় পুলিশ কমিশন রিপোর্টস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৩, পৃঃ ১২।

(১৮) ইণ্ডিয়ান পুলিশ কমিশন রিপোর্টস, পৃঃ ১০।

(১৮ক) তদেব

(১৯) ইণ্ডিয়ান পুলিশ কমিশন রিপোর্টস, পৃঃ ১১।

(২০) রাজশাহীর সুপারভাইজার বাউটন রাউজ কর্তৃক রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (Controlling Council of Revenue) মুর্শিদাবাদকে লেখা, ১৯শে এপ্রিল, ১৭৭১। মুর্শিদাবাদে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কার্যবিবরণী, (Prodgs. CCR), পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৬৩।

(২১) ফারমিঙ্গার, ফিফথ রিপোর্ট, পৃঃ ২৪৬। এইসঙ্গে ডব্ল্যু. আর. গুরলে, ***A Contribution towards a History of the Police in Bengal***, কলকাতা, ১৯১৬, পৃঃ ২২ দ্রষ্টব্য।

(২২) রণজিৎ গুহ, ***A Rule of Property for Bengal***, পৃঃ ১০৯-৯১০।

(২৩) **সিয়ার উল মুতাখারিন**, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০১।

(২৪) ১৭৭১-এর ১১ই মার্চ পূর্ণিয়া থেকে সুপারভাইজার ডুকারেল মুর্শিদাবাদে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে জানিয়েছিলেন। রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কার্যবিবরণী (চতুর্থ খণ্ড) ২৫শে মার্চ, ১৭৭১।

(২৫) জে. সি. সিংহ, ***Economic Annals of Bengal***. পৃঃ ৯৮।

(২৬) এন. কে. সিংহ, ***Economic History of Bengal***, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২।

(২৭) লণ্ড. সিলেকসনস্, নং ৭২৩, ৭৬২, ৭৬৭, ৭৭৫।

(২৮) হান্টার কর্তৃক উদ্ধৃত, ***Annals of Rural Bengal***. পৃঃ ৭৭। ইংরেজের নথিতে 'দস্যু' শব্দটা খুব বেশী করেই পাওয়া যায়। ১৭৬৭-র এক নথিতে মেদিনীপুর অঞ্চলের কোলদের 'এক লুণ্ঠনকারী দস্যু উপজাতি' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল— ভান্সিটার্ট কর্তৃক ভেরেল্স্টকে লেখা, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds. প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০০। যেসব নামে কোলরা পরিচিত ছিল তারই মধ্যে একটা হোল 'ভূমিজ চুয়াড়'—ডঃ জগদীশ চন্দ্র ঝার ***The Kol Insurrection of Chota-Naglour***, পৃঃ ২৩। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৩-এ কলকাতা কাউন্সিলকে লেখা এডওয়ার্ড বেবারের পত্রে আমরা এই মন্তব্য দেখতে পাই ঃ "তাদের (জমিদারদের) প্রজারা ডাকাত" — Mid. Dist. Recds. চতুর্থ খণ্ড. পৃঃ ১০৬।

(২৯) Gleig ***Memoirs of Warren Hastings***, প্রথম খণ্ড।

(৩০) ***Busteed Echoes From Old Calcutta,*** চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪-৬৫।

(৩১) তদেব

(৩২) লেডি মিন্টোকে লেখা লর্ড মিন্টোর পত্র থেকে টমসন ও গারাট কর্তৃক উদ্ধৃত। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৮।

(৩৩) তদেব

(৩৪) এডওয়ার্ড বেবারকে জে. ফোরবস লিখেছেন (তারিখ নেই), Mid. Dist. Recds. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯২।

(৩৫) সামুয়েল লুইসকে জে. ফোরবস লিখেছেন ৩০শে মে, ১৭৭৩, Mid. Dist. Recds. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১২।

(৩৬) বিষ্ণুপুর থেকে ডাউসন মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট সামুয়েল লুইসকে লিখেছিলেন, Mid. Dist. Recds., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২০।

(৩৭) তদেব

(৩৮) রিচার্ড বেচারকে জন গ্রোস, রঙপুর, ২৪শে এপ্রিল, ১৭৭০। ***Letter Copy Book of the Resident at the Darbar***, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১।

(৩৯) রিচার্ড গুডলাড কর্তৃক রাজস্ব পরিষদকে লেখা, ৭ই জুন, ১৭৭৯, Rungpore Dist. Recds.. প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৪।

(৪০) মুর্শিদাবাদে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে ম্যারিয়ট লিখেছিলেন. ১লা মার্চ, ১৭৭২, মুর্শিদাবাদ, রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কার্যবিবরণী (দশম খণ্ড), ৫ই মার্চ, ১৭৭২।

(৪১) এন. মজুমদার, ***Justice and Police in Bengal***, পৃঃ ৭৯।

(৪২) ডি. জে. ম্যাকনীল, ***Report on the Village Watch of the Lower Provinces of Bengal***, কলকাতা, ১৮৬৬, পৃঃ ৪।

(৪৩) এন. মজুমদার, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৭৮-৭৯।

(৪৪) যশোরের সুপারভাইজারের পত্র, ২৮শে আগস্ট, ১৭৭০।

Letter Copy Book of the Resident at the Durbar, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭।

(৪৫) হান্টার, *Annals*, পৃঃ ৪৭।

(৪৫ক) হান্টার, *Annals*, পৃঃ ১৫।

(৪৫খ) রঙপুর ও দিনাজপুরের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন নরহরি কবিরাজ, ***A Peasant Uprising in Bengal, 1783***, ১৯৭২।

(৪৫গ) এ. এন চন্দ্র, ***Sannyasi Rebellion***, পৃঃ ৩২।

(৪৫ঘ) হান্টার কর্তৃক উদ্ধৃত, ***Annals***, পৃঃ ৭৭।

(৪৫ঙ) এ এন. চন্দ্র, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৩২।

(৪৫চ) "মোগল আমলে, ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে, লর্ড কার্জনের কালে, আমাদের যুগে, ডাকাতি — দস্যুবৃত্তির সঙ্গে হিংসা (violence) — পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যেখানে প্রাকৃতিক অবস্থা একে নির্মূল করা প্রায় দুঃসাধ্য করে তুলেছিল।" — টমসন ও গ্যারাট, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ২৪৭।

(৪৫ছ) অ্যানসলি টমাস এমব্রী, ***Charles Grant and the British Rule in India***, নিউইয়র্ক, ১৯৬২, পৃঃ ৯২।

(৪৫জ) বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, রঞ্জিত সেন, ***Economics of Revenue Maximization, 1757-1793 : Bengal, A Case Study***.

(৪৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দশকে বর্ধমানের জমিদারি ছাড়া বড় বড় আর সব জমিদারিরই পতন হয়েছিল। দ্রষ্টব্য সিরাজুল ইসলাম, ***The Permanent Settlement in Bengal, A Study of its Operations : 1790-1819***, ঢাকা, ১৯৭৯।

(৪৭) এন. কে. সিংহ কর্তৃক উদ্ধৃত, ***Economic History of Bengal***, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

(৪৮) ফিফথ রিপোর্ট, ২য়, পৃঃ ৬৭২. এন. কে, সিংহ কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ২০০।

(৪৯) টমসন ও গ্যারাট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ডাকাত ও জমিদার

(১) ডাকাতিটা কি জীবনধারণের একটা উপায় ছিল?

বাংলাদেশের ডাকাতদের "পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত সমাজের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা আইন অমান্যকারী জাতি" হিসাবে বর্ণনা করার সময় হেস্টিংস ডাকাতদের পিছনের সামাজিক চালিকাশক্তিকে হয় বোঝেন নি না হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুল বুঝেছিলেন। বাংলাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার পর্বে জনগণের এক বড় অংশ জীবিকা হিসাবে ডাকাতিকে গ্রহণ করার ফলে তা যে ব্যাপক আকার নিয়েছিল পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তা দেখেছি। জমিদারেরা ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিলেন একথা বলার সময় বঙ্কিমচন্দ্র এমনই এক পরিস্থিতি উল্লেখ করেছেন যেখানে সমাজের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী অংশই এই আপাত অননুমোদিত উপায়কেই জীবিকা অর্জনের গ্রহণযোগ্য পথ হিসাবে গ্রহণ করেছিল।[১] একইভাবে কৃষকের ডাকাত হওয়াটাও এ যুগের এক অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২] তাছাড়া জমিদার ও কৃষক — সমাজের দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত দুই শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বৃত্তির অসংখ্য মানুষও ডাকতিকে জীবিকা অর্জনের গ্রহণযোগ্য উপায় হিসাবেই মনে করত। সুতরাং বাংলাদেশের ডাকাতিকে জীবনের ধারা হিসাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যে ধারণা করেছিলেন তা ঠিক ছিল না। এটা ছিল গরীবের কাছে জীবিকার, সাধারণের কাছে সঙ্ঘশক্তির আর রাষ্ট্রের অত্যধিক রাজস্ব দাবীর চাপে নিষ্পেষিত ধনীর কাছে ক্ষতিপূরণের পথ। সে সময় সমাজের অর্থনৈতিক দুর্বলতা এমনই এক পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল যেখানে যুদ্ধবাজ চুয়াড়[৩], যোদ্ধা রাজপুত[৪], ভবঘুরে সন্ন্যাসী, ফকির মহাজন[৫] এবং মাঝি[৬], মশালচী[৭] বরকন্দাজদের[৮] মতন শান্ত সকলেই একটা ক্ষেত্রে নিজেদের অধঃপতন ঘটিয়েছিল যেখানে বৃত্তিগত, জাতিগত কিংবা সম্প্রদায়গত বিভেদ একই ধরনের জীবিকার খোঁজে ব্যস্ত মানুষদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই পরিস্থিতিতে একজন মশালচী ও একজন বরকন্দাজ দুজনেই যখন শেষপর্যন্ত ডাকাতিকেই জীবিকার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল তখন তাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্যই ছিল না। তবে সে যাই হোক না কেন একটা ক্ষেত্রে আমরা অধঃপতনের এবং অন্য ক্ষেত্রে মিলনের চিত্র পাই। আর এই শেষোক্ত বিষয়টাই হোল আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে জীবিকা অর্জনের সামাজিক উপায় অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা একধরনের সামাজিক সংযোগের আমরা খোঁজ পাই। প্রকৃতপক্ষে ডাকাতি ছিল এটাই। যদি এ ধরনের সামাজিক সংযোগ না থাকত তবে ডাকাতিটা যুদ্ধ কিংবা সামরিক কর্মের সঙ্গে পরিবর্তনযোগ্য বৃত্তি হতে পারত না।

(২) সংগঠিত সমাজ বন্ধনের নেতৃত্ব

এই প্রেক্ষাপটে আমরা যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব তা হোল—এই সামাজিক সংযোগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারা? ব্যাপকভাবেই এঁরা ছিলেন জমিদার এবং বিশেষ করে

তাঁরা যাঁরা বাংলাদেশে কোম্পানীর শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন নি। বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য নীচে কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান থেকে পাওয়া এক সংবাদে বলা হয়েছিল, "জমিদার যুদ্ধ করতে মনস্থ করেছেন এবং তিনি একসঙ্গে ১০ বা ১৫ হাজার পিয়ন ও দস্যু সংগ্রহ করেছেন ও তাদের কাজ দিয়েছেন আর বীরভূম রাজের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।"[৯] পিয়নরা ছিল জমিদার ও নবাবদের[১০] সশস্ত্র অনুচর এবং তারা প্রায়ই ডাকাতি করত। এইভাবে কলকাতার পিয়নদের হুগলীতে গিয়ে সেখানকার মানুষদের ওপর অত্যাচার করাটা এক সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১১]

বর্ধমানরাজের ইংরেজ বিরোধিতার কথা সুবিদিত ছিল। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে সাত, আট হাজার মানুষে গড়া রাজার বাহিনী বর্ধমানে কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত মিঃ হিউ ওয়াটসকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। এরা সেখানে ওয়াটসকে সাহায্য করার জন্য হাজির থাকা লেফটেন্যান্ট ব্রাউনের সৈন্যদলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ১৭৫৮-র এপ্রিল থেকে ইংরেজরা বর্ধমান এবং নদীয়ার 'তাংখওয়া' রাজস্বের যে অধিকার ভোগ করছিল[১২] বর্ধমানরাজের তা মনঃপূত ছিল না। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে রাজার বাহিনী তাই কাছারিতে ইংরেজের রাজস্ব নিয়ে যাওয়ায় বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল।[১৩] এই ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়াটস লিখেছিলেন ঃ "আমার কাছে খবর আছে যে, শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ হাজার হয়েছিল এবং তারা অর্থ অপহরণের মাধ্যমে প্রকাশ্য বিরোধ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল।"[১৪]

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান ও বীরভূমের রাজারা এবং মেদিনীপুরের ফৌজদার তাঁদের বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের এই যোগাযোগ ঘটেছিল ফকিরদের মাধ্যমে।[১৫] ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণর নবাবকে জানিয়েছিলেন যে, মিঃ রোজ নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রালোক কিছু অর্থ এবং জিনিসপত্রসহ নৌকায় ভ্রমণ করেছিলেন। "বাখরগঞ্জের কাছে নৌকার লোকেরা তাঁকে হত্যা করেছে। তাঁর অর্থ ও জিনিসপত্র তারা নিয়ে গিয়েছে এবং সীতারামের জমিদারিতে আশ্রয় নিয়েছে। এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একজন ইংরেজকে আমি উক্ত জমিদারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁকে সম্মান দেখাননি।" তাই "জমিদারকে হৃত দ্রব্যাদি প্রত্যার্পণে বাধ্য করার এবং যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্ত কাজ বন্ধ হতে পারে সেরকম শাস্তি তাঁকে দেবার জন্য ঢাকার নায়েবকে আদেশ দিতে"[১৬] তিনি নবাবকে অনুরোধ করেছিলেন। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, রঙপুরের জমিদাররা সেখানে ডাকাতদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।[১৭] ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার কাছে ১৬,০০০ মণ লবণ নিয়ে একটা ইংরেজ নৌবহর যাচ্ছিল। মাঝপথে তাকে বাধা দিয়ে লুঠ করা হয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল যে, একজন 'সম্পন্ন মানুষ' সেলিমাবাদের জমিদার জয়নারায়ণ চৌধুরী নিজেকে ধনশালী করার জন্যই একাজ করেছিলেন।[১৮]

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল কোম্পানীর চুনের ঠিকাদার মিঃ রিচার্ডসন আজমেরীগঞ্জ থেকে শ্রীহট্টের সুপারভাইজার থ্যাকারেকে লিখেছিলেন, "অভিযোগ আছে যে, যাতায়াতের

পথে চুনের নৌকাগুলো বিভিন্ন পরগণার জমিদারদের কাছ থেকে প্রায়ই বাধা পাচ্ছে....।"[১৯] এ ধরনের ঘটনাকে বাধা দেবার জন্য মিঃ রিচার্ডসন একবার তাঁর লোকজনকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা জেলার কলিজুরির কাছে জমিদারেরা তাঁর কর্মচারীদের মারধর করেন।[২০] এরও অনেক আগে, ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিত রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (Controlling Council of Revenue) দিনাজপুরের সুপারভাইজারকে লিখেছিলেন যে, জমিদারেরা "উৎপাদকদের (manufacturers) তাঁতের কাজে বাধা দেন, তাদের কারখানার ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ওপর চিরকালের বৈধ ক্ষমতাকে ব্যবহার করা থেকে (কোম্পানীর) গোমস্তাদের বঞ্চিত করেন, বৈধ খাজনা ছাড়াও বলপূর্বক অবৈধ দাবী আদায় করে ঐসব নির্ভরশীল ব্যক্তিদের হয়রান করেন এবং অভিযোগের ক্ষেত্রে দমনমূলক পদ্ধতিতে তাঁদের বিচারের ক্ষমতা তাদের ওপর তাঁরা প্রয়োগ করেন।"[২১] এক বছর দানদিওয়া নামক এক জায়গার দু'জন থানাদার সেখানকার রাজার সঙ্গে মিলে ইংরেজেব চুনের কাজে ভীষণ বাধার সৃষ্টি করেছিল, তাদের আশিখানা চুনের নৌকা থামিয়ে তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করেছিল।[২২]

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার "অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করেছেন, তাঁরা ডাকাতদের, যারা জেলায় অধিক সংখ্যায় ছিল, এবং যারা বৈধ সরকারের কর্তৃত্বকে অমান্য ও হেয় করে সন্দেহাতীতভাবেই কোম্পানীর অনুকম্পা ও আশ্রয়ের সকল দাবীকে কার্যত হারিয়ে ফেলেছেন, তাদের সমর্থন করছেন"[২৩]। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস লিখেছিলেন, "জমিদার, কৃষক কিংবা রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে তাদের (ডাকাতদের) সম্বন্ধে সামান্যতম সংবাদ পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না, যা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু যাতে আমি ভীত তা হোল জমিদারেরা নিজেরাই তাদের প্রায়ই আশ্রয় দিয়ে থাকেন।"[২৪] ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারির কাজকর্ম সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য কোম্পানীর সরকার কিষাণ কিঙ্কর দাসকে সাজাওয়াল নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে হত্যা করার জন্য জমিদার ডাকাতদের নিযুক্ত করায় তিনি সেখানে যেতে পারেন নি।[২৫] ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে ফকির, ইংরাজদের হানাদারেরা, ঘুরে বেড়াত। এদের দমন করার জন্য একদল ইংরেজ সৈন্যকে পাঠান হয়েছিল এবং জঙ্গীপুর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে জমিদারদের এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সে কথায় কান দেননি। এ সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর জন ফেনডেল লিখেছিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে, যেমন এইসব ক্ষেত্রে, তেমন একইভাবে অন্যান্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেও তাঁদের (জমিদারদের) সাহায্যের জন্য অনিয়মিত আহ্বানই তাঁদের তা দিতে অস্বীকৃত হওয়ার অজুহাত পাইয়ে দেয়।"[২৬] ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে মালদায় ইংরেজ কুঠিতে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হয়েছিল। সেখানকার কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রতিনিধি চার্লস গ্রান্ট ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই সেখানকার জমিদারের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল।[২৭] যশোরে জমিদারদের ঘিরে সমস্ত ব্যাপারটাই কোম্পানীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সেখানকার সুপার

ভাইজার নবাবের দরবারে অবস্থিত ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে লিখেছিলেন : "জমিদাররা আমার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন এবং আমার সকল কাজের সঠিক সংবাদ সর্দার চোরদের দিচ্ছেন. তার ফলে তাঁরা যখন কোন ব্যক্তিকে ধরার জন্য উদ্যোগী হতে আমাকে পরামর্শ দেন তখন তাদের মাধ্যমেই সে সঠিক সংবাদ পেয়ে যায় যেটা শুধু গ্রেপ্তার প্রয়াসকেই বানচাল করে দেয় না বরং সিপাইদেরও তাঁর চক্রান্তের মুখে ফেলে দেয়।"[২৮]

(৩) জমিদারেরা ছিলেন মিলনবিন্দু

এইসব উদাহরণগুলোই প্রমাণ করে যে, গ্রাম বাংলায় জমিদারেরাই ছিলেন সন্দেহাতীতভাবে ডাকাতদের নিত্য মিলন বিন্দু (Rallying Points)। এই আমলে ডাকাতিটা একটা ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ছিল বলে মেনে নিলে পরে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জমিদারেরা তখনও সামাজিক নেতৃত্বদানে সক্ষম ছিলেন, হেস্টিংসের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল সমালোচনার মধ্যে ফিলিপ ফ্রান্সিস[২৯] এই বিষয়টার ওপরই জোর দিয়েছিলেন। কৃষক, ফকির[৩০], সন্ন্যাসী, পিয়ন, তেলিঙ্গা,[৩১] পাইক, বরকন্দাজ, মাঝি এবং সকল বৃত্তির মানুষকেই জমিদারেরা তাঁদের অধীনে জোটবদ্ধ করেছিলেন। পশ্চিমের মারাঠা[৩২], উত্তরে ভূটিয়া[৩৩] এবং দক্ষিণের মগদের[৩৪] মতন বাইরের মানুষদের সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। জমিদারদের বা আরও সঠিক অর্থে সাধারণভাবে সমাজের সমর্থন না পেলে ডাকাতদের পক্ষে এমন একটা ব্যাপক আন্তঃজেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হোত না।[৩৪ক] এইভাবে কলকাতার ডাকাতেরা প্রধানত হুগলী ও মেদিনীপুরে[৩৫] কর্মসম্পাদন করত আর যারা হুগলীর তারা যেত বর্ধমান ও বীরভূমে।[৩৬] এটা উল্লেখ করা দরকার যে, কলকাতা থেকে যারা যেত, বীরভূম থেকে যারা আসত এবং হুগলী থেকে যাদের পাঠানো হোত প্রধানত সেই তিন দল মানুষের দ্বারাই বর্ধমানে সকল ধরনের লুঠের কাজ সম্পাদিত হোত। আবার হুগলীর ফৌজদার এবং বীরভূমের রাজা যে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এরকম একটা সন্দেহও তখন খুব বেশী মাত্রায় গড়ে উঠেছিল। যাই হোক্, একইভাবে সুন্দরবন আর যশোর থেকে ডাকাতরা যেত বাখরগঞ্জে। রাজমহল এবং মালদা থেকে তারা যেত রঙপুর, দিনাজপুর আর পূর্ণিয়ায়।[৩৭] লখীপুর বা লক্ষ্মীপুর থেকে যেত ঢাকায়।[৩৮] আর, সর্বত্রই অথবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাজকর্মের পরিকল্পনা ঠিক করে দিতেন জমিদারেরা। এই কাজের দ্বারা তাঁরা স্পষ্টতই দু'ধরনের মুনাফা লুঠতেন। প্রথমত, যাঁরা ডাকাতদের সাহায্য করতেন তাঁরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের সাহায্যে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতেন। রাষ্ট্রের যে ভীষণ রাজস্ব চাপে তাঁরা নিষ্পেষিত হতেন তার কথা বিবেচনা করলে একে দরিদ্র মধ্যবিত্তের একটা স্পষ্ট প্রবণতা বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়ত, যাঁদের এলাকায় ডাকাতি হোত সেইসব জমিদারেরা তাঁদের ওপর ধার্য রাজস্ব প্রদানের হাত থেকে অব্যাহতি চাইতে পারতেন।[৩৯] বর্ধমানের রাজার তো একটা স্থায়ী অভিযোগই ছিল যে, বাইরে থেকে আসা লোকজনের হাতে তাঁর প্রজারা এতই উৎপীড়িত হয়েছে যে সরকারের দাবী মেটাবার মতন অর্থ তাদের নেই।[৪০] ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে

লিখেছিলেন ঃ "এই কালেক্টরেটের বড় বড় জমিদারেরা অভিযোগ করেছেন তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি ও অসুবিধার কথা। জেলার মধ্যে বর্তমান বিপুল সংখ্যায় নানান ডাকাতদলের হাতে তাঁরা প্রতিদিন কষ্ট ভোগ করে থাকেন, তাঁরা এই অভিযোগ জোটবদ্ধভাবে করেছেন এবং তাঁরা একান্তভাবেই অনুরোধ করেছেন যাতে, তাদের লুঠতরাজ বন্ধের জন্য আমি আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনীয় উপায় হিসাবে ডাকাতেরা যেমন ব্যবহার করে সেইরকম চারটি বড় নৌকা গঠনের সুপারিশ করার জন্য আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।"[২১] ঐ নথিই জানিয়েছে যে "তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পেতেন" এমন "অনেক ছোট জমিদার" ডাকাতদের আশ্রয় দিতেন। নথিতে আরও বলা হয়েছে ঃ "দু'শরও বেশী মানুষের একটা বড় দল যারা বহুদিন ধরে ব্রহ্মপুত্র থেকে পাহাড় পর্যন্ত খাঁড়ি ও নদীতে উপদ্রব করছিল তারা বিশেষ করে পীড়দায়ক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ঢাকা অঞ্চলের সকল অংশের ভবঘুরেদের সমন্বয়ে তারা গঠিত ছিল এবং তারা লুণ্ঠন পরিক্রমা চালাত এমন কি ডাকাতি করত আর সকল গ্রামই তাদের দাবী পূরণ করত।" প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের ঢাকাসহ লক্ষ্মীপুর আর ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী পুরো এলাকাটাই ডাকাতে বোঝাই ছিল যাদের সংগঠিত করেছিলেন ছোট ছোট তালুকদার ও জমিদারেরা। ডাকাতদের লুঠের জিনিষের ভাগ পাওয়াটা ছিল তাঁদের প্রত্যক্ষ লাভ এবং রাজস্ব প্রদানে ছাড় পাওয়াটা ছিল পরোক্ষ লক্ষ্য। উপরে বর্ণিত নথি এবং সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুলাই-এর কার্যবিবরণী পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছে যে, লক্ষ্মীপুরের ডাকাতরা জমিদারদের আশ্রয় পেয়েছিল। আবার ৮ই সেপ্টেম্বরের কার্যবিবরণী থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ঐ অঞ্চলের তালুকদার মহম্মদ মুরাদ লুঠতরাজ করেছিলেন। একইভাবে ঢাকার অন্তর্গত ভলুয়ার একজন তালুকদার রামশরণ নাগও লুঠতরাজে অংশ নিয়েছিলেন। পুরো অঞ্চলটার ডাকাতদের সংগঠিত করেছিলেন ঐসব তালুকদার আর জমিদারেরাই। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ময়মনসিংহে ইমামদি বা ইমামজী আর তার ছেলে রাজামগুলের লুঠতরাজ কোম্পানীর কাছে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল। বাজু বা বাজি নামক অঞ্চলটি ছিল তাদের কর্মকেন্দ্র। আর এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল তাদের লুঠের রাজত্ব। বাজুর জমিদার জুলকান্দার খানের কাছ থেকে আশ্রয় এবং নিরাপত্তা পেয়েছিল তারা। একবার সুহেয়ার পরগণার রাজিয়াপাড়ায় এক ধনীগৃহে ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা "১৬/১৭টা নৌকায় করে দু'দিন ধরে স্রোতের বিরুদ্ধে পাড়ি দিয়েছিল।" "নায়েব কালেক্টর, জমিদারদের চৌধুরী আর জমিদারদের বরকন্দাজ ও দাসদের কাছ থেকে" তারা সাহায্য পেয়েছিল।[২২] "গত দুই বছরে নায়েব কালেক্টর, জমিদারদের চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে" তারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।[২৩] ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুন লক্ষ্মীপুরের রেসিডেন্ট মিঃ হেনরী স্কট লিখেছিলেন ঃ "সবসময় আমি মনে করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এইসব লুঠতরাজের দোসর এবং রক্ষক হচ্ছেন জমিদারেরা।"[২৪] তিনি আরও লিখেছিলেন ঃ "সাধারণভাবে যেসব মানুষেরা ঐসব ডাকাতি করে থাকে তারা যেখানে ডাকাতি হয় সেখানকার বাসিন্দা বা সেই জেলার জমিদারের অধীন নয় . . . .।"

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের বীরকুল পরগণায় একটা বড় ধরনের ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ঐ বছরের ৩রা ডিসেম্বর "বীরকুল পরগণার ন'আনা অংশের জমিদার রাজা বল্লভ

ভুঁইয়ার আশ্রিত” প্রায় একশজন মানুষ “তাঁর ভাই এক অতি নিষ্ঠুর, অভাবগ্রস্ত ও অসংযত যুবক রাধাবল্লভ বাবুর প্রত্যক্ষ নির্দেশে এবং জামকুন্দহ নামক সন্নিহিত মারাঠা পরগণার একটি দলের সঙ্গে মিলিতভাবে” “বীরকুলে লবণ কাছারী অবরোধ এবং মোহরার (মুহুরি) ও চৌকিদারদের আটক করে সমস্ত মূল্যবান জিনিষপত্র লুঠ করেছিল এবং শেষে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। লুণ্ঠিত সরকারী অর্থের পরিমাণ ১,৮০০ টাকা বলে অভিযোগ করা হয়েছে।”[৪৫]

কাজেই জমিদারদের আশ্রয় এবং ডাকাতদের মধ্যেকার আন্তঃজেলা সংযোগটা ছিল বাংলাদেশের ডাকাতির দুই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ থেকে দুটো জিনিষ বোঝা যায়। প্রথমত, এক জেলার ডাকাতরা অন্য জেলায় যেতে পারত কারণ তাদের স্বধর্মী মানুষেরা সেখানে ডাকাতি করত না এবং বাইরে থেকে আসা ডাকাতদের জন্য ক্ষেত্রকে খালি রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, জমিদারেরা তাঁদের জেলায় অন্যদের লুঠতরাজকে মেনে নিয়েছিলেন। এ জন্যই বর্ধমান ও বীরভূমের রাজারা এবং মেদিনীপুরের ফৌজদার নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধার কালে[৪৬] একজনের দ্বারা অন্যের অঞ্চল লুঠের ঘটনাকে আমল দিতেন না।[৪৬ক] আবার মেদিনীপুরের ফৌজদার তাঁর জেলার ডাকাতদের মেনে নিয়েছিলেন কারণ কলকাতা থেকে কোম্পানী যে চাপ সৃষ্টি করত তাকে তিনি এই সব মানুষদের সাহায্যেই বাধা দিতে পারতেন।[৪৭] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় এই সময়েই জমিদারদের সশস্ত্র অনুচরের অধিকাংশই ডাকাতিকে পেশা হিসাবে নিয়েছিল। এর একটা কারণ, যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, তা হোল যে কোম্পানীর শাসনে তাঁরা এতই বেশী নিষ্পেষিত হতেন যে, এদের বেতন দেবার মতন অর্থ তাদের থাকত না। জমিদার বাহিনীর বেতন বাকি পড়াটা ছিল এ সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা।[৪৮] এরই ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে জমিদারেরা তাই নিজেদের অঞ্চলের বাইরে অন্যের অঞ্চলে ব্যাপক লুঠতরাজ করে জীবিকা নির্বাহের জন্য এইসব মানুষদের অনুমতি দিতেন। কিন্তু কেন? প্রথমত, কোম্পানী সরকারের প্রত্যক্ষ দোষারোপের হাত থেকে জমিদারেরা গা বাঁচাতে চেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, নিজেদের অঞ্চলকে তাঁরা সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন যেখান থেকে তাঁরা আর তাঁদের আমলারা রাজস্ব আদায় করতে পারতেন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে বীরভূমের পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে বোর্ড অফ রেভিনিউ মন্তব্য করেছিলেন ঃ “জেলাটি প্রচণ্ডভাবে আইন ও শৃঙ্খলার অভাবে ভুগছে, বর্তমানে এটা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে। ডাকাতি আর খুনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এর জন্য এর আরণ্যক পরিবেশ অংশতঃ দায়ী কিন্তু আমার (বীরভূমের কালেক্টর মিঃ রোলীর) মতে জমিদারের উদ্যমহীনতা এবং যথাযথ মনোযোগের অভাবেই এটা বেশী করে দেখা দিয়েছে — যেমন তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর আমলা ও কর্মচারীদের সকলেই কোনরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই যেমন ভাল বোঝেন সেইরকমভাবে কাজ ও দেশ থেকে রাজস্ব আদায় করেন।”[৪৯] এইসব আমলাদের মধ্যেকার দুর্বলতর শ্রেণী মাঝে মাঝে ডাকাতদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। কখন কখন অন্য জমিদারদের লুঠ করার জন্য বিভিন্ন পরগণার জমিদার, তালুকদার, চৌধুরীরা জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। তাই ১৭৭১

খ্রীস্টাব্দে সাইথিয়ার জমিদার সরকারের কাছে এক আর্জি পেশ করে বলেছিলেন যে, চন্দ্রদ্বীপের নায়েব রামশঙ্কর বক্সী, রামর্দুলভ তালুকদারের গোমস্তা শ্যামরাম চক্রবর্তী, কালিকাপুরের রাটাণ্ডী (রটন্তী) পরগণার কিষাণরাম চৌধুরীর গোমস্তা সীতারাম দত্ত, নাজিরপুরের আমাম-উল-দিন চৌধুরী এক বিরাট বরকন্দাজ বাহিনী ও ৫/৬ হাজার কুলি এনেছিলেন এবং তাঁর অঞ্চলের ফসল লুঠ করেছিলেন।[৫০] এটা হোল ডাকাতির ব্যাপারে আন্তঃপরগণা সমঝোতার ঘটনা। কখনও পরগণা আবার কখনও বা জেলাভিত্তিক এ ধরনের সমঝোতা বাংলাদেশে সবসময়েই ছিল। এ ধরনের সমঝোতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জমিদারেরা আর প্রায় আক্রমণেরই পুরোভাগে থেকেছিল জমিদারের ভেঙ্গে দেওয়া বাহিনীর লোকজন অথবা জমিদারের স্থায়ী বাহিনীর বেতন বাকি পড়া নিয়মিত সৈন্যরা কিংবা তাদের আমলারা। যেসব ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট সৈন্যরা ডাকাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের জড়ায়নি সেখানে তারা নিজেরা সরে গিয়ে ডাকাতদের আসতে ও কাজ করতে সাহায্য করেছিল। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে বর্ধমানের শেরগড় এবং সেনপাহাড়ী পরগণায় জীবনা নামে এক ডাকাত সর্দার ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ঐ বছরেই জীবনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজার চল্লিশজন পাইকের সঙ্গে কুঠির বিশজন সৈন্যকে পাঠান হয়েছিল। "প্রথম লড়াই-এ পাইকরা পিছু হটেছিল এবং বেতনের অভাবে বর্ধমানে ফিরে গিয়েছিল, আর রামগড়ের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লেসলি যদি পরবর্তী সাহায্য না পাঠাতেন তাহলে সম্ভবত আমাদের সব সিপাই-ই কাটা পড়ত আর জীবনাও কখনই ধরা পড়ত না।"[৫১] এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না। ফৌজদার, জমিদার, পাইক, আমলা ও ডাকাতদের মিলন সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার একটা ধারণা কোম্পানীর ছিল। আর সেজন্যই তহশীলদারের মাধ্যমে কোম্পানীর সামরিক কাজে সিপাই সংগ্রহের ব্যবস্থা তাঁরা ক্রমান্বয়ে গড়ে তুলেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জমিদার কিংবা তাঁদের জমিদারিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোম্পানী এইসব তহশীলদারদের নিয়োগ করেছিল। এই সময় বাংলাদেশের অনেক জমিদারিতেই কলকাতার বহু বেনিয়ান তহশীলদার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ডাকাতদের আন্তঃজেলা মিত্রতার সবথেকে বড় চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল চুয়াড় এবং সন্ন্যাসীরা। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কোম্পানীর অধিকাংশ নথিতে যাদের ডাকাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই চুয়াড়রা প্রকৃতপক্ষে ছিল কৃষক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর ভেরেলস্টকে দেওয়া এক চিঠিতে ভ্যান্সিটার্ট লিখেছিলেন : "আমাদের পশ্চিমদিককার জঙ্গলের পাহাড়ে বসবাসকারী বহুসংখ্যক চুয়াড় (যারা মালাঙ্গীদের মতন আদিবাসী) সন্নিহিত জেলাগুলোর বহু মানুষের সঙ্গে মিলিতভাবে বরাভূম ও ঘাটশীলা পরগণা আক্রমণ করেছিল।"[৫২] আবার ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কালেক্টর জেনারেল জেমস আলেকজাণ্ডারকে ভ্যান্সিটার্ট লিখেছিলেন : "তাঁরা, মেদিনীপুরের জমিদারেরা তাঁদের দেশকে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংসের দিকে যেতে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের চুয়াড়দের ডাকাতির ফলে সন্নিহিত পরগণাগুলো ভীষণভাবেই উত্যক্ত হয়েছিল।"[৫৩] এখানে জমিদারের লোকজন বোঝাতে "তাঁদের চুয়াড়" কথাটার ব্যবহার

খুবই তাৎপর্যব্যঞ্জক। নিজেদের এলাকার বদলে সন্নিহিত জেলাগুলোতেই তারা ডাকাতি করত। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মে জে. ফোরব্স সামুয়েল লুইসকে লিখেছিলেন ঃ "হলদি পোকার রায়তদের সঙ্গে কোন সংখ্যাগত মিল নেই চুয়াড়দের, যারা পাওনার সামান্যই দিত অথবা কিছু দিত না এবং নিজেদের নির্দেশমতো কোন কাজে যোগ দিতে অন্যদের বাধ্য করত, চুয়াড়রা তিন সেদারের (সর্দারের) অধীন — কল্লাপেটার (কলাপাত্র), মোহনসিং এবং লকিন দিগওয়ার। যা ছিল চিরপ্রচলিত তাদের তা দিতে আমি আদেশ দিয়েছিলাম, তারা আমাকে বলেছিল তারা যোদ্ধা, কৃষক নয়, তারা কখনই কোন রাজস্ব দেয়নি কিন্তু যখনই চাওয়া হয়েছিল তখনই তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তখন একটি বড় স্তূপকে ছোট করার (. . .) জন্য আমি একহাজার জন চুয়াড়কে আমার কাছে আনতে তাদের অনুরোধ করেছিলাম। একই জাতি এবং অর্থাৎ ভূমিজ হওয়ার দরুন তা করার কথা তারা চিন্তাও করতে পারেনি"।[৫৫] স্পষ্টতই এটা ছিল কোম্পানীর সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার একটি ঘটনা। মেদিনীপুরের জমিদারদের দমন করতে গিয়ে ইংরেজকে যে প্রচণ্ড অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, চুয়াড়রা তাদের জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। কাজেই মেদিনীপুরের ফৌজদার, কাশীজোড়ের রাজা আর জঙ্গলমহলের জমিদারেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তারই প্রেক্ষাপটে চুয়াড়দের ডাকাতিকে বিচার করতে হবে। আধুনিক গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সিলদার (সিলদহ) জমিদার মানগোভিনের (মানগোবিন্দ) নেতৃত্বে ডোমপাড়ার পাইকরা মেদিনীপুরে লুঠতরাজ করেছিল। এ ধরনের লুঠতরাজকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে সীমান্তবর্তী জমিদারদের সাধারণ প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটেই বিচার করা হয়েছে।[৫৬] এর থেকে বাংলাদেশের ডাকাতির ঘটনার অন্তত একটা অকথিত রাজনৈতিক দিকের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

(৪) বিদ্রোহ নয়

উপরের আলোচনা থেকে এ রকম একটা সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে, বাংলাদেশের ডাকাতিটা মূলত ইংরেজের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। এটা সত্যি যে, জমিদার এবং তাঁর অনুগামী যাঁরা ডাকাতি করতেন তাঁরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটা ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন এবং কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, সাধারণ ইংরেজ, ইংরেজ কুঠি, কোম্পানীর সম্পদ আর প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের সঙ্গে জড়িত যে কোন জিনিষকেই তারা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তবুও এটাই সব নয়। বাংলার ডাকাতিটা ছিল একটা সংগঠিত ব্যবস্থা, একটা সংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস যা দুটো উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছিল। প্রথমত, এটা কোম্পানীর দেশব্যাপী সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ দিয়ে কিছুটা নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তা কোম্পানীর দেশের নিরঙ্কুশ সম্পদ লুণ্ঠনে বাধা দিয়েছিল। ব্যাপক অর্থে এটাই হোল বাংলাদেশে ডাকাতির রাজনীতি ও অর্থনীতি। ডাকাত হয়ে কৃষকেরা যখন শ্রমের নিয়মতান্ত্রিক বাঁধাধরা কার্যসূচীর বাইরে পা দিয়েছিল ডাকাতে পরিণত হয়ে জমিদারেরা তখন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ গণ্ডির বাইরে চলে গিয়েছিলেন। দেশের

সম্পদ লুণ্ঠনে বাধা দিলে দেশের সম্পদ দেশেই থাকে। ধনীর লুক্কায়িত ধনকে লুঠ করে সমাজে ছড়িয়ে দিলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থসঙ্কট কমে, অর্থের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যায় না। এই কাজটিই ডাকাতরা করেছিল বাংলাদেশে। নিজেদের সন্ত্রাস দিয়ে রাষ্ট্রের সন্ত্রাসকে রুখে দেওয়ার সুসাহস সংঘবদ্ধ সামাজিক ডাকাতির মধ্যে দেখা গিয়েছিল। অভূতপূর্ব রাষ্ট্রিক শোষণের ফলে নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলার বাইরে সমবেত হয়েছিল সর্বস্বহারানো ছোট পর্যায়ের জমিদার, শাসক ও শ্রমিক — কৃষক — রচিত হয়েছিল সংঘশক্তির প্রত্যয়ে দৃঢ় এক মানববন্ধন। এক অভিনব মানব-বলয়ের অন্তঃকরণ থেকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল মরিয়া কৃষকের যন্ত্রণাবিদ্ধ তেজ। সমস্ত সামাজিক ডাকতির তারাই ছিল প্রাণশক্তি। তারা প্রতিরোধ দিয়েছিল, বিদ্রোহ করেনি। প্রশ্ন ওঠে কেন কৃষকরাই এই অভিনব কর্মপন্থায় অগ্রণী হয়েছিল? কেন জমিদাররা বিদ্রোহের ধ্বজা না তুলে সামাজিক ডাকাতির প্রকরণে নিজেদের নেতৃত্বের দক্ষতাকে জুড়ে দিয়েছিলেন? তার কারণ নিম্নরূপ।

ইতিমধ্যেই যা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিযুক্ত হয়ে সমাজের বিভিন্ন কোণে সঞ্চিত হয়েছিল সেই গুপ্তধনের সন্ধান এইসব কৃষকেরা করতে পারত। আর সরকারের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেওয়া জমিদারেরা আপন রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা অর্থনৈতিক প্রাচুর্য অর্জনের লক্ষ্যে এইসব কষ্টসহিষ্ণু গ্রাম্যজনেদের পরিচালনা ও কাজে লাগাবার মধ্যে দিয়ে স্ববৃত্তির চরিতার্থতার সন্ধান করতে পারতেন। এরই সম্মিলিত ফল হল এক সামাজিক হিংস্রতার প্রকাশ যা শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ বা বিপ্লব কোনটাই নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাপক সামাজিক আকারে কোন বিদ্রোহ গড়ে তোলার ব্যাপারে পল্লী বাংলা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ছিল। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবও তখন সম্ভব ছিল না। আর তাছাড়া বিগত দু'শ বছর ধরে গড়ে ওঠা এক শ্রেণীদীর্ণ সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকার দরুন কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর পক্ষে বিদ্রোহ শুরু করাও সহজসাধ্য ছিল না। কাজেই একটা সাধারণ দুর্বলতা ও অবক্ষয়ের সামনে সমাজের একমাত্র গতিশীল অংশ জমিদারদের নেতৃত্বে সকল শ্রেণীর মানুষের এক সাধারণ মিলনকেই আমরা সামাজিক ডাকাতির মধ্যে দেখতে পেয়েছি। প্রাথমিক পর্বের ইংরেজ শাসনের রাজনৈতিক অত্যাচার, যার বিরুদ্ধে মীরকাশিম ও মীরজাফরের বিরক্তি এবং ভারতীয় তথা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা খেদ প্রকাশ করেছিলেন তা যুক্ত হয়েছিল এক দুর্দমনীয় অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে। এই দুইয়ের মিলনই সমাজিক ডাকাতির প্রবণতাকেই পুষ্ট করেছিল। পুরানো পল্লী সমাজের গ্রাম্য বন্ধনের আসক্তি থেকেই এসেছিল মিলনের প্রকৃত বন্ধন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের ডাকাতেরা ছিল বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক প্রতিরোধকারী ও সামাজিক সন্ত্রাসবাদী। স্বভাবসিদ্ধ অপরাধপ্রবণ অন্ধকার জগতের জীব তারা ছিল না। কৃষকেরা দুর বনভূমির আড়াল-করা জগতের বাসিন্দা কিংবা জমিদারেরা ব্যারণ দুস্য ছিলেন না। যৌথভাবে যে সন্ত্রাস তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন সেটা কোম্পানীর অপশাসনের বিরুদ্ধে সমভাবে কাজ করেছিল। যতদূর পর্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী ও ইংরেজের হাতে সঞ্চিত সম্পদের অনুসন্ধান তাঁরা করেছিলেন ততদূর পর্যন্ত তাঁরা কেড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এইভাবেই

বিদেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শ্রেণীবিদ্বেষ এই দ্বৈত ভাগাবেগকে তৃপ্ত করেছিল বাংলাদেশের ডাকাতি। আর এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর কাহিনী। ডাকাতরা এককভাবে দস্যু ছিল না কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক দস্যুদল তারা গড়ে তুলেছিল। তবে সে যাই হোক না কেন, তারা কখনই সমাজ বিরোধী ছিল না আর সমাজ সীমার বাইরেও তারা কখনই কাজ করেনি। জমিদার-কৃষক ঐক্যের পতাকাতলে ডাকাতিটা অন্তত বিদেশী আঘাতের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদের একটা পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে, ডাকাতিটা ছিল ব্যাপক অর্থে বিদেশী বিরোধী এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে ইংরেজবিরোধী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে সামাজিক প্রতিবাদ আর রাজনৈতিক বিদ্বেষ চেতনার একমাত্র সংগঠিত ও স্থায়ী অভিব্যক্তি ছিল ডাকাতি যা সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল ও সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করেছিল। এটাই হোল চরম বক্তব্য যাকে অনুসরণ করে আমরা ডাকাতিকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত না করেও জাতীয় প্রতিরোধের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি।

পাঠটীকা

(১) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে (চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) লিখেছেন ঃ "প্রতাপ জমিদার এবং তিনি দস্যুও। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন।" "আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দান্ত শত্রুর দমনের জন্যই তিনি দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়নের জন্য করিতেন না।"

(২) কৃষকদের ডাকাতে পরিণত হওয়ার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে (Controlling Council of Revenue at Murshidabad) রউস (Rous) লিখেছিলেন, "কিছু সংখ্যক কৃষক, যারা এতদিন পর্যন্ত প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে সচ্চরিত্র ছিল, নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য এই চরম বেপরোয়া পথের আশ্রয় নিয়েছে।" — Progs. of Controlling Council of Revenue at Murshidabad, Vol. V, পৃঃ ৬৩। এডওয়ার্ড বেবারকে জে. ফোরবস্ লিখেছিলেন (তারিখ নেই) ঃ "পাহাড়ের এই দিকের সমস্ত চুয়াড় কৃষকেরা এসেছে এবং তারা তাদের রাজস্বের মীমাংসা করতে প্রস্তুত।" — Midnapur Dist. Records. Vol. II. পৃঃ ১৩০।

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন রিচার্ড গুডল্যাড রাজস্ব পরিষদকে লিখেছিলেন ঃ "আমি বিশ্বাস করি ডাকাতরা হচ্ছে এমনই সব মানুষ যারা দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষক হিসাবে বাস করে . . . . "

Rangpur Dist. Records. Vol. I. পৃঃ ৮৪।

১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের রঙপুরের ফৌজদার মীর জয়নুল আবেদিন জানিয়েছিলেন যে, দিনের কৃষক রাতে ডাকাত হয় — Progs. of the Controlling Council of Revenue at

Murshidabad, Vol. V, পৃঃ ৬৩। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল সি. ডব্লু. বাউটোন রউসের কাছ থেকে পাওয়া।

তাদের "দলগুলো অস্থির কৃষক জনতার দ্বারা স্ফীত হয়ে উঠেছিল" — এন. কে. সিংহের ***Economic History of Bengal, Vol. II***, পৃঃ ৬৪।

(৩) চুয়াড়দের সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য ফারমিঙ্গার সম্পাদিত Midnapore Dist. Records-এর সব কয়টি খণ্ড, এ. কে. মিত্র সম্পাদিত আদমসুমারী রিপোর্টে পুনর্লিখিত জে. সি. প্রাইসের ***Chuar Rebellion in the Jungle Mahals***, মেদিনীপুর, ১৯৫১, বিনোদ, এস. দাসের ***Civil Rebellion in the Fronther Bengal***, কলিকাতা, ১৭৭৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) হিন্দু সৈনিকদের মধ্যে রাজপুতেরাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এই আমলে জমিদারেরা তাঁদের অনুচর হিসাবে রাজপুতদের নিয়োগ করতেন। কোম্পানীর শাসন এইসব রাজপুতদের দলকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। ফলে তারা দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছিল।

(৫) সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিষয়ে বিশদ পাঠের জন্য যামিনীমোহন ঘোষের ***Sannyasi and Fakir Raders of Bengal***, এ. এন. চন্দ্রের ***The Sannyasi Rebellion***; হান্টারের ***Annals of Rural Bengal***. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ***Dawn of New India*** পৃঃ ২২, এল. এস. এস. ও. মালির ***History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule*** দ্রষ্টব্য। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, সন্ন্যাসী ও ফকিররা বাংলার বাইরে থেকে এসেছিল। এটা যদি সত্যিই হয় তবে বাঙালী সমাজে তাদের কর্মকাণ্ড লাভ ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার।

(৬) আমাদের আলোচ্য সময়কালে মাঝি ও দাঁড়িরা প্রায়ই ডাকাত হোত। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে মিঃ রোজ (Rose) নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক বহু ধনদৌলত নিয়ে সুন্দরবন থেকে যাচ্ছিলেন। পথে বাখরগঞ্জের কাছে নৌকার লোকজন তাঁকে হত্যা করে। স্থানীয় জমিদার সীতারাম এইসব খুনীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তদন্তে জানা গিয়েছিল যে, "মাঝি এবং দাঁড়িরা ছিল সাধারণ ডাকাত এবং বাখরগঞ্জের জমিদার যে হত্যাকারীদের গোপন উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পর তাঁর আচরণ থেকে পরিষ্কারভাবেই বোঝা গিয়েছিল।" (Long ***Selections***, Nos. 723, 767, 775, 843 এবং *C.P.C.* Vol. I. Nos. 2464 এবং 2478)

(৭) 'মশালচী' কথাটার অর্থ মশালবাহক। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্ট বিজু মাশালচীকে ডাকাতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। (এইচ. এস. ভাটিয়া, ***Origin and Development of Legal and Political System in India, Vo. II***, পৃঃ ৬৪))।

(৮) বরকন্দাজদের দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করাটা ছিল এক সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হোল বরখাস্ত বরকন্দাজেরা রুজির খোঁজে দূর দূর অঞ্চলে যেত এবং সেখানে ডাকাতি করত। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে একদল বরকন্দাজ কাজের আশায় গৃহযুদ্ধ কবলিত আসামে ও

কুচবিহারে গিয়েছিল। যোগীগোপা গ্রামের কাছে তারা সমবেত হয়েছিল। সেখানে অবস্থানরত সিপাইদের নায়ক লেফটেন্যান্ট পারসেল রাঙ্গামাটির সাজোয়াল বীর নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে তাদের চলে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। "তখন এইসব মানুষেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের তলোয়ার দিয়ে তাঁকে আর তাঁর সাজোয়ালকে কেটে টুকরো করে ফেলে" — Revenue (Judicial) Prodgs.. Vol. IX, ৮ই জুলাই, ১৭৯১; কুচবিহারের কমিশনারের পত্র, তাং ১৮ই জুন ১৭৯১।

ঐ বছরেই ময়মনসিংহে একদল বরকন্দাজ শীয়ারপোর (শেরপুর) পরগণা লুঠ করেছিল। তারা করিবারীর (খড়িবাড়ি) জমিদারের কাছ থেকে সর্বদাই মদত পেত। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ও ২০শে মে ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে এ কথা লিখেছিলেন। [Rev. (Judicial) Prodgs. Vol. VIII] ১৩ই মে, ১৭৯১।

ঐ ম্যাজিস্ট্রেট অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন এবং "সাধারণভাবে পাহাড়ের সীমান্তবর্তী পরগণাগুলো থেকে বক্সারিদের (বরকন্দাজদের)" সকলকেই তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল তাঁর অতিরিক্ত সৈন্যের আবেদনকে মঞ্জুর করলেও দ্বিতীয় সিদ্ধান্তকে এই যুক্তিতে বাতিল করে দিয়েছিলেন যে, "এই ধরনের কাজ অপরাধীদের সঙ্গে নিরপরাধদেরও বিপদে ফেলবে"। (পূর্বোক্ত নথিভুক্ত কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য)। এই বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, সাধারণভাবে ডাকাতদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করাটা এতই দুষ্কর ছিল যে তাদের বিতাড়িত করার জন্য কোনরকম প্রয়াস চালনই সম্ভবপর ছিল না।

(৯) রেভারেণ্ড জে. লঙ, ***Selection***, নং 504 ও 507।

(১০) সে সময়কার মোগল ও ইংরেজের সরকারী কাগজপত্রে 'গ্রাম সেরেনজামি' কথাটা আমরা পেয়ে থাকি যার অর্থ হোল "রাজস্ব আদায়কারীদের আদায় কার্যে সাহায্য করার এবং গ্রামের ও ক্ষেতের শস্যের দিকে নজর রাখার জন্য প্রদেশের প্রতিটি গ্রামে অবস্থানরত পিয়ন ও পাইক, যারা গ্রামের মধ্যে সমস্ত চুরির জন্যও দায়ী থাকত' — লঙের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নং 954।

(১১) কলকাতা 'কাচেরীর' (কাছারি) পিয়নরা প্রায়ই হুগলীতে যেত এবং সেখানকার বাসিন্দাদের উত্যক্ত করত বলে হুগলীর ফৌজদার গভর্ণরের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। (সি. পি. সি. ভল্যুম-১, নং ২১৫৭)। অনেক সময় সরকারী আদেশে পিয়নরা হুগলী যেত। এইভাবে ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন রাজমিস্ত্রিকে কাজে লাগাবার জন্য পিয়নদের হুগলী ও চন্দননগরে পাঠান হয়েছিল (পূর্বোক্ত গ্রন্থ নং ১৬২১)। আবার ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজ গোমস্তার প্রহরী হিসাবে পিয়নরা সেখানে প্রেরিত হয়েছিল (একই গ্রন্থ, নং ২২৩০)।

(১২) ফারমিঙ্গার, ***Fifth Report***, পৃঃ ১৪২।

(১৩) হিউ ওয়াটস গভর্ণর হলওয়েলকে এ কথা জানিয়েছিলেন. ১৭৫৯ খ্রীঃ, ফারমিঙ্গার কর্তৃক উদ্ধৃত, ***Fifth Report***, পৃঃ ১৪২-১৪৩।

(১৪) একই গ্রন্থ।

(১৫) লঙ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ নং ৫৫৮।

(১৬) লঙ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ নং ৭২৩, ৭২৫, ৮৪৩।

(১৭) বেচারকে জন গ্রোস লিখেছিলেন, ২০শে এপ্রিল, ১৭৭০ খ্রীঃ, ফারমিঙ্গার সম্পাদিত Rangpore Dist. Records, Vol. I, পৃঃ ৪। জনৈক হুসেন রেজা খাঁ "তার জাগিরের (জায়গীর) অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করে লালবাড়িতে সরকারী জমি অবৈধভাবে দখল করেছিলেন" — বেচারকে গ্রোস, একই গ্রন্থ। "আমি জানতে পেরেছি, তস্করদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ (আশ্রয়) হওয়ায়, উক্ত লোলবারী (লালবাড়ি) দেশের পক্ষে ক্ষতিকর" -- পূর্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একে অন্যকে লিখেছেন, ২৩শে জুন, ১৭৭০।

(১৮) Prodgs. of C. C. at Dacca (Vol. IV, পৃঃ ১৫১-১৫২), ২৪শে নভেম্বর, ১৭৭২ খ্রীঃ, ক্লড রাসেলের এ্যাটর্নিগণ এবং নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (C.C.R.) ঢাকার কালেক্টরকে লিখেছিলেন।

(১৯) এফ. বি. ব্রাডলে-বার্ট কর্তৃক উদ্ধৃত, *'Sylhet' Thackeray*, লণ্ডন, ১৯১১, পৃঃ ১৪৭।

(২০) একই গ্রন্থ।

(২১) মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদ দিনাজপুরের সুপারভাইজারকে লিখেছিলেন, ৭ই মার্চ, ১৭৭১, Prodgs. of C.C.R. at Murshidabad (Vol. iv). ৭ই মার্চ, ১৭৭১।

(২২) সিলেটের সুপারভাইজার উইলিয়াম মেকপীস থ্যাকারেকে জেমস গালাওয়ে, তাং—সিলেট, ২৬শে জুন, ১৭৭২, Prodgs of C.C. at Dacca. ১০ই অক্টোবর, ১৭৭১, পৃঃ ৩৪।

(২৩) Prodgs. of the C.C. at Rungpore. ২৩শে ডিসেম্বর, ১৭৭২। জমিদার যে ডাকাতদের আশ্রয় দিতেন সেটা মনে রেখেই নিয়ন্ত্রণ পরিষদ তাঁকে উচ্ছেদের সুপারিশ করেছিলেন। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন, "রাজস্ব ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দরুন তাঁর (কোন জমিদারের) জমি নিলাম হোত না এবং তা কেবলমাত্র বাজেয়াপ্ত হতে পারত দুটো কারণে — চোর-ডাকতদের আশ্রয় দিলে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে" -- ***Economic History of Bengal, Vol. II***, পৃঃ ৪।

(২৪) *Prodgs. of the G.G. (Governor General) in Council*, ১৯শে এপ্রিল, ১৭৭৪।

(২৫) রাজস্ব পরিষদকে রিচার্ড গুডলাড জানিয়েছেন, ২৪শে জুলাই, ১৭৭৪, Rangpore Dist. Records. Vol. I. ফারমিঙ্গার সম্পাদিত, পৃঃ ৯৯।

(২৬) সাময়িকভাবে মুর্শিদাবাদের কালেক্টবের দায়িত্বপ্রাপ্ত জন ফেনডালকে জর্জ হাচ লিখেছিলেন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮। Dingpore Dist. Records, পৃঃ ১৪৭। মিঃ হাচ লিখেছিলেন যে, "এইসব লুণ্ঠনকারীরা (ফকিররা) জমিদারদের কাছে আশ্রয় পায়," — তদেব।

(২৭) ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে টমাস এমব্রির ***Charles Grant and British Rule in India*** তে, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৬২, পৃঃ ৯২। এমব্রি লিখেছেন, "জমিদারেরা, (চার্লস) গ্রান্ট নিশ্চিত ছিলেন, কেবলমাত্র ডাকাত দলের, যারা মালদহ অঞ্চলে জীবন ও সম্পত্তিকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণেই যে শুধুমাত্র ব্যর্থ হয়েছিলেন তা নয় প্রকৃতপক্ষে বহুক্ষেত্রেই তারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাদেব লুণ্ঠিত দ্রব্যে ভাগ বসিয়েছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে জগন্নাথপুরে তাঁর কুঠির উপর বহুসংখ্যক ডাকাতের আক্রমণ গ্রান্টকে সেটাই (সেই ধারণাই) পাইয়ে দিয়েছিল যেটা তাঁর কাছে ডাকাতদের সঙ্গে জমিদারদের যোগসাজসের অভ্রান্ত প্রমাণ বলেই মনে হয়েছিল। গ্রান্ট তাঁর নিজের লোকজনকে পাঠিয়েছিলেন -- যাকে নিন্দা করে দিনাজপুরের কালেক্টর বেসরকারী সৈন্য বলে বর্ণনা করেছিলেন — এবং পঞ্চাশজন ডাকাতকে ধরেছিলেন। ডাকাতদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে গ্রান্ট আবিষ্কার করেছিলেন যে, জমিদারের এক আত্মীয়ের নির্দেশেই এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল এবং কুঠি থেকে লুণ্ঠন করা জিনিষপত্র জমিদাবের বাড়ীতে তোলা হয়েছিল"—একই গ্রন্থ। জর্জ হাচকে চার্লস গ্রান্টও লিখেছিলেন, ২০(মাস), ১৭৮৬, Dinajpore Dist. Records, পৃঃ ১৪।

(২৮) Letter Copy-Book of the Resident at the Darbar at Murshidabad. Vol. II, পৃঃ ৭, আর. উইলমোট রিচার্ডবেচারকে জানিয়েছিলেন, ২৯শে আগস্ট, ১৭৭০।

(২৯) রণজিৎ গুহ, ***A Rule of Property for Bengal***. মৌটন এ্যাণ্ড কোং, ১৯৬৩, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ড, " . . . . সামাজিক নেতৃত্ব দানের প্রবল শক্তি বাংলার জমিদারদের তখনও ছিল" — পৃঃ ১০৯।

(৩০) ইংরেজের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ফকির নেতা মজনুশাহ নাটোরের রানী ভবানীর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

(৩১) তেলিঙ্গা বা তিলিঙ্গারা ছিল ম্যাঙ্গালোর, তেলিচেরী, তামিল ও তেলেগু থেকে সংগৃহীত মোপলা ও অন্যান্য মুসলমান এবং হিন্দু সৈনিক — আর. সি. মজুমদার, ***Sepoy Mutiny***. কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৩০। "অদ্যাবধি মুখ্যত মাদ্রাজ আর এমন কি বোম্বাই থেকে আনা সৈনিকদের সাহায্যেই কোম্পানী বাংলাদেশ ও উত্তর ভারতের বেশীর ভাগ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল — ১৭৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভের আনা প্রথম তেলেগু ভাষী সৈন্যবাহিনীর থেকেই এখন তাদের নাম হয়েছে তিলাঙ্গা" — আব্দুল মাজেদ খান, ***The Tansition In Bengal 1756-1775 : A Study of Muhammad Reza Khan***, পৃঃ ১২৩। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে নবাব মীরজাফর খান ইংরেজকে জানিয়েছিলেন যে, তিনশ

তেলিঙ্গা বীরভূমে পালিয়ে গিয়ে সেখানে রাজার অধীনে কাজ নিয়েছিল। প্রায় এই সময়েই বর্ধমান ও বীরভূমের রাজারা এবং মেদিনীপুরের ফৌজদার ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন — লঙের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নং ৪৯৭।

(৩২) দু'তিন হাজার অশ্বারোহীসহ মারাঠারা বীরভূমের রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আর বর্ধমানের জমিদার তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করেছিলেন বলে নবাব মীরকাশিম ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের জানিয়েছিলেন — লঙের পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, নং ৫৩৬।

(৩৩) কুচবিহার ও রঙপুরের ছোটখাট জমিদারেরা ভুটিয়াদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। Prodgs. of C. C. at Rangpore. ২১শে ডিসেম্বর, ১৭৭২।

(৩৪) লঙের পূর্বোক্ত রচনায় বলা হয়েছে, নং ২৪ ও ২৭৬।

(৩৪ক) ফকির নেতা ফারগল সাউ (পারগল শাহ) মুর্শিদাবাদে অসুস্থ থাকাকালে কানেহান মুসিদা পরগণার ঘিদুসা গ্রামের জনৈক কিনু দেওয়ান তাকে দেখাশুনা করেছিলেন ও আশ্রয় দিয়েছিলেন। ইংরেজ সৈন্য যখন ফারাগলকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল তখন তিনিই তাকে জঙ্গলে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ফেন্ডলকে জি. হাচ জানিয়েছিলেন, ২০শে অক্টোবর, ১৭৮৮, Dinga Dist. Records. Vol. I. পৃঃ ১৬১। দশশালা বন্দোবস্তের অব্যবহিত পূর্বেকার এই ঘটনাটা পলাশী যুদ্ধের প্রায় একবছর আগে (১৭৫৬) সিরাজের কলকাতা আক্রমণকালে কান্তবাবু কর্তৃক কাশিমবাজারে হেস্টিংসকে আশ্রয় দেবার ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত।

(৩৫) এর অর্থ এই নয় যে, ডাকাতরা কলকাতায় সক্রিয় ছিল না। কলকাতা ভীষণভাবেই ডাকাত উপদ্রুত ছিল। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ কোর্ট অফ ডিরেকটর্সের লেখা এক চিঠি থেকে (১২২ অনুচ্ছেদ) আমরা জানতে পারি যে, নদী তীরবর্তী কলকাতা সুরক্ষিত না হওয়ার দরুন কোর্ট "রাত্রি দশটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত অবিরাম টহল দেবার জন্য চাপরাসধারী একদল ইউরোপীয় প্রহরী" নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের ফৌজদার গভর্ণরের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, মেদিনীপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই রাহাজানে (Highwaymen) ভরে ছিল এবং পাছে তারা তাঁকে হত্যা করে এই ভয়ে তিনি বাইরে যেতে সাহস করেন নি। একটা সামরিক জেলার শাসক একজন ফৌজদারের এই বিবৃতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ (সি. পি. সি. ১, নং ৬৩৫)। এইভাবে কলকাতা থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পুরো এলাকাটা ডাকাতদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। একইভাবে হুগলী আর কলকাতার মধ্যবর্তী অঞ্চলের ওপরও কোম্পানী বা নিজামত কারুরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক না রেখেই দুই শহরের মধ্যে পিয়ন আর চোবদারের দল সশস্ত্র ডাকাতির বাসনায় অবাধে ঘুরে বেড়াত (সি. পি. সি. ১, নং ১৯৩২, ২১৫৭)। চোর, ডাকাতদের ওপর কোতয়ালের কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না এবং কোম্পানীর শাসকদের সন্দেহ ছিল অন্যরকম। তাই চন্দননগরের কোতয়ালকে গভর্ণর ফিরিয়ে এনেছিলেন

ও হুগলীর ফৌজদারের কাছে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, "তাকে (কোতয়ালকে) কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হোক" (সি. পি. সি. ১, নং ২১৫৯)। যশোরের জমিদারের নায়েব বাবুরাম যশোর থেকে অভিযোগ করেছিলেন যে, কলকাতা 'কাচেরীর' (কাছারি) পিয়ন এবং সিপাইরা সেখানে উৎপীড়ন করেছিল (সি. পি. সি. ১১, নং ১১১১)। এইসব মানুষেরাই ডাকাতি শুরু করেছিল। বর্ধমানের রাজার অভিযোগ ছিল যে, মেজর হোয়াইটের বাহিনী প্রায়ই ডাকাতি করত (সি. পি. সি. ১, নং ৭০১) তেলিঙ্গাদের ডাকাতি করাটা ছিল এক সাধারণ ব্যাপার। মেদিনীপুরের ফৌজদার ডাকাতদের দমন করতেন না কারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে এইসব লোকজনই তাঁকে সমর্থন করত। হুগলীর ফৌজদার কলকাতার পিয়নদের অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করতেন কেননা তিনি নিজেই তাঁর লোকজনকে বর্ধমানে পাঠাতেন (লঙের পূর্বোক্ত রচনা, নং ৬৮৩)। যশোরের জমিদারেরা ডাকাতদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। এইরকম পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই ডাকাতেরা এলাকাভিত্তিক শাসন গড়ে তুলেছিল। এছাড়া সুন্দরবন থেকে লক্ষ্মীপুর অথবা বাখরগঞ্জ (লঙ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নং ৭৭৫) কিংবা হুগলী থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ডাকাতদের ঘুরে বেড়াবার আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? (লঙের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নং ৬৬৩)।

(৩৬) ৩৫ দ্রষ্টব্য।

(৩৭) এ ছিল বাংলার ডাকাতদের হুগলী — মেদিনীপুব — যশোর — কলকাতা অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র অন্য এক অঞ্চল যাকে ডাকাতির উত্তরাঞ্চল বলা যেতে পারে।

(৩৮) ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালি) থেকে ডাকাতরা ঢাকায় যেত। এইসব জেলা নিয়েই গড়ে উঠেছিল ডাকাতদের পূর্বাঞ্চল।

(৩৯) ডাকাতিটা ছিল কোম্পানীর রাজস্ব ক্ষতির অন্যতম কারণ। ডাকাতদলের রাজস্বে বাধা দান এবং লুণ্ঠনের কাহিনী সম্পর্কে এখনও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

(৪০) কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকের বাংলার ডাকাতি সমস্যাটাকে পিয়ন, সিপাই প্রভৃতিদের দ্বারা সম্পাদিত সাধারণ লুণ্ঠন সমস্যার সঙ্গে ভ্রান্তভাবে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে।

(৪১) Rev. (Jud.) Prodgs., Vol. II, Part I, ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে এ কথা লিখেছিলেন।

(৪২) Rev. (Jud.) Prodgs., Vol. I, শ্রীহট্ট থেকে মিলার রাজস্ব বিভাগের অবর সচিব (Sub-Secretary) জি. এইচ. বার্লোকে লিখেছিলেন এ কথা, ফোর্ট উইলিয়াম, ৮ই আগস্ট, ১৭৯০।

(৪৩) একই গ্রন্থ।

(৪৪) Rev. (Jud.) Prodgs., Vol. II, Part I, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৯০।

(৪৫) মিঃ চ্যাপম্যান লবণ দপ্তরের সচিবকে জানিয়েছিলেন, ফোর্ট উইলিয়াম, ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৯০ এবং ১৭ই ডিসেম্বর ১৭৯০, ***Midnapore Salt Paper***, পৃঃ ১১৮-১১৯।

(৪৬) ইংরেজ ও বাংলার নাম সর্বস্ব নবাবী শাসনের বিরুদ্ধে বর্ধমান, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজারা এবং মেদিনীপুরের ফৌজদার জোট বেঁধেছিলেন। আর সম্ভবত নন্দকুমারও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যিনি সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম নামে পরিচিত হয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্যহীন বিচরণকারী যুবরাজ আলি গহরের অধীনে তাঁরা সমবেত হতে চেয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য : সিয়ার-উল-মুতাখেরিন, ২, পৃঃ ৩৪৬, কে. কে. দত্ত, ***Shah Alam II and The East India Company***, পৃঃ ১১, লঙের পূর্বোক্ত রচনায় উল্লেখ হয়েছে, নং ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০১, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৬, ৫০৭, ৫১২, ৫১৬, ৫১৯, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৭, ৫৩৯, ৫৫৩, ৫৫৮।

(৪৬ক) লঙের পূর্বোক্ত গ্রন্থে একথা বলা হয়েছে, নং ৪৯০।

(৪৭) সি. পি. সি. ১, নং ৬৩৫।

(৪৮) "সৈন্য পরিচালন ব্যবস্থায় তাঁদের বিস্ময়কর ভ্রান্তিটা ছিল এদেশে পুনঃ পুনঃ বিপ্লবের আর এক বড় কারণ। তাঁদের পুরো বাহিনীটাই হচ্ছে বড় বড় কর্তৃত্বাধীনে (Commands) বিভক্ত এবং রাজকোষ থেকে বেতন বাবদ অর্থ প্রতিটি দলের নিজ নিজ সেনানায়কদের হাতে দেওয়া হয়; এর ফলে সৈনিকেরা যাঁর কাছ থেকে বেতন পায় কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিকেই মান্য করে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁরই অনুরক্ত হয়, অবশ্য এর ব্যতিক্রম হোল সম্রাটের বা সুবার প্রাদেশিক নবাবের দেহরক্ষীরা, যাদের বেতন তিনি নিজেই দিয়ে থাকেন এবং এইসব উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একধরনের ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই তিনি শুধু চেষ্টা করেন; কেবলমাত্র এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পরিবর্তে সকলকেই তাঁর অনুরাগী করে তোলার দিকে তিনি মন দেন না, তিনি তাঁর শক্তির সাহায্যেই অবশিষ্টদের মধ্যে ভীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন এবং ভীতির সাহায্যেই তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করেন; যা আরও বেশী বিস্ময়কর তা হোল বেতন হারাবার ভয়ে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এরকম একটা ভুল ধারণার বশে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর বেতন প্রচুর পরিমাণেই বাকি রাখেন; এরই পরিণতিতে আক্রমণকারী মোটামুটি ভাল প্রস্তাব দিলে সাধারণ অফিসারদের সপক্ষে পেয়ে যান আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিপ্লব ঘটে যায়; অন্যথায় তারা তাদের বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে যেতে রাজী হয় না; তাদের সন্তুষ্ট করার পক্ষে রাজকোষও বোধ হয় খুবই দুর্বল; আর এই বিলম্বের ফলে শত্রুপক্ষ শক্তি সংগ্রহের সময় পায়" — স্ক্রাফটন, "***Reflections on the Government etc. of Indostan etc.***" **1763, *A History of Bengal Before And After the Plassey* (1739-1758)** নামে পুনর্মুদ্রিত। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫, পৃঃ ২৯-৩০।

(৪৯) বোর্ড অফ রেভিনিউকে বীরভূমের কালেক্টর, ৭ই মার্চ, ১৭৮৬, Prodgs. of Board of Revenue, ৭ই জুন, ১৭৮৬।

(৫০) Prodgs of C.C.R. Vol. IV. ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের দু'জন সরকার, একজন জমাদার, একজন সিপাই এবং দুজন চাপরাশী নিজেদের হুগলীর কালেক্টর মিঃ রবার্ট হোমের কর্মচারী বলে পরিচয় দিয়ে হুগলীর সরকারী শুল্ক ভবন বলপূর্বক দখল করেছিল—সরকারী শুল্ক সমাহর্তা (Collector of Customs) চার্লস কোটস্ রবার্ট হোমকে জানিয়েছিলেন, হুগলী, ১৬ই জুন, ১৭৮৬, Prodgs. B.O.R., ২৮শে জুন, ১৭৮৬। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন শ্রেণী ও পদমর্যাদার মানুষদের মিলন ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার।

(৫১) বর্ধমানের অস্থায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কালেক্টর টমাস ব্রুকের পত্র, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮, বর্ধমানের কালেক্টরেটের প্রথম আমলের নথি, ১৭৬৪-১৭৯০ (***Early Collectorate Records of Burdwan 1786-1790***)। বি পি পি. ভল্যুম ৬, নং ১৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯১০, পৃঃ ২৩৫।

(৫২) ফারমিঙ্গার সম্পাদিত Midnapore Dist. Records, Vol. II. পৃঃ ১৩০।

(৫৩) একই গ্রন্থ।

(৫৪) সম্ভবত হলদিয়াপুকুর, সমকালীন মেদিনীপুর নথিতে যার উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়।

(৫৫) ৫১ নং দ্রষ্টব্য।

(৫৬) বিনোদ. এস. দাস, ***Civil Rebellion In The Frontier Bengal,* 1760-1805**; কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৬২-৬৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট

সরকারী রাজস্ব লুঠ, ইংরেজ হত্যা এবং ইংরেজ কুঠি আক্রমণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১৭৫৯ খ্রীঃ — ইংরেজ কর্তৃক কাছারিতে রাজস্ব নিয়ে যাওয়ার পথে বর্ধমানের রাজা বলপূর্বক তা দখলের চেষ্টা করেছিলেন — ফারমিঙ্গার, ফিফথ রিপোর্ট, পৃঃ ১৪২-১৪৩। (১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ইংরাজরা বর্ধমান এবং নদীয়ার রাজস্ব অধিকার ভোগ করছিল)।

১৭৬৩ খ্রীঃ — ফকিররা রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ায় ইংরেজ কুঠি দখল এবং সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ বেনেটকে বন্দী করেছিল। পরে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাটনার হত্যাকাণ্ডে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন -- এ এন. চন্দ্র, ***The Sannyasi Rebellion***. পৃঃ ৩৪।

১৭৬৩ খ্রীঃ — বাখরাগঞ্জে ফকিররা "আমার (হেস্টিংসের) প্রতিনিধি মিঃ কেলীকে ঘিরে ফেলেছিল এবং তাঁব জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল" — ঢাকা গেজেটিয়ারে উদ্ধৃত হেস্টিংসের রিপোর্ট। পৃঃ ৪০-৪২।

১৭৬৩ খ্রীঃ — একদল ফকির ঢাকায় ইংরেজ কুঠি আক্রমণ এবং দখল করেছিল — রায় সাহেব জে এন. ঘোষ, ***Sannyasi And Fakir Raiders of Bengal***, পৃঃ ৩৭।

১৭৬৪ খ্রীঃ — মিঃ রোজ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক প্রচুর অর্থ নিয়ে সুন্দরবন থেকে যাচ্ছিলেন। বাখরগঞ্জে আপন মাঝিদের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন। — লঙ. সিলেকসানস্, নং ৭২৩, ৭৬৭, ৭৭৫, ৮৪৩।

১৭৬৭ খ্রীঃ — খুলনায় একদল লোক ইংরেজ কুঠি লুঠ করেছিল যাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল গুলাম মহম্মদ শিকদার — সি. পি. সি. ভল্যুম ২, নং ১৮৯।

১৭৭২ খ্রীঃ— শ্রীহট্ট জেলার বামাচাঁদের জমিদার কোম্পানীর চুনের গুদাম ভেঙ্গে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন — এফ. বি. ব্রাডলে-বার্ট, সিলেট থ্যাকারে, লণ্ডন, ১৯১১, পৃঃ ১৪৪।

১৭৭২-'৭৩ খ্রীঃ— শ্রীহট্টের (অথবা ঢাকার) জমিদারেরা কোম্পানীর চুনের নৌকাগুলোর যাতায়াতে বাধা দিয়েছিলেন এবং ঢাকা জেলার কলেজুরিয়ার (কালজুরিয়া) কাছে কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রহার করেছিলেন — এফ. বি. ব্রাডলে বার্ট, সিলেট থ্যাকারে, লণ্ডন, ১৯১১, পৃঃ ১৪৭।

১৭৭৩ খ্রীঃ — দিনাজপুরে সরকারী রাজস্ব লুঠ হয়েছিল Prodgs. of the Rev. Board Consisting of the Whole Council. ২৬শে মে, ১৭৭৩।

১৭৮৩ খ্রীঃ — স্থানীয় জমিদারের সাহায্যে মালদহে জগন্নাথপুর কুঠি আক্রান্ত এবং জিনিষপত্র লুঠ হয়েছিল — এনস্লি টমাস এমব্রি, ***Charles Grant and the British Rule in India***. নিউইয়র্ক. ১৯৬২, পৃঃ ৯২।

১৭৮৬ খ্রীঃ — বীরভূমে "রাজকোষে যাওয়ার পথে সরকারী রাজস্ব আক্রান্ত হয়েছিল" — হান্টার. ***Annals***, পৃঃ ১৫।

১৭৮৬ খ্রীঃ — হুগলীতে দুজন সরকার, একজন জমাদার, একজন সিপাই এবং দুজন চাপরাসী ইংরেজের শুল্কভবন বলপূর্বক দখল করেছিল — হুগলীর কালেক্টর রবার্ট হোমকে সরকারী শুল্কবিভাগের কালেক্টর চার্লস কোটস জানিয়েছিলেন, তাং হুগলী, ১৬ই জুন, ১৭৮৬, Prodgs. B. O. R., ২৮শে জুন, ১৭৮৬।

১৭৮৬ খ্রীঃ — বাহারবন্ধ থেকে কান্তবাবু এবং লোকনাথ নন্দী যে অর্থ পাঠিয়েছিলেন

তা রাজশাহীতে লুষ্ঠিত হয়েছিল Committee of Revenue Prodgs. ৬ই এপ্রিল, ১৭৮৬ এবং Prodgs. B. O. R. Vol. II.

১৭৯০ খ্রীঃ — বর্ধমানে মণিরামপুর থানায় বীরভূমের অর্থ লুঠ হয়েছিল — আর. জে. হার্স্ট, "The Early Collectorate Records of Burdwan, 1768-1790", *B. P. P.*, Vol. VI, নং ১৩, ১৯১০, পৃঃ ২৩৫।

১৭৯১ খ্রীঃ — শেরপুরে কিছু বক্সারি বা বন্দুকবাজ কর্তৃক ১,১০০ টাকা লুষ্ঠিত হয়েছিল। — ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে জানিয়েছিলেন, ২০শে মে, ১৭৯১, Rev. (Jud.) Prodgs., ১৩ই মে, ১৭৯১।

১৭৯১ খ্রীঃ — কুচবিহারের সন্নিকটে যোগীগোপায় কিছুসংখ্যক বরকন্দাজ কর্তৃক লেফটেন্যান্ট পারসেল নিহত হয়েছিলেন — Rev. (Jud.) Prodgs., ৮ই জুলাই, ১৭৯১।

১৭৯৯ খ্রীঃ— বীরকুল পরগণার ন'আনা অংশের জমিদার রাজা বল্লভ ভুঁইয়ার প্রজা প্রায় একশজন মানুষ ঐ স্থানে কোম্পানীর লবণ কাছারি লুঠ করেছিল। তারা জমিদারের ভাই "এক অতি নিষ্ঠুর, অভাবগ্রস্ত ও অসংযত যুবক" রাধাবল্লভ বাবুর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কাছারি লুঠ করার কাজে রাধাবল্লভ সন্নিহিত জামকোদা পরগণার মারাঠাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তারা ১,৮০০ টাকা নিয়ে গিয়েছিল এবং কাছারি পুড়িয়ে দিয়েছিল — মিঃ চাপম্যান লবণ দপ্তরের সচিবকে লিখেছিলেন, ফোর্ট উইলিয়াম, ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৯৯ এবং ১৭ই ডিসেম্বর, ১৭৯৯, ***Midnapore Salt Paper***, পৃঃ ১১৮-১১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী বোর্ড অফ রেভেনিউর প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যগণকে লেখা পূর্ণিয়ার কালেক্টরের পত্রের সারাংশ

"শাহ করিম নামক ফকির পনের জন অশ্বারোহী ও প্রায় তিনশজন বরকন্দাজ, একটি উটসহ আরও লোকজন এবং সামরিক সজ্জায় সজ্জিত একটি দল নিয়ে পশ্চিম থেকে এসে প্রতিদিন আরও বেশী অনুচর সংগ্রহ করছে যাদের সে বেতন দেয় যেমন বরকন্দাজদের মাসিক পাঁচ টাকা আর অশ্বারোহীদের মাসিক পনের টাকা করে দেয়। বস্তুত এরই ফলে ফারকিয়া এবং অন্যান্য পরগণা থেকে বহু লোক তার সঙ্গে যোগ দেয়। সে তাদের এক মাসের টাকা অগ্রিম দেয় এবং তার চলার পথের গ্রামগুলোর প্রত্যেকটি থেকে সেলামী হিসাবে সে এক টাকা করে আদায় করে।"

তৃতীয় অধ্যায়

ডাকাতির অভিমুখ

(১) ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা

"খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের যাবতীয় ফল এই তথ্যে এসেই মিলিত হয় ঃ সকল ডাকাতই বিষয়-সম্পদহীন এবং তারা বেকার।"[১] অন্যকথায় তারা ছিন্নমূল। এই ছিন্নমূলতাই ডাকাতদের সরকারের লক্ষ্যবস্তু রূপে অধরা করে তোলে। সন্ন্যাসী, ফকির, চুয়াড় এবং জমিদার, ফৌজদার ও নবাবদের কর্মচ্যুত পাইক আর বরকন্দাজরা এক ছিন্নমূল নিঃস্বের দল গড়ে তুলেছিল যারা সর্বোচ্চ শাসকের বিপরীতে সন্ত্রাসের ভিন্নতর ভারসাম্য রচনা করছিল। সঙ্গতিহীন জমিদার থেকে বিপুল সংখ্যক ক্ষয়িষ্ণু কৃষক জনতা পর্যন্ত এক নমনীয় সমাজ ছিল যাকে যুগপৎভাবে আক্রমণের ঘাঁটি ও আত্মরক্ষার পশ্চাদভূমি এই দুই কাজেই ব্যবহার করা যেত। এই বিষয়টাই প্রায় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার ডাকাতকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা অরাজকতার এক লক্ষণ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের তৎসংক্রান্ত যুক্তিকেই আমরা মেনে নিই। এই প্রেক্ষাপটেই হেস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিসের পুলিশ ও বিচারবিভাগীয় সংস্কার দেশকে অরাজকতার হাত থেকে উদ্ধারের প্রয়াস হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের সেই সময়কার পরিস্থিতির সম্বন্ধে অরাজকতা শব্দটার ব্যবহার ঠিক নয়। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ভারতীয় সমাজ ইংরেজ শাসনকে দেখেছিল অগ্রহণীয় এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধযোগ্য এই দুই দৃষ্টিকোণের যে কোন একটি থেকে। তৃণমূলক্ষেত্র থেকে পাঠানো ক্রমাগত জনগণের অস্বীকৃতি ও প্রতিরোধের সংবাদের মধ্যে সব সময়েই উপরতলের ইংরেজের বাহুবলে অর্জিত বিজয়গর্ব ঢাকা পড়ে যেত। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে ঘাটশীলার কুখ্যাত জমিদারকে দমন করা হলে ফার্গুসন গ্রাহামকে লিখেছিলেন ঃ "আমাদের মেদিনীপুরের জমিদাররা সকলেই বলছে যে তারা তাদের অঞ্চল আর (আমাদের সঙ্গে বন্দোবস্তের মধ্যদিয়ে) গ্রহণ করবে না। কাজেই এক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে . . . . আমাদের অন্যান্য নতুন প্রজাদের ভয় ধরাতে (তাদের) দুর্গগুলিকে ভূমিসাৎ করা এবং তাঁদের দেশকে অগ্নিসংযোগেও ধ্বংস করা।"[২] পাঁচ বছর পরে থ্যাকারে যখন শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার সব থেকে শক্তিশালী জমিদার ও থানাদারের বিরোধিতায় ইংরেজের প্রত্যাশাকে তিনি সেখানে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখেছিলেন।[৩] ১৭৫৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের ফৌজদার এবং বর্ধমান ও বীরভূমের রাজাদের ইংরেজ বিরোধী জোট[৪], যশোরে ইংরেজ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে জমিদার-ডাকাত মিলন,[৫] রাঙ্গামাটির ফৌজদারের বিরোধিতা[৬] এবং দেবীসিংহের আমলে সন্দ্বীপের জমিদার[৭] ও রঙপুরের কৃষক বিদ্রোহকে[৮] অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী শাসনের প্রতি ভারতীয় মনোভাবের প্রকৃত নিদর্শন হিসাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। ডাকাতির জন্ম হয়েছিল সমাজের মধ্যেকার সাধারণ অসন্তোষ থেকে, দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতির ধারা হিসাবে নয়।

(২) ডাকাতিটা কী ছিল — অরাজকতার লক্ষণ নাকি বিদ্রোহ?

ডাকাতি ছিল অবাজকতার লক্ষণ এ বক্তব্য যুক্তিতে টেঁকে না। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের মতন শান্ত অঞ্চল এবং সেনা ছাওনিব নগরগুলিও ডাকাতির উপদ্রব মুক্ত ছিল না।[৯] ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দেই কলকাতায় এক আধা সামরিক বাহিনী গঠনের[১০] এবং নৈশ প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধির[১১] সুপারিশ করা হয়েছিল। এর আট বছর পরে মুর্শিদাবাদে ডাকাত দমনে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন বেজা খান।[১২] প্রায় প্রত্যেকটা জেলা থেকে কলকাতায় যে সব খবর আসত তাতে দেখা যায় সময়ে সময়ে এবং স্থানে স্থানে ডাকাতের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছিল।[১৩] দুর্ভিক্ষ বা প্লাবনের চিত্র দিয়ে ডাকাতের এই সংখ্যাবৃদ্ধিকে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না।[১৪] ডাকাতেরা সংখ্যাধিক্য মানবশক্তির যে সব দিকগুলিকে উন্মোচিত করে তা দিয়েই অরাজকতা সম্পর্কিত প্রচারের বিরোধিতা করা যায়। কয়েক হাজার সন্ন্যাসীর ডাকাতিকে পেশা হিসাবে নেওয়া[১৫], সমসংখ্যক অনুচরসহ একজন জমিদার কর্তৃক শস্যক্ষেত্র লুঠ[১৬], ডাকাতির উদ্দেশ্যে আমলা-ডাকাত মিলিত বাহিনীর দু'তিন দিনের পথ নৌকায় করে পাড়ি দেওয়া[১৭], বরখাস্ত বরকন্দাজদের হাতে পল্লী অঞ্চলের নিদারুণ দুর্দশা[১৮], সুযোগ পেলেই মাঝিদের ইংরেজ হত্যা[১৯] যে ধরনের অত্যাচারের ইঙ্গিত দেয় তাকে ডাকাতি বলা যায় না। ডাকাত হাজারে হাজারে থাকে না। আর যেখানে থাকে সেখানে তারা ডাকাত থাকে না। যদি এ রকম কোন নজির থাকে যে, তিনশ জন মানুষ দুপুরবেলা একজন ব্যবসায়ীর বাড়ী চড়াও হয়ে তার সম্পদ লুঠ করেছিল[২০] তবে কী আমরা বলব যে যারা একাজ করেছিল তারা ডাকাত? তবুও কিন্তু সরকারী নথিতে তাদের 'ডাকাত' বলা হয়েছিল এবং প্রজন্ম পরম্পরায় এই ধারণাই চলে এসেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ক্ষেত্রে যা ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার সেই গণ ডাকাতিটা কি সমাজের নানান কাজের নানান পথে চালিত গণশক্তির একটা দিক ছিল না? ডাকাতির পরিচালন শক্তি নিহিত থাকে তার আপন উদ্দেশ্যের মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবিকা অর্জন কিংবা গোষ্ঠীর সংরক্ষণের তাগিদে অনুষ্ঠিত লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে। ডাকাতিটা যেখানে একটা গ্রামের গ্রাম্য জনতা কিংবা একটা পরগণার একাংশকে তার সঙ্গে জড়িত করে সাধারণভাবে বহু মানুষের সামাজিক জীবিকা বা উপজীবিকার উপায়ে পরিণত হয় সেখানে লুঠের উদ্দেশ্যটা সমাজবিরোধী হয় না। রাষ্ট্রের চাপে আর এক পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যেখানে উপরতলার মানুষদের সম্পদের আত্মসাৎ প্রকৃত পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সমতা পায় না সেখানে ডাকাতি এক ধরনের শ্রেণী আচরণের নজির হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা সত্যি যে ইংরাজ নথিতে ডাকাত সর্দার বলে স্বীকৃত দিনাজপুরের মজনু এবং বর্ধমানের জেবনা কোন সচেতন সমাজের হাতিয়ার ছিল না যা অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন করতে পারত। এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে বনবাসের অন্তরালে তারা এমন কোন গোষ্ঠী ছিল না যারা সমাজব্যবস্থায় বশ্যতা ও আইনশৃঙ্খলার বাইরে উচ্ছন্নে যাওয়া মানুষদের নিয়ে সমাজ বিরোধী সংগঠন করেছিল। এইসব মানুষেরা বহু অনুচর সংগ্রহ করেছিল এবং ঘাটশীলার জগন্নাথ ঢাল, বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেবের মতন ছোট-বড় জমিদার কিংবা বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও বর্ধমানের রাজাদের চারপাশে তারা সমবেত

হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারী নথিতে অপমানজনকভাবে ডাকাত সর্দার আখ্যা পেয়েছিলেন। 'অরাজকতা' শব্দটা ছিল এমনই এক তাৎপর্যপূর্ণ সরকারী অভিব্যক্তি যার আড়ালে শাসকেরা সুযোগ পেলেই অস্ত্র ধরে বা ধরতে পারে এমন এক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিজেদের হতাশাকে সহজেই গোপন করতে পারতেন। ভারতে এমন ঘটনার নজির কম ছিল না যেখানে সশস্ত্র মানুষের উপস্থিতি আইনভঙ্গের বদলে একধরনের সামাজিক বিদ্রোহেরই ইঙ্গিত দিয়েছে।[২১] বিদেশীর দাসত্ব মোচনের লক্ষ্য এইসব বিদ্রোহের কতখানি ছিল তা বলা দুষ্কর।[২২] তবে নিশ্চতভাবেই এর একটা অন্য লক্ষ্য ছিল—অত্যাচারের যন্ত্রকে বিকল করে দেওয়া। ডাকাতিটা নিজেই কোন বিপ্লবী আন্দোলন নয়। কিন্তু দেশে যদি বিপ্লবের পরিস্থিতি বজায় থাকে তবে সেক্ষেত্রে তার অভিব্যক্তির একটা উপায় হল ডাকাতি।[২৩] আইনের আশ্রয়চ্যুতির মধ্যে বা শৃঙ্খলার প্রান্তসীমায় বাস করলেও ভারতবর্ষে ডাকাতদের সরকারী কাজে নেওয়া হত।[২৪] সরকারী গোষ্ঠী কর্তৃক স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও অঞ্চল সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন সশস্ত্রদলের সন্তুষ্টিবিধান করা হত তার কারণ এই নয় যে, তারা খুবই শক্তিশালী আর অদম্য ছিল, বরং এর কাবণ ছিল এই যে, তারা সামাজিক সংযোগের এক অত্যন্ত কার্যকরী অলিন্দ গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে এরাই ছিল আবার প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় শক্তি কারণ তারা সশস্ত্র, দুর্বার ও বন্ধন-অসহিষ্ণু। ইংরেজ সুপারভাইজারের সামনে জমিদারদের সঙ্গে যশোরের ডাকাতদের জোটবদ্ধভাবে থাকা এবং বর্ধমানের তাদের রাজার বাহিনীকে শক্তি যোগানো এই দুটি হল ডাকাতদের সম্পূরক কাজের উদাহরণ।

(৩) জমিদার-ডাকাত মিলনের যুক্তি

ডাকাতদের উদ্ভবের স্থায়ী কারণ হোল সামাজিক তথা অর্থনৈতিক দুর্দশা। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কথাটাই আরও বেশী করে সত্য। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই দিকটারই প্রকৃত মূল্যায়ন সরকারী নথিতে হয়নি। শাসকগোষ্ঠী যে এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না তা নয় কিন্তু তবুও তাঁরা অন্য বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল হেস্টিংস "চাকেরান বা ডাকাতদের বিরুদ্ধে গ্রাম ও বৃহত্তর জেলাগুলোর পাহারার কাজের জন্য থানাদার এবং পাইকদের প্রদত্ত জমি থেকে খাজনা আদায় শুরু করার" বিষয়ে লিখেছিলেন। কিন্তু আমলাদের কর্মচ্যুতি এবং তাঁদের পাওনাগণ্ডা কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি কি হোল? কর্মচ্যুত ও বৃত্তি লুপ্ত এইসব আমলারাই জঙ্গী কৃষক আর বেকার পাইক ও বরকন্দাজদের অতি প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের একত্রিত করেছিলেন। এছাড়া ছিলেন দুর্দশাগ্রস্ত জমিদারেরা যাঁদের ঘিরে সশস্ত্র গোষ্ঠী মিলিত হতে পারত। দারিদ্র্য যুক্তি মানে না আর রাষ্ট্রের বিপরীতে উদ্যত শক্তির যুক্তি সেখানেই প্রবল হয়ে উঠত যেখানে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তার মোকাবিলা করা শক্ত হোত। আর এইভাবেই সঙ্কীর্ণ প্রেক্ষাপটেও স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রত্যক্ষ সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রয়াস হিসাবে দারিদ্র্যজাত হিংসা ডাকাতিরূপে সংগঠিত হয়েছিল।

(৪) জমিদার-ডাকাত মিত্রতার প্রেক্ষাপট

যশোরের জমিদারেরা যাঁরা ডাকাতদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন এবং বর্ধমান, বীরভূম কিংবা বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারেরা যাঁরা ডাকাতদের গ্রামের যুদ্ধবাজ মানুষ জেনেও হয় তাদের

অনিয়মিতভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন না হয় তাদের আপন বিধিবদ্ধ সৈন্যদলে নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা কিন্তু কোন দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর জন্য তাঁদের প্রয়াসকে কার্যকর করেন নি। রাষ্ট্রের থাবা থেকে বাঁচবার জন্য যে ব্যারণদের মিলন ছিল পশ্চিমী রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এক অতি সাধারণ ব্যাপার বাংলাদেশে সেটাই ছিল অনুপস্থিত। আর তার সেই অনুপস্থিতির জন্যই এখানে আমরা এই টিপিক্যাল জমিদার-ডাকাত মিলনকে প্রত্যক্ষ করেছি যা শুধু সন্ত্রাস সৃষ্টির যন্ত্র হিসাবেই কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু যার মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃঢ়ভিত্তিক পরিকাঠামোগত ও অভ্যন্তরকাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের অভিপ্রায় প্রতিফলিত হয়নি। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে সামন্ত প্রথার অন্তিম লগ্নে ডাকাতিটা যখন ইউরোপে প্রবল আকার নিয়েছিল তখন লুণ্ঠনের ঝুঁকিটা সম্পূর্ণভাবেই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নাইট ও ব্যারণরা।[১৫] অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে আমাদের দেখা ভারতীয় ধরনটা যে এর থেকে একেবারেই আলাদা ছিল তার কারণ হল এখানে গ্রাম্য শক্তিশালী যোদ্ধাদের কাজকে ভাড়া করার এক ক্রমবর্ধমান প্রবণতা জমিদারদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আর তারই ফলে এ সময়কার সমাজে অর্থের বিনিময়ে ডেকে আনা ডাকাতির মত হিংসার প্রবল প্রতিপত্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সমাজের হিংসা কেবলমাত্র তখনই সত্যিকারের গঠনমূলক আকার পেত যখন জমিদারেরা নিম্নপদস্থ আমলা কৃষক যোদ্ধাদের থেকে সরে দাঁড়াতেন যেমনটা হয়েছিল দেবীসিংহের আমলে রঙপুরের কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে। তবে সে যাই হোক্, আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ডাকাতদের নেতৃত্ব দিতেন জমিদার এবং তাঁদের আমলারা যাঁরা এইসূত্রে ভেসে বেড়ান বিপুলসংখ্যক ছিন্নমূল সংগ্রামী মানুষকে গ্রাম্য রাজনীতির বহিরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতেন কিন্তু সবসময়েই প্রত্যক্ষ ও চরম অর্থনৈতিক ফললাভের জন্য তাদের যুদ্ধে লাগাতেন। এ ছিল এক আপাতবিরোধী ব্যবস্থা জমিদারের নেতৃত্বকে মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্যযোদ্ধারা যার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হোত। ডাকাতদের নেতৃত্বদানের মাধ্যমে জমিদারেরা সামাজিক নেতা হিসাবে তাঁদের সমর্থন যোগ্যতাকে প্রমাণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু রাজস্ব প্রদানকারী এককসমূহের নেতা হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের টিকে থাকার সমর্থন যোগ্যতাকে তারা প্রমাণ করতে পারেন নি। লুণ্ঠিত দ্রব্যে ছিল ব্যক্তিবিশেষ বা মুষ্টিমেয়র লাভ, শ্রেণীর নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে জমিদারদের পাঠানো আবেদনপত্রগুলো ছিল সংখ্যার দিক দিয়ে প্রচুর এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একধরনের আনুগত্যের চরম নিদর্শন যা তাঁদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সামাজিক প্রতিরোধ উদ্যোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

উপরি উক্ত বিশ্লেষণের মধ্যেকার আনুগত্যের বিষয়টাকে কিছুটা বিশদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ডাকাতদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার দর্পদেবের কুখ্যাতি ছিল। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে তিনি নিম্নলিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন ঃ

"কৃষকেরা পলায়ন করায় এবং জমি অকর্ষিত থাকায় এই বৎসরের বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে আমি অপারগ। বিগত বর্ষায় নদীগুলো পাড় ভেঙ্গেছে ও দেশকে প্লাবিত করেছে

যার ফলে ফসল নষ্ট হয়েছে। এরই সঙ্গে মনুষ্যসৃষ্ট উপদ্রব, যে বিষয়ে আপনাদের আমি আগেই জানিয়েছি, যুক্ত হয়ে আমার দেশ ছাড়তে কৃষকদের বাধ্য করেছে। আমার বন্দোবস্তের মোট অঙ্ককে পুরো করার জন্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি কিন্তু কৃষকেরা পালিয়ে গিয়ে আমাকে লক্ষ্যপূরণে অসমর্থ করে দিয়েছে। আগে ভেসে চলা নৌকার কাছ থেকে আমি সরকারী খাজনা আদায় করতাম কিন্তু এবছর আমাকে তা বারণ করা হয়েছে। আমার পরগণার অবশিষ্ট কৃষকদের নিজেদেরই এখন জীবনধারণের উপযোগী পর্যাপ্ত সংস্থান নেই আর সেজন্যই আমাকেও কোনরকম রাজস্ব দিতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত বণিকদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আমি আমার কিস্তি যথাযথভাবেই পরিশোধ করে দিয়েছি। বর্তমানে পরগণার কাছে পাওনা ২,৩৬৩ টাকা ৮ আনা। পূর্বোক্ত কারণে আমি না পারছি দেশ থেকে এটা আদায় করতে না আছে আমার বকেয়া পরিশোধের সঙ্গতি। আমি তাই আবেদন করছি যে, আমাকে এটা ছাড় দেবার অনুমতি দেওয়া হোক এবং কৃষকদের আবার আমি ফিরিয়ে আনতে ও কৃষিকাজ করতে উদ্যোগ নেব। এই অনুগ্রহের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"[১৬]

এই ধরনের বিষয়ের এক আদর্শ নমুনা,[১৭] এই আবেদনপত্র, হোল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শর্তহীন আত্মসমর্পণের এক বাস্তব দলিল। যৌথ প্রতিরোধের তুলনায় সময় সময় শর্তাধীনে বা শর্তহীনভাবে ব্যক্তিগত আত্মসমর্পণই জমিদারদের পছন্দসই ছিল। এইভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা শোষিত আপন শ্রেণী সীমার মধ্যে মিত্রলাভে অক্ষম হয়ে জমিদারেরা তাঁদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন নিজেদের শ্রেণীর বাইরে এবং নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে তাঁরা সেইসব উপযুক্ত কর্মচারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন যাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। রাষ্ট্র যে কেন এইসব মানুষদের সঙ্গে জমিদারদের মেলামেশাকে কখনই ভাল চোখে.দেখেনি এটা তারই একটা কারণ হতে পারে। ডাকাতদের আশ্রয় দিলে মোগলরা জমিদারকে অধিকারচ্যুত করতেন[১৮] এবং কোম্পানীর শাসনকালেও এই রীতি কার্যকরী ছিল।[১৯] কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ওপর রাষ্ট্রের আক্রমণের ইঙ্গিত পেলেই জমিদারেরা এইসব মানুষদের জোটবদ্ধ করতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন সিংহের ভাই দামোদর সিংহের আচরণটা ছিল এরই এক উদাহরণ। বিষ্ণুপুরের রাজপদের ওপর আপন দাবীর প্রতি কোম্পানীর সমর্থন আদায় করতে না পেরে তিনি বর্ধমানে চলে গিয়েছিলেন, এক বিরাট বাহিনী গঠন করে বিষ্ণুপুরের একটা বড় অংশ লুঠ করেছিলেন। চৈতন সিংহকে বিতাড়িত করে তিনি দুর্গ দখল এবং নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন নলকেন্সের বাহিনী প্রেরিত হলে তিনি জঙ্গলে পলায়ন করেন। তার ফলে দরবার থেকে দুজন কানুনগোসহ একজন আমিল আসেন রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য। নলকেন্স এলাকার দায়িত্ব বেনেটের হাতে ছেড়ে দেন। কোম্পানীর কাছে পাঠান তাঁর আবেদনপত্রে চৈতন জানান, "এর ফলে বিপুল সংখ্যক চুয়াড়সহ দামোদর ফিরে আসেন, বেনেটকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেন, আমিল ও কানুনগোদের হত্যা করেন এবং বিষ্ণপুর শহর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোয় আগুন লাগিয়ে দেন।"[২০] দামোদরের পতাকা তলে কারা সমবেত হয়েছিল? তারা কি ডাকাত? ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে সরকারের কাছে গোপন খবর ছিল যে বর্ধমানের রাজা

"১৫,০০০ পিয়ন, পাইক আর ডাকাতকে" তাঁর কাজে নিয়োগ করেছিলেন।[৩১] বীরভূমরাজ তেলিঙ্গাদের আপন কাজে নিয়েছিলেন।[৩২] পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে চুয়াড়, ফকির[৩২(ক)], পিয়ন, তেলিঙ্গারা বাস করত যাদেব সাহায্যে বিদ্রোহী রাজারা তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে পারতেন। এরা ছাড়াও ছিল 'কুলিরা', ক্ষেতের ফসল লুঠ করার জন্য অর্থের বিনিময়ে জমিদাররা যাদের কাজে লাগাতে পারতেন। ইংরেজের নথিতে যাকে ডাকাতি বলা হয়েছে তা ছিল এইসব মানুষদেরই কাজ। তারা কোন একটা বিশেষ অঞ্চলের অতিরিক্ত জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত উদ্বৃত মানুষ ছিল না কিন্তু ছিল আপন মূল পেশা থেকে উৎখাত মানুষ। জীবিকার আশায় অর্থের বিনিময়ে এরা যে কোন ভাবী নিয়োগকর্তাকেই তাদের শ্রমদান কবতে পারত। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ব্যাপকভাবে জমিদারদের সশস্ত্র অনুচরদের ছাঁটাই করলে তাঁরা এদের কাজে লাগাতেন। ইউসুফপুরের জমিদার শ্রীকান্তরায় হাউলো পরগণা লুঠ করলে সেখানকার জমিদার প্রাণকৃষ্ণ কোম্পানীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, পূর্বোক্তজন আবোয়ার[৩৩] মতন "দস্যু সর্দারদেব" সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন এবং মুর্শিদাবাদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (Controlling Council of Revenue at Murshidabad) যশোরের সুপারভাইজার উইলিয়াম রুককে নিম্নোক্ত মর্মে জরুরী নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

" পোরান কিসেনের (প্রাণকৃষ্ণের) ডাকাত বিষয়ক প্রতিবেদন আপনার আন্তরিক বিচার-বিবেচনা দাবী করে এবং আমরা চাই তাদের প্রকাশ্য অত্যাচারকে দমন করার জন্য আপনি দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা নিন . . ."।[৩৪]

বর্ধমানের রাজা যেভাবে 'দস্যুদের' জোটবদ্ধ করেছিলেন ঠিক সেইভাবেই যশোরের এক নামজাদা জমিদার শ্রীকান্তও ডাকাতদের সমবেত করেছিলেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত ঘটনাগুলো বীরভূমের রাজার ফকিরদের সাহায্য নেওয়া কিংবা বিষ্ণুপুররাজের চুয়াড়দের[৩৫] সঙ্গে জোট বাঁধার থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না। আর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের জোট বাঁধা ছাড়া উপায়ও ছিল না। শতাব্দীকাল ধরে গ্রাম্যজগতের প্রভু হিসাবে বেড়ে উঠেছিলেন জমিদারেরা যাঁদের আলিঙ্গন ঘিরে সম্মিলিত জীবনের ভাবধারা গড়ে উঠত এবং জনগণ মিলিত হোত। মোগলদের অধীনেও তাঁদের বেড়ে ওঠার স্বাধীনতা ছিল এবং রাষ্ট্রের দাবী ও উচ্চমহলের অর্থনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে মুর্শিদকুলি ও মীরকাশিমের মতন বেপরোয়া নবাবেরাও এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এই চাপেরও একটা সীমা ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কখনই সামাজিক উদ্বৃত্তের শেষটুকু পর্যন্ত আত্মসাৎ করার কথা চিন্তা করত না[৩৬] এবং বিভিন্ন পাওনা ও আবওয়াবের আকারে তার একটা বড় অংশ দখল করার অধিকার জমিদারদের রাষ্ট্র দিয়েছিল। এগুলো রাষ্ট্র কখনই কেড়ে নিত না।[৩৭] এছাড়াও বিস্তীর্ণ রাজস্বমুক্ত জমি (বাজি জমিন) আর আকর্ষিত জমি (পতিত জমিন) তাঁদের অধিকারে ছিল। প্রথমোক্ত জমিগুলো তাঁদের মুনাফা জোগাত আর শেষোক্তগুলো মানুষজনকে বসাবার এবং এইভাবে তাঁদের সামাজিক সম্মান ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির উপায় হিসাবে কাজে লাগত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছে জমিদারদের

আনুগত্যের কারণটা নিহিত রয়েছে এখানেই। যথাসময়ে রাজস্ব দিতে পারলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতির পরিচালক, অনুগ্রহ বিতরণকারী, পাইক, বরকন্দাজ ও বিভিন্ন শ্রেণীর আমলাদের নিয়োগকর্তা, জমির[৩৭ক] ও ত্রাণের[৩৭খ] মালিক এবং সবশেষে গ্রাম্য জনতার চরম রক্ষাকর্তা রূপে অর্থাৎ এককথায় গ্রাম-সমাজের মুখ্য পরিচালক হিসাবে জমিদারের স্বাধীনতায় কখনই হস্তক্ষেপ করা হোত না। এ থেকেই জমিদার তাঁর পদের দ্বৈত সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি রাজস্ব প্রদানকারী একক সমূহের নেতা হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন[৩৭গ] কিন্তু প্রতিদানে সামাজিক অধিকার দাবী[৩৮] আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের[৩৯] ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছিলেন। এই অধিকার, দাবী আর নেতৃত্বের ঐতিহ্যই জনগণকে জমিদারদের চারপাশে টেনে এনেছিল এবং শেষোক্ত জনেদের গ্রাম্য সমাজের অকৃত্রিম নেতায় পরিণত করেছিল। কৃষক, বণিক, সৈনিক, ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী আর ঠিকামজুরদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ককে এই প্রেক্ষাপটেই আলোচনা করতে হবে।

(৫) সামাজিক ডাকাতি

বস্তুত জমিদার-ডাকাত মৈত্রীকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। এর একটা হোল দেশের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতি যার পরিণতিতে এক দুর্দশাক্লিষ্ট গোষ্ঠী জীবনধারণের উপায় হিসাবে লুণ্ঠনকেই আশ্রয় করেছিল। এটাই হচ্ছে সামাজিক ডাকাতি কারণ এখানে সম্পদ আহরণের প্রলোভন নয় বেঁচে থাকার সামাজিক লক্ষ্যই হোল লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য।[৩৯ক] ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি ছিল বলেই এই কাজে লিপ্ত এক সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠী বেড়ে উঠতে পেরেছিল জনগণের এক গরিষ্ঠ অংশরূপে। যুদ্ধবাজ উপজাতি, শান্তিপ্রিয় কৃষক, বেপরোয়া সৈনিক, ভ্রাম্যমাণ বণিক সকলেই ডাকাতদলের কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। তাদের যোগাযোগ ছিল জমিদার আর স্থানীয় আমলাদের সঙ্গে। সামাজিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর উদ্দেশ্যে এ ছিল একটা মিলন। নিষ্কর জমিতে পূর্ণমাপে খাজনা গ্রহণ, আমলাদের বরখাস্তকরণ ও রাজস্বের সর্বাধিকরণের (Revenue maximization) গুরুভার — এ ছিল বিগত শতাব্দীগুলোতে অজানা এক শোষণ নীতিরই তিনটি দিক। এ ধরনের একটা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু স্থান থেকে স্থানান্তরে এই প্রতিক্রিয়ার প্রকাশভঙ্গিটা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এ ধরনের প্রতিক্রিয়ারই একটা রূপের প্রকাশ ঘটেছিল ডাকাতির মধ্যে দিয়ে, যার ধরনটা ছিল বিস্ময়করভাবেই একইরকম। এখানে ডাকাতেরা ছিল সমাজপুষ্ট হানাদার (raider) যারা জীবনের অন্যান্য পেশার সঙ্গে হানাদারীকেও যুক্ত করেছিল। হানা দেওয়াটাই তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সবটা ছিল না বা সমাজের আড়াল থেকে উঠে আসত না বলেই হানাদার বেদুইনদের মতন মানুষদের সঙ্গেও তাদের মিল ছিল না। তাদের নেতারা, ছোট-বড় জমিদারেরা, প্রতীচ্যের ভদ্রলোক দস্যু, বিশেষ করে মধ্যযুগের শেষার্ধের জার্মান 'দস্যু-নাইট' ছিলেন না। নিঃসন্দেহেই এই নেতারা ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার আর তাঁদের অনুচর, অসংখ্য গ্রাম্য দুর্বৃত্তরা, ছিল সমান দরিদ্র। এইসব দুর্বৃত্তেরা পাশ্চাত্যের অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, অপরাধ জগতের মানুষ কিংবা লুণ্ঠন বৃত্তিজীবী মানুষ ছিল না কিংবা

লুঠের খোঁজে ফেরা সাধারণ দস্যুর সমগোত্রীয় মানুষও তারা ছিল না। জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে সাময়িক কাজ হিসাবে প্রকাশ্য হিংসার জন্য সমাজের নানান শ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা ইতিহাসের এক দুর্লভ ঘটনা। ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা এবং শ্রেণীবিদ্রোহটা ছিল সে সময়কার বাংলার ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। অত্যাচার করা হলে কৃষকেরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেত আর আমাদের আলোচ্য সময়ে এটাই ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এ ধরনের পলায়ন বিদ্রোহের প্রাণশক্তিকে অনেকাংশেই হরণ করে নিত। দেশের অভ্যন্তরে জোতদার এবং অন্যান্য মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে কৃষকেরা প্রায়ই কলকাতা আর মুর্শিদাবাদে আসত। প্রতিবাদের এ ছিল একটা ধরন এবং পশ্চিমী মতানুযায়ী তা বিদ্রোহ নয়। প্রকৃতির দুই পৌনঃপুনিক অভিশাপ বন্যা ও খরা গ্রাম-সমাজকে জীবনের অতি-মানবিক শক্তির বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামের মধ্যে রেখেছিল। প্রকৃতির সঙ্গে এই সাধারণ বিরামহীন সংগ্রামের কথা স্মরণে রেখেই মনুষ্যসৃষ্ট অত্যাচার প্রতিরোধের বিষয়ে গ্রামের মানুষকেচিন্তা করতে হোত। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী বা শ্রেণীবিদ্রোহ প্রায় একরকম অসম্ভবই ছিল। ডাকাতির ক্ষেত্রে সামাজিক ঐক্যকে এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে এই সময় শ্রেণীবিদ্রোহ ছিল না। সন্দ্বীপের জমিদার এবং রঙপুরের কৃষকদের বিদ্রোহ ছিল এ ধরনের বিদ্রোহেরই দুই সুন্দর উদাহরণ। চুয়াড়বিদ্রোহকে প্রায়ই শ্রেণীবিদ্রোহের উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রেণী প্রতিক্রিয়ার থেকে উপজাতি সমাজের ভেঙ্গে পড়া কৌম সম্পর্কের (clan relations) মধ্যেকার প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটেই এই বিদ্রোহ অনেক বেশী বোধগম্য হয়ে ওঠে। তথাকথিত চুয়াড়বিদ্রোহের সঙ্গে রঙপুরের কৃষকবিদ্রোহের তুলনা করলেই ছবিটা অনেক বেশী পরিষ্কার হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শ্রেণীবিদ্বেষ এবং বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা এই দ্বৈত ভাবাবেগকে তৃপ্ত করেছিল সামাজিক ডাকাতি। যখন তিনশজন মানুষ একজন ধনীর গৃহ আক্রমণ করে তখন তার মধ্যে দিয়ে আমরা শ্রেণী বিরোধিতার উদাহরণ পাই। আর তেলিঙ্গারা যখন কোম্পানীর কাজ ছেড়ে একজন রাজার কাছে যায় কিংবা যখন ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে জমিদার ও ফকিররা জোট বাঁধেন এবং কৃষক-জমিদার যৌথভাবে ইংরেজ ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে তখন তার মধ্যে দিয়ে বিদেশীদের প্রতি ঘৃণার এক পরিষ্কার প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। এই সময়কার ইংরেজরাও এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল ঃ "যখনই তারা সাহস করে বা করতে পারে তখনই দেশের নেটিভরা (সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের ভয়ে) প্রকাশ্যে ইউরোপীয়দের অপমান করে এবং তা করে তারা নিশ্চিতভাবেই গর্ব অনুভব করে আর আমি এমনই পদে রয়েছি যাতে করে ভীষণভাবেই এ ধরনের আচরণের মুখে পড়ি, রাজস্ব ছাড়া তাদের শাস্তি দেবার অন্য কোন উপায় থাকে না"।[৪১]

ইংরেজরা প্রয়োজনে একজন অপরাধীকে সাজা দিতে পারত. একটা গোটা সমাজকে নয়। এক বিরুদ্ধ জনসমাজে যখন একজন অসামরিক ব্যক্তি এইভাবে প্রকাশ্য অপমানের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে তখন অন্য একই মানুষদের অসহযোগিতায় একজন সৈনিককে

বিলাপ করতে দেখা যায়।[৪৩] এরও অনেক বছর আগেই বাংলাদেশের গোটা ইংরেজ জাতিই নিজামত কর্তৃক 'নীচ স্বভাবের মনুষ্য' সমাজ হিসাবে নিন্দিত হয়েছিল।[৪৪] এমন অসংখ্য নজির আছে যার সাহায্যে আমরা প্রমাণ কবতে পারি যে, বাংলাদেশের সমাজ ইংরেজ সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। এই বিরূপতা থেকেই আসত প্রতিরোধ আর প্রতিরোধ সমর্থন করত হিংসাকে। সমস্ত দেশের মধ্যে ইংরাজ বৈরিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

(৬) জাতীয় প্রতিরোধ?

এখানেই আমরা পাই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণকে যা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার ডাকাতদের বিচার করা যেতে পারে। যাকে আমরা জাতীয় প্রতিরোধ বলি এই পর্যায়ে ডাকাতিটা কি তারই প্রারম্ভিক স্থূল সূচনাকে ধারণ করেছিল? ডাকাতেরা ছিল আক্রমণকারী ও হানাদার এবং সম্পদশালীর বিরুদ্ধে উদ্যত, ইংরাজদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত—অন্য কোন ব্যাখ্যাই ইতিহাসের এই সত্যকে নস্যাৎ করতে পারে না। কিন্তু এইসব হানাদারেরা আবশ্যিকভাবে এবং সবসময়েই যে পেশাদার দস্যু ছিল তা নয়। মাঝে মাঝে তারা আইনমান্যকারী সমাজের প্রজাদের সম্পদ লুঠ করতে পারত কিন্তু তার থেকেও তারা করত আবও বেশী কিছু। তারা একই সমাজে বাস করত, তারা সাধারণ মানুষ ও সরকারের প্রজাদের সঙ্গে মিলিত হোত এবং শেষপর্যন্ত আর এক বৃহত্তর আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যৌথ মোর্চা গড়ে তুলত। যদি তারা শুধুই আইন অমান্যকারী গোষ্ঠী হিসাবে বাস করত তবে তাদের অস্তিত্বটাও হোত ক্ষণস্থায়ী। সাধারণ ডাকাতদের, তা তারা যতই শক্তিধর হোক না কেন, দমন করার সামর্থ্য ইংরেজ সরকারের যথেষ্টই ছিল। একসময় যাদের সংখ্যা ষাট হাজারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই পিণ্ডারীরাও চার মাসের এক সংক্ষিপ্ত সময়কালের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।[৪৫] কিন্তু বাংলার ডাকাতদের দমন করা যায়নি এবং আমাদের আলোচ্য সময়কালের সবটা জুড়েই তারা তাদের চূড়ান্ত আধিপত্য বজায় রেখেছিল। এমন কি ডাকাতদের শক্ত ঘাঁটিগুলোর সন্ধান জানা সত্ত্বেও কোম্পানীর শাসকেরা অসহায় ছিলেন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে দিনাজপুরের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল ঃ মহারাজা রাজবল্লভের জাগিরটা ছিল "দেশের পক্ষে আপদস্বরূপ ডাকাতদের আড্ডা কঠোর নজির দ্বারা যার মূলোৎপাটন কষ্টকর। পূর্ণিয়ার জমিদারিসমূহের কয়েকটি এবং দিনাজপুর পরগণার কিছু অংশও তাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে"।[৪৬] হুগলীর ওগুরদা গ্রাম ডাকাতদের আশ্রয় দিয়েছিল।[৪৭] মেদিনীপুরের ছাতনায় ডাকাতদের সমাবেশটা বেশ বেশী ছিল।[৪৮] একই ধরনের সমাবেশ দেখা গিয়েছিল শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী এক বিচ্ছিন্ন এলাকা বাজীতে।[৪৯] ডাকাত অধ্যুষিত এলাকা বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল লক্ষ্মীপুর।[৫০] যশোরের সেলিমাবাদের চারপাশের এলাকা ডাকাতে বোঝাই ছিল।[৫১] অনেকবছর ধরে বৈকুণ্ঠপুর ছিল ডাকাতদের আশ্রয়স্থল। ময়মনসিংহে খড়িবাড়ি জমিদারি ছিল ডাকাতের আখড়া।[৫২] দীর্ঘকাল ধরেই মেদিনীপুরের পশ্চিমের জঙ্গল[৫২(ক)] ছিল চুয়াড়দের বাসভূমি, আর ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে তাদের লুণ্ঠন মানুষের কাছে এক স্থায়ী আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।[৫৩] নোয়াখালির লক্ষ্মীপুরের কাছে বাবুপুর কিংবা নিলম যে ডাকাতদের শক্ত ঘাঁটি ছিল ১৭৯০

খ্রীস্টাব্দের আগেই তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।[৫৪] বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চল, যেখানে পাহাড় ঢালু হয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকায় নেমে এসেছে, সেখানে ডাকাতদের অনুকূল বাসভূমি ছিল।[৫৫] সরকারী নথিতে বারংবার এমনই এক জায়গা হিসাবে দুটি জঙ্গলের উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে ডাকাতরা তাদের নিজস্ব আড্ডা গড়ে তুলেছিল। এগুলো ছিল মেদিনীপুরের পশ্চিমের জঙ্গল ও পাচেৎ জঙ্গল।[৫৬] সরকারী নথি থেকে এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে সারা বাংলাদেশের ডাকাতদের ঘাঁটিগুলির সন্ধান ও তাদের বিবরণ ছড়িয়ে আছে ইংরাজ দলিলে। এ থেকে যে বিষয়টা জানা যায় তা হোল বাংলাদেশে দুষ্কর্মরত ডাকাতদের শক্তঘাঁটিগুলোর নকশা ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের আগেই কোম্পানী প্রশাসন তৈরী করে ফেলেছিল। কিন্তু তবুও এইসব মানুষদেব তারা সম্পূর্ণভাবে দমন করতে পারেনি। এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, যখন জয়ন্তিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান সংগঠিত হয়েছিল, যখন ভূটিয়াদের বিরুদ্ধে কুচবিহারের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল আর যখন বাংলাদেশ থেকে বেনারস, রোহিলখণ্ড কিংবা বোম্বাই-এর মতন দূব দূব দেশে সৈন্য পাঠান হয়েছিল তখন এই দেশেরই মধ্যেকার সব থেকে বড় সন্ত্রাসই অদমিত থেকে গিয়েছিল। তা বলে এটা মনে করলে ভুল হবে যে, বাংলার ডাকাতি সমস্যার প্রতি সরকার সঠিকভাবে নজর দেননি। সময়ে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ামের সর্বোচ্চ কাউন্সিল থেকে শুরু করে জেলার কালেক্টর রেসিডেন্ট পর্যন্ত প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সমস্যাটাকে গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল রাজশাহীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুঠ হলে গর্ভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল, রাজস্ব-পরিষদ (Revenue Council), রাজস্ব সমিতি (Revenue Committee), পরবর্তীকালে রাজস্ব-পর্ষদ (Board of Revenue)[৫৭], নাটোরের ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই ঘটনাটায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।[৫৮] ভেরেলস্ট, ভ্যান্সিটার্ট, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিশ এমন কি মহম্মদ রেজা খান[৫৯]ও তাঁদের প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে ডাকাতি সমস্যার প্রতি নজর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই এটিকে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপীড়ন প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জোটবদ্ধ হওয়ার ফলে এটা যে একটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছিল এই সত্যটাই নিয়ত তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহীর বহরাবান্দের অর্থ বেপরোয়াভাবে লুণ্ঠিত হবার পর ডাকাত সর্দার স্বীকার করেছিল যে, তার দলে এমনসব লোক ছিল যারা আসলে তামাক ও শুকনো লঙ্কা বিক্রেতা এবং যারা ডাকাত হিসাবে সরকারের গ্রেপ্তারের হাত থেকে স্থানীয় এক কাজীর সাহায্যে রক্ষা পেত।[৬০] ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের এক নথির কথা না বললে রাজশাহীতে ডাকাতদের সঙ্গে এক কাজীর এই জড়িত হবার ঘটনাটা ঠিকমত বোধগম্য হবে না। এই নথি থেকেই আমরা জানতে পারি যে, মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদের নির্দেশেই নাটোরের সুপারভাইজার সমস্ত কাজীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেছিলেন।[৬১] কোম্পানীর কাছে এ ছিল এক কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা। কেননা এর ফলে আয়ের দিক দিয়ে প্রশাসন লাভবানই হয়েছিল। প্রশাসনের ব্যয় কমেছিল।

"আমার কোন সন্দেহই নেই যে সরকারী অফিসারদের এ ধরনের অনাবশ্যক ব্যয় এখনই ছাঁটাই করা সম্ভব যার দ্বারা আমার নিজের আর আমার সহকারীদের ভাতা ও সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর মূলধনের সংস্থান হবে"।[৬২]

সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিল সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই কাজীদের ছাঁটাই করতে ইংরেজদের উৎসাহ জুগিয়ে ছিল আর সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কোম্পানী প্রশাসন ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে কাজী ও মুফতিদের বৃত্তি বা উপরি পাওনাকে ছাঁটাই করে দিয়েছিল।

"প্রথমোক্ত জনেরা প্রধান শ্রেণীর অধিবাসীদের কাছ থেকে বিবাহের সময়ে দু'টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছ থেকে ১ টাকা ৮ আনা এবং সর্বনিম্ন শ্রেণীর কাছ থেকে ১ টাকা করে পান।"[৬৩] "বাজনাদার এবং অন্যান্য মানুষ যাঁরা উৎসব পরিচালনা করেন, তাঁরা এবং মুফতিদের পারিশ্রমিকও হয় তাঁদের কাছ থেকে . . . ."। ভ্রাম্যমান কমিটির (Committee of Circuit) ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই আগস্টের কার্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ "একই কারণসমূহ যা দরিদ্র মানুষের পক্ষে কষ্টকর ও বিবাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হালদারি (বিবাহের সময়ে দেয় কর) বিলোপ করতে আমাদের প্রণোদিত করেছিল তা কাজী ও মুফতিদের বৃত্তির ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করে . . . . আমরা তাই এ সবের পুরোপুরি বিলোপ সাধন এবং অদ্যাবধি এইসব কর্মচারীদের দেওয়া স্বল্প পরিমাণ দক্ষিণা ছাঁটাই করতে ও তাঁদের নির্দিষ্ট মাস মাহিনার কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করতে কৃতসঙ্কল্প।"[৬৫]

এ সবের ফলে কাজীদের রোজগার কমেছিল, তাদের প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিল এবং একটা সংস্থা হিসাবে তাদের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তাঁদের আয় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর স্বাধীনতা গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। তবে গ্রামের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্রটা বজায় ছিল এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই তাঁরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্যত মানুষদের আশ্রয় দিয়েছেন। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের এক রিপোর্টে ঢাকার সুপারভাইজার লিখেছিলেন ঢাকার উত্তরাংশ যেখানে রাজশাহীকে স্পর্শ করেছে সেই জায়গাটা সন্ন্যাসীতে বোঝাই ছিল।[৬৬] ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে যে কারণে ডাকাতেরা বগুড়া থেকে রাজশাহীতে আসত দেশের দূর দূর অঞ্চল থেকে এইসব মানুষদের রাজশাহী ও ঢাকায় আসার কারণগুলোও ছিল তারই মতন।[৬৭] কোন প্রলোভন এইসব মানুষদের রাজশাহী যেতে উৎসাহিত করেছিল? একি থানাদারদের আর দেশের সাধারণ পুলিশী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি যা নিয়ে কলকাতায় ইংরেজ প্রশাসনের বিতর্ক চলত?[৬৮] এই প্রশ্নের উত্তরটা নিশ্চিতভাবেই যে নঞর্থক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের (Governor General in Council) কাছ থেকে জেলাগুলোতে সমস্ত কালেক্টর আর ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে থানা ও সেখানকার কর্মচারীর সংখ্যা কমাবার নির্দেশ গিয়েছিল।[৬৯] নদীয়ার মতন একটা বিরাট জেলায়[৭১] মাত্র ২১টি থানা[৭০] রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, জেলার বিশাল আয়তনের বিচারে ডাকাতদের দমন করার মতন পর্যাপ্ত সংখ্যক থানা ছিল না।[৭২] কৃষ্ণনগরের মতন গুরুত্বপূর্ণ শহর পাহারার জন্য অতিরিক্ত কিছুসংখ্যক বরকন্দাজ নিয়োগের সুপারিশ করতে ম্যাজিস্ট্রেট খুবই অনিচ্ছুক ছিলেন।[৭৩] অথচ এটা ছিল ঠিক সেই সময় যখন জেলার নদী এলাকায় ডাকাতের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৭৪] থানার সংখ্যা হ্রাসের খবর এসেছিল তমলুক থেকেও। থানার সংখ্যা হ্রাস ডাকাতের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য দায়ী হলে প্রশাসন নিশ্চয়ই তা করতেন না। আসলে ব্যাধিটা যে ছিল অন্য কোথাও

সেটা অজানা ছিল না। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে বহরবন্দ থেকে কান্তবাবু আর লোকনাথ নন্দী যে অর্থ পাঠিয়েছিলেন থানা থাকা সত্ত্বেও তা রাজশাহীতে লুঠ হয়েছিল এবং নাটোরের ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতার প্রশাসন[৭৫(ক)] দুয়ের কাছেই থানাদারের নিষ্ক্রিয়তা হেঁয়ালির মতন মনে হয়েছিল। ঐ অর্থ যারা লুঠ করেছিল তারা সংখ্যায় কয়েকজন মাত্র ছিল না, ছিল দু'শ মানুষের এমন একটা দল যাদের বিরুদ্ধে থানার পূর্ণ শক্তিকেও যদি কাজে লাগান হোত তবুও তা ব্যর্থ হোতই। ডাকাতিটা হয়েছিল রাত্রে আর থানার বাহিনী কাজে নেমেছিল পরদিন সকালে। ডাকাতির জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রকাশ্য দিবালোকে কোম্পানীর অর্থ লুঠের চেষ্টার সাক্ষী ছিলেন নাটোরের ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই।[৭৬] এ ধরনের ডাকাতির সরকারী সংবাদ ছিল প্রচুর[৭৭] আর এটাই কলকাতায় কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে অবাক করে দিয়েছিল। এ ধরনের ডাকাতিকে যে কিভাবে বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে তাঁদের সঠিক কোন ধারণাই ছিল না। মুসলমান বিচারব্যবস্থা ও শাসনের কাঁধে দোষ চাপিয়ে হেস্টিংস সমালোচনাকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন মাত্র।[৭৮] একইরকম কৌশলকে কর্ণওয়ালিশ কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন নি। এই সময় কোম্পানীর সন্ত্রাসকে ছাপিয়ে ওঠা ভিন্নতর ও সংগঠিত সামাজিক সন্ত্রাসের সামনে কোম্পানীর অসহায়ত্বের এক নজির হিসাবে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে লেখা কুচবিহারের কমিশনারের একটা চিঠির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লেফটেন্যান্ট পারসেলের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য কমিশনার কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে দোষারোপ করেছিলেন।[৭৯] প্রকৃতপক্ষে এই ব্যর্থতাকে চাপা দেবার কোন অজুহাতই প্রশাসনের ছিল না।[৮০]

এটা উল্লেখ করা দরকার যে, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, রাজশাহী, বীরভূম, পাচেৎ প্রভৃতি জেলায় কর্মরত বিভিন্ন ডাকাতদল এবং নথিতে 'সর্দার' বা প্রধান বলে বর্ণিত সেইসব ডাকাত দলের নেতাদের পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রশাসন ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই সংগ্রহ করেছিল।[৮১] কিন্তু এইসব সর্দারদের মধ্যে দুই-একজনকেই কেবল সরকার গ্রেপ্তার করেছিল। আলাদাভাবে প্রতিটি নেতার গ্রাম, পরগণা এবং জেলা সম্পর্কে কোম্পানী অবহিত ছিল. কিন্তু তবুও তাদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ইংরেজের ইতিহাসে এ ধরনের ব্যর্থতার নজির খুব বেশী নেই। প্রত্যেক নেতার জন্য[৮২] বিপুল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল তবুও ডাকাতিকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। সবসময় না হলেও মাঝেমধ্যেই এ ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বেনিয়ান, মুন্সী, দেওয়ান এবং তাঁদের মতন অন্যান্য কোলাবরেটরদের (Collaborators) নিয়ে গড়ে ওঠা কলকাতার ইংরাজ-পরিচিত সমাজের আত্মসমর্পণকারীদের থেকে পুরস্কারের প্রলোভনকে কাটিয়ে ওঠা গ্রামের সমাজ সম্পূর্ণভাবে অন্যরকম ছিল। এখানকার চুয়াড়, বাগদী এবং হাড়িয়া[৮৩] ছিল নিম্নশ্রেণীর মানুষ যাদের সঙ্গে ইংরেজদের কোন যোগাযোগই ছিল না। এইসব মানুষেরা মাঝি, দাঁড়ী, দাণ্ডি, গোঁসাই (সন্ন্যাসী), তেলিঙ্গা, পাইক, বরকন্দাজ, ফকির প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলে জমিদার, তালুকদার, নায়েব, চৌধুরী, কাজী আর তাঁদেরই মতন অন্যান্য ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় ডাকাতি করত। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ রেজা খানকে পাঠানো গভর্ণরের রিপোর্টের মধ্যে কোম্পানীর প্রশাসন ও নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য জনতার মধ্যেকার যোগসূত্রের অভাবটা প্রকাশ পেয়েছিল ঃ

"আমার পক্ষে লিখে জানাবার মতন উপযুক্ত লোক বাখরগঞ্জে নেই, জাহাজ নির্মাণ ও চুন তৈরীর কাজে নিযুক্ত দু'তিন জন নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছাড়া সেখানে আর কেউই নেই"।[৮৪] শাসকের সঙ্গে শাসিতের এই যোগসূত্রহীনতাই ছিল বাংলাদেশে ডাকাতির টিকে থাকার পেছনের আসল রহস্য।

কোম্পানীর শাসনাধীন বাংলাদেশে বাখরগঞ্জ ছিল নিশ্চিতভাবেই এমন একটা অঞ্চল যেখানে ডাকাতিটা খুবই বেশী মাত্রায় হোত। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে এখানেই একদল দাঁড়ী ও মাঝির হাতে ক্যাপ্টেন রোজ নিহত হয়েছিলেন।[৮৫] আর এইসব মানুষেরা সীতারামের জমিদারের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল।[৮৬] একেবারে শুরু থেকেই মাঝি ও দাঁড়ীদের এক উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে হত। ইংরাজদের দাপট ও নিপীড়নের মাত্রা ক্রমশই বাড়ছিল। এই পরিস্থিতি যে নদীমাতৃক বাংলাদেশে জল পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বহু বছর ধরে গুরুত্ব পাওয়া এক বিপুলসংখ্যক মানুষকে বিরোধী করে তুলেছিল ইংরেজরা তা সঠিকভাবে অনুধাবন কবতে পারেনি। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বাখরগঞ্জের নৌকা নির্মাতাদের সঙ্গে কোম্পানীর লোকজনের যোগাযোগের অভাবকে ঐ একই বছরে একই জায়গায় মাঝি-দাঁড়ীদের হাতে ইংরেজ ক্যাপ্টেন হত্যার ঘটনাকে যুক্ত করা যেতে পারে আর তার ফলে আমরাও এমন একটা ধারণা পেতে পারি যার সাহায্যে ডাকাতি সমস্যা ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হতে পারে, এক সংখ্যা লঘুগোষ্ঠীর আইনভঙ্গের ঘটনা — ইংরেজের এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে একে এক সামাজিক প্রতিরোধের কাহিনী হিসাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি।

লেফটেন্যান্ট পারসেলের হত্যাকাণ্ডের সময় আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন ওঠেনি। এ ছিল ইংরেজের কর্তৃত্বকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করার ঘটনা। লেফটেন্যান্ট পারসেল যেখানে নিহত হয়েছিলেন সেই যোগীগোপা ছিল সামরিক স্থল এবং তা ছিল পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের নিয়ন্ত্রণে। এইসব সন্ন্যাসীরা ছিল নিশ্চিতভাবেই ইংরেজ বিরোধী। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কুচবিহাররাজ যখন এক সাঙ্ঘাতিক অভ্যন্তরীণ লড়াই বা গৃহযুদ্ধের নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ছিল, তখন এইসব সন্ন্যাসীরাই সেখানে দরবারে ইংরেজের আশ্রিতজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পক্ষকে সমর্থন করেছিল। উৎকোচের সাহায্যে সন্ন্যাসীদের বশীভূত করার চেষ্টা করেও কুচবিহারের ইংরেজ প্রতিনিধি সফল হননি। কেবলমাত্র এক প্রবল সামরিক ব্যবস্থাই তাদের বশে আনতে পেরেছিল। জনৈক গণেশগীর (গণেশগিরি) ছিলেন এইসব সন্ন্যাসীদের নেতা যাঁর কার্যকলাপ ছিল ভবানী পাঠক, দেবীচৌধুরানী, মজনু শাহের মতন।[৮৭]

এইভাবে উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অষ্টাদশ শতকে বাংলার ডাকাতদের দুনিয়াটা কোন অপরাধ জগৎ ছিল না। আর তাদের গোষ্ঠীবদ্ধতার বন্ধন কোনভাবেই সমাজবিরোধী ছিল না। অন্তত এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে যথেচ্ছাচারের মাধ্যমে মুনাফা লাভের চেষ্টার মধ্যেই তাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা যেমন কোন বিচ্ছিন্ন এলাকায় কাজ করেনি তেমনি জমিদার — আমলা — কৃষক — সৈনিকদের মিলনও এতই দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে তাকেও বিক্ষিপ্ত ঘটনা আখ্যা দেওয়া যায়নি। মাঝি, দাঁড়ী, হাড়ি ও বাগ্দী, চুয়াড়,

ফকির, সন্ন্যাসী, পাইক, বরকন্দাজ, তেলিঙ্গা, রাজপুত এবং এইবকম অন্যান্য মানুষদের এক উৎপীড়নমূলক ও হিংসাশ্রয়ী ব্যবস্থায় প্রত্যয়শীলভাবে সামিল হওয়াটা এতই দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে এক শাসন ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় রূপান্তরে কালে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা এক ক্ষণস্থায়ী বিস্ফোরণ হিসাবে এর দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে থাকা যায় না। ইংরেজ হত্যা, কোম্পানীর কুঠি আক্রমণ, কোম্পানীর অর্থ লুঠের মতন কাজগুলো এতই সংগঠিত ছিল যে তাকে এক ভেঙ্গে-পড়া সমাজের বিশৃঙ্খলার চিহ্ন বলে চিহ্নিত করা যায় না। সংযুক্তি ও সংযোগ পদ্ধতি (links and liaison), রক্ষণ ও আশ্রয় (protection and shelter) ব্যবস্থা এবং নিয়োগ ও সমাবেশের (recruitment and rally) ধরন, মিলন ও তৎপরতা (union and action), দাবী উপস্থাপন ও অবজ্ঞা (demand and indifference), উত্থান ও অমান্যতা (assertion and defiance) যা জমিদাব, তাঁদের আমলা আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিতভাবে ডাকাতেরা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছিল তা জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এমন এক সামাজিক সচেতনতাকে প্রমাণ করেছে যার সম্পর্কে হেস্টিংস ও তাঁর অন্যান্যরা ভুল ধারণা করেছিলেন এবং যাকে উত্তরপর্বের ঐতিহাসিকেবা ভুল বুঝেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে এই সচেতনতা গভীর হয়ে শেষে এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলেছিল যার মধ্যে এক স্বল্পমেয়াদী অবজ্ঞার চেতনা দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় প্রতিরোধের রূপ গ্রহণ করতে পেরেছিল।

পাঠটীকা

(১) ***Journal of Race Development*** ৮, ১৯১৭-১৮-তে জে, উশাঙ লির লেখা 'An economic Interpretation of the Increase of Bandits in China'. পৃঃ ৩৭০, ই. জে. হবসবম কর্তৃক উদ্ধৃত, 'Bandits', পৃঃ ৮৩।

(২) গ্রাহামকে জন কার্গুসন, ২২শে মার্চ, ১৭৬৭, Midnapur District Records, ভল্যুম-১, পৃঃ ১২৫।

(৩) জমিদারটি ছিলেন মহঃ রেজা যিনি পাণ্ডুয়ার থানাদারের সঙ্গে মিলিতভাবে ইংরেজের চুনের কারাবারে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। থ্যাকারে থানাদারকে বরখাস্তের সুপারিশ করেছিলেন — ঢাকায় ভ্রাম্যমাণ কমিটিকে (Committee of Circuit at Dacca) ডব্লু. এম. থ্যাকারে, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭২ খ্রীঃ, Prodgs. of C.C. at Dacca (ভল্যুম-৪), ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২ খ্রীঃ।

(৪) লঙ, ***Selections from Unpublshed Records***, নং ৫০৬, ৫০৭. ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৭; সি. পি. সি. ১, নং ৩৯৭, ৫২১, ৫৯৬, ৫৭৭, ৬০৪, ৩৯১, ৪৩১। সিয়ার-উল-মুতাখেরিনের (ভল্যুম ২, পৃঃ ৩৪৬) মতে—ভ্রাম্যমাণ যুবরাজ আলি গহর (পরবর্তীকালের সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম) প্রায় ঐ সময়েই যিনি বিহারে ছিলেন এবং উপরিউক্ত জমিদারদের সমবেত করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁকে সাহায্য করতে বিষ্ণুপুররাজ সম্মত হয়েছিলেন। এই কাজে মহারাজ নন্দকুমারের যে সমর্থন ছিল এ রকম একটা বিশ্বাস ব্যাপকভাবেই গড়ে উঠেছিল।

(৫) "জমিদারেরা আমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং আমার সকল কাজের সঠিক তথ্য সর্দার চোরদের সরবরাহ করেছেন ..... " যশোরের সুপারভাইজার উইলমোট দরবারে অবস্থিত রেসিডেন্ট রিচার্ড বেচারকে জানিয়েছিলেন, ২৯শে আগস্ট, ১৭৭০, Letter Copy-Book of the Resident at the Durbar at Murshidabad, ভল্যুম-২, পৃঃ ৭। ইউসুফপুরের জমিদার শ্রীকান্ত রায় আবোয়ার মতন দস্যু সর্দারদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন — Prodgs. of C.C.R. at Murshidabad. ২৩শে জানুয়ারী, ১৭৭২, পরাণ কিষেণ (প্রাণকৃষ্ণ) সিংহের আর্জি।

(৬) ফৌজদার বরখাস্ত হয়েছিলেন এবং দেওয়ানকে ফৌজদার করা হয়েছিল — সি. পি. সি.-১, নং ১৬৯৭।

(৭) Board of Revenue Prodgs. ভল্যুম-১০-এ পুরো কাহিনীটা পাওয়া যায়।

(৮) রঙপুর বিদ্রোহের জন্য নরহরি কবিরাজের ***A Peasant Uprising in Bengal : 1783*** এবং নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', ১৯৮৭-এ পুনর্মুদ্রিত, কলিকাতা, দেবীসিংহ বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৯) Busteed. ***Echoes from Old Calcutta*** দ্রষ্টব্য। প্রথম অধ্যায়ে বাস্তিদকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(১০) ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে একদল বেসরকারী ইউরোপীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন এই মর্মে যে এঁরা কোম্পানীর 'সমস্ত ব্যাটেলিয়নের সমস্ত নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর' বাইরে এক আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে চায়। এঁরা পরিচিত হবে 'দেশপ্রেমিক দল' ('Patriot Band') নামে। লঙ, সিলেকসন্‌স্‌, নং ২৬৬।

(১১) লঙ, সিলেকসনস্‌, নং ৩০৬। নগর কোতোয়াল অপসারিত হয়েছিলেন আর তাঁর জায়গায় একজন মেজর সৈন্যবাহিনীর ৫০০ জন ইউরোপীয় ও ৫০০ জন সিপাহীর পরিচালন ভার এবং নগর পুলিশের তদারকীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে নগরের বেশ কিছু পাইক ও বক্সী ছাটাই হয়েছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চের এক চিঠিতে কোর্ট অফ ডিরেকটর্স 'নদীর ধারে এবং নগরের সবকটি প্রবেশ পথে' বিশেষ নজর দেবার জন্য কলকাতার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(১২) সি. পি. সি. ১, নং ২৭৭৬। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ রেজা খান কলকাতায় এলে ভেরেলস্ট তাঁর সঙ্গে ডাকাত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। রেজা খান কথা দিয়েছিলেন যে, মুর্শিদাবাদে ফিরেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। এই সময় ডাকাতদের কার্যকলাপ সকল সীমা অতিক্রম করেছিল। যথাসাধ্য তৎপরতার সঙ্গে এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য ভেরেলস্ট মহম্মদ রেজা খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(১৩) ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রায় সাত থেকে আট হাজার সন্ন্যাসী মেদিনীপুরে সক্রিয় ছিল — এডওয়ার্ড বেবারকেস্টুয়ার্ড ফেসী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৩, Midnapur Dist. Records, ভল্যুম-৩, পৃঃ ৫৫।

(১৪) "মন্বন্তরের সব থেকে ভয়ংকর দিনগুলোতে এখানে সেখানে দু'-একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া লুণ্ঠন, হত্যা কিংবা গ্রামে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেনি" — এন. জি চৌধুরী, ***Cartier, Governor of Bengal***, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৭৮। ডাকাতিটা বেড়েছিল ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে যখন মন্বন্তর প্রায় কেটে গিয়েছিল সেই সময়ে। ডাকাতি বৃদ্ধির জন্য সরকার দুর্নাম অর্জন করেছিল ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে (সি. পি. সি ১, নং ২৭৭৬), ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে নয়। অর্থাৎ মন্বন্তরের অনেক আগে থেকেই ইংরাজ বিরোধী সন্ত্রাসরূপে ডাকাতির আবির্ভাব।

(১৫) ১৩ দ্রষ্টব্য। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহ থেকে সংবাদ এসেছিল যে, ১৫০ জন অনুচরসহ একজন সন্ন্যাসী সর্দার সেখানে বিপজ্জনকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কাগমারী পরগণার রোওয়ালী গ্রামে তাঁর ঘাঁটি ছিল — সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন, Rev. (Jud.) Prodgs, ৮ই অক্টোবর, ১৭৯০।

(১৬) ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে শৈস্তের (সাইথিযার) জমিদাব মুর্শিদাবাদে নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, কয়েকজন জমিদার ও তালুকদারের নায়েব ও গোমস্তারা এক বিরাট বরকন্দাজ বাহিনী এবং পাঁচ থেকে ছ'হাজার কুলি সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর এলাকার শস্য লুঠ করেছেন — শৈস্তের জমিদারের আর্জি, Prodgs. C.C.R. (ভল্যুম-৪), ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১।

(১৭) মিলার জানিয়েছিলেন রাজস্ব দপ্তরের উপসচিব বার্লোকে ফোর্ট উইলিয়াম, তাং-শ্রীহট্ট, ৮ই আগস্ট, ১৭৯০, Rev. (Jud) Prodgs.. ভল্যুম-১।

(১৮) বরখাস্ত বরকন্দাজরা কাজের খোঁজে আসাম গিয়েছিল। আসামের পথে তারা পল্লী অঞ্চল ধবংস করেছিল। বাংলাদেশ থেকে বরকন্দাজদের আক্রমণ অষ্টাদশ শতাব্দীর আসামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

(১৯) লঙ, সিলেকসনস্, ৮৪৩।

(২০) ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে বীরভূমের কালেক্টর জানিয়েছিলেন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৭। Rev. (Jud) Prodgs., ভল্যুম-১।

(২১) "১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে গুজরদের বিশাল ভূসম্পত্তি ভেঙ্গে পড়েছিল। এগার বছর পরে, যখন পল্লী অঞ্চলের পরিস্থিতি ক্লেশকর হয়ে উঠেছিল, সাহারানপুরের 'সাহসী মানুষেরা' 'অনাহারে মৃত্যুর আগে', স্থানীয় এক গুজর, দস্যুসর্দার কালুয়ার অধীনে জোট বেঁধেছিল এবং গঙ্গার উভয় তীরে ডাকাতি শুরু করেছিল, বেনিয়া (বণিক ও মহাজন শ্রেণী), পথিক ও দেরাদুনের অধিবাসীদের সম্পদ লুঠ করত তারা। গেজেটিয়ার মন্তব্য করেছে 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনের পাশমুক্ত পুরনো অসংযত জীবনযাত্রার পথে ফিরে যাবার বাসনার বাইরে শুধুমাত্র লুণ্ঠনটাই বোধ হয় ডাকাতদলের বড় উদ্দেশ্য ছিল না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর উপস্থিতি আইনভঙ্গের পরিবর্তে বিদ্রোহেরই ইঙ্গিত দেয়" — ই জে হবসবম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০০। ***District Gazetteers of the United Provience, Allahabad, 1911,*** ভল্যুম-১, পৃঃ ১৮৫।

(২২) ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ডাকাতেরাও প্রায়ই এই ধরনের উদ্দেশ্য পোষণ করত। কালুয়া (২১ নং দ্রষ্টব্য) এক বিখ্যাত তালুকদারের সঙ্গে মিত্রতা করেছিল এবং নিজেকে রাজা কল্যাণ সিংহ বলে ঘোষণা করে চারপাশের অঞ্চল থেকে রাজস্ব দাবী করেছিল। বিদেশীর শৃঙ্খলমোচনই ছিল তার ঘোষিত লক্ষ্য — একই গ্রন্থ।

(২৩) চীন এবং মেক্সিকোয় এটা ঘটেছিল ঃ

"চীন কিভাবে রক্ষা পেতে পারত? তরুণ মাওয়ের উত্তরটা ছিল, 'লিয়াঙ শান 'ও'-র বীরেদের অনুকরণ করে' অর্থাৎ ওয়াটার মারজিন উপন্যাসের স্বাধীন দস্যু-গেরিলাদের পথে চলে। আরও বড় কথা হোল তিনি তাদের রীতিবদ্ধভাবে নিয়োগ করেছিলেন। .. ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মাওয়ের লাল ফৌজের বড় অংশই এ ধরনের শ্রেণীচ্যুতদের নিয়ে গঠিত ছিল (তাঁর আপন শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী 'সৈনিক, দস্যু, ডাকাত, ভিক্ষুক এবং গণিকা')। সে সময় আইনের আশ্রয়চ্যুত ব্যক্তিরা ছাড়া একটা আইন বিরোধী সংগঠনে যোগ দেবার ঝুঁকি আর কে-ই বা নিত? কয়েক বছর আগেই মাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, "এইসব লোকেরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে'। 'ঠিকভাবে চালিত হলে তারা এক বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে।"

"মেক্সিকো বিপ্লবে মাডেরোর লোকজনেদের দ্বারাই বিখ্যাত পানচোভিল্লা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং নির্ভীক সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। সম্ভবত পশ্চিমী দুনিয়ার সকল পেশাদার ডাকাতদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বিশিষ্টতম বিপ্লবী জীবনের অধিকারী" — হবস্‌বম, একই গ্রন্থ, পৃঃ ১০৫ ও ১০৬।

(২৪) ১৮৩০-এর দশকে গোয়ালিয়রের চতুর্দিকে কর্মরত বাধক দস্যুদের একজন সর্দার গজরাজ এতই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে চম্বলের ওপর ঘাট বা ফেরি রক্ষার জন্য দরবার তাকেই নিয়োগ করেছিলেন — হবস্‌বম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৯০। "হিম্মৎ বাহাদুরের অধীনস্থ গোঁসাইদের, যারা মহাদাজী সিন্ধিয়ার কাছে কাজ করত, এবং জয়পুরের কাজে নিয়োজিত ছিল দাদুপন্থীদের সেবায়" তাদের সম্বন্ধে বলেছেন পার্সিভাল স্পীয়ার (***The Oxford History of India**, Third Edition*, পৃঃ ৫৭৬)। একইভাবে বর্ধমান ও বীরভূমের রাজারা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কাজে লাগিয়েছিলেন। বাংলাদেশে গ্রামের চৌকিদারদেরও ডাকাতদের মধ্যে থেকেই নিয়োগ করা হোত।

(২৫) ('সেই সাধারণ সংকটের' যা চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার) ফলটা ছিল জমিদারীর রাজস্ব হ্রাস, যেটা তার নিজস্বগতিতে এক নজিরবিহীন যুদ্ধকালীন অবস্থাকে খুলে দিয়েছিল, যে অবস্থায় নাইটরা সর্বত্র লুণ্ঠনের মাধ্যমে নিজেরে অদৃষ্টের বিরূপতাকে কাটিয়ে ফেলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জার্মানি আর ইতালিতে অভাবের দিনগুলোতে এই লুণ্ঠন প্রয়াস ব্যক্তিগতভাবে লর্ডদের দ্বারা এক অসংগঠিত ও অরাজক ডাকাতির জন্ম দিয়েছিল . . . ." *Passage from Antiquity of Feudalism*, Perry Anderson. লণ্ডন, ১৯৭৪, পৃঃ ২০০। বাংলাদেশে জমিদারদের ব্যক্তিগতভাবে ডাকাতি করতে আমরা দেখি না। ডাকাতি

করত বরখাস্ত পাইক আর বরকন্দাজ, চুয়াড়, কৃষক, ফকির ও সন্ন্যাসী, নিম্নপদস্থ আমলা, মাঝি, দাঁড়ি প্রভৃতি লোকেরা। জমিদার আর তাঁদের ঠিক নীচের সারির আমলা নায়েব ও চৌধুরীরা তাদের আশ্রয় দিতেন, সাহায্য করতেন এবং কখনও বা দুঃসাহসিক কাজে সরাসরি নেতৃত্বও দিতেন। একদিকে বহিষ্কার-দণ্ডের খড়গের নীচে ডাকাতদের খুঁজে বার করার রাষ্ট্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী জমিদারেরা কাজ করতেন এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবাজ মানুষদের তাঁরা তাঁদের দুঃসাহসিক পরস্বাপহরণের কাজে লাগাতেন।

(২৬) Rangpur Dist. Records. Vol. I, পৃঃ ৩৪।

(২৭) নিম্নোক্ত বিষয়টা হোল নাটোরের রানী ভবানীর একটা আর্জি যাকে উপরিউক্ত আবেদনপত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

"আদাদারদের বেআইনী ও উৎপীড়নমূলক কাজের ফলে রাজশাহী, ভিতরিয়া এবং নলদি পরগণার জমিদারি পুরোপুরি ধ্বংসের অবস্থায় এসে পড়েছে; বহু কৃষক পালিয়ে গিয়েছে, এবং সরকারের রাজস্ব ভীষণ রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব তাদের মধ্যে অনেকেই কলকাতায় গিয়েছে যেখানে তাদের অভিযোগ হয়তো আপনার কানে গিয়েও পৌঁছে থাকবে। কাজেই আমি আশা রাখি যে মফস্বলের দলিল থেকে বুঝে এবং তার থেকে যথাযথ জ্ঞানলাভ করে আপনি একটি সমষ্টিগত ও একই ধরনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমার জমিদারির সকল জেলার বন্দোবস্ত করবেন এবং এর পরিচালনভার আমার উপর অর্পণ করবেন যাতে করে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করে ও প্রেরণা জুগিয়ে আমি আমার জমিদারিকে চাষের অনুকূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এবং নিজেকে রাজস্ব-প্রদানে উদ্যোগী করে তুলতে পারি। এর ফলে মফস্বলে কৃষকদের অসন্তোষই যে শুধু দূর হবে তা-ই নয় বরং রাজস্বের প্রত্যাশাও বাস্তব রূপ পাবে। অন্যদিকে জেলায় অন্যদের ইজারা দিলে তাদের বর্তমান দুর্গতি এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে, ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায়কে অসম্ভব করে তুলবে এবং কৃষকদের অসন্তোষ প্রতিদিন বেড়েই চলবে" — Prodgs of C.C. at Cossimbazar, ২৮শে জুলাই, ১৭৭২ পৃঃ ৮৮।

(২৮) অধিকারচ্যুতির আর এক কারণ ছিল বিদ্রোহ—নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ ২, পৃঃ ৪।

(২৯) ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) ডাকাতদের আশ্রয় দেবার অপরাধে বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারকে অধিকারচ্যুত করার সুপারিশ করেছিলেন —Prodgs. of C.C. at Rangpur, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৭৭২। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার নুরুল্লাপুরের জমিদার মহম্মদ আলি এই কারণে অধিকারচ্যুত হয়েছিলেন যে তাঁর লোকজন বাখরগঞ্জের কাছে একজন ইংরেজকে হত্যা করেছিল (সিলেক্ট কমিটিকে সিলেক্ট কমিটির সভাপতির এবং দরবারের রেসিডেন্ট লিখেছিলেন, ৩০শে জুন, ১৭৬৯। Letter Copy Book of the Resident at Durbar, ১, পৃঃ ১৫)। উত্তরসাউপুর এবং মোয়াবাদের নবম ও পঞ্চদশ ডিভিশনের জমিদারেরা "১১৯৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠের দাঙ্গার নায়ক হিসাবে পরিচিত

হয়েছিলেন"। তাঁরা ধরা পড়েছিলেন ও বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ "তাঁদের জোত-জমা খাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল . . . . " সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯০, ৮ই অক্টোবর ১৭৯০-এর Rev. (Jud.) Prodgs. (ভল্যুম-২, পার্ট-২)। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমানের রাজাকে অধিকারচ্যুত করার কথা চিন্তা করেছিলেন — সি. পি. সি.-১, নং ৫৮৫।

(৩০) রাজা চৈতন সিংহের আবেদনপত্র, Prodgs. of C.C.R. at Murshidabad (ভল্যুম-৪), ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১।

(৩১) লঙ, সিলেকসনস্, নং ৫০৪।

(৩২) একই গ্রন্থ, নং ৪৯৭। গভর্ণরকে নবাব জাফর আলি খান লিখেছিলেন : "তিনশ জন তেলিঙ্গা পালিয়ে গিয়েছে এবং বীরভূমের রাজার কাছে কাজ নিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তা প্রতিরোধের জন্য আপনি ফলতা, কলকাতা, চুঁচুড়া ও কাশিমবাজারে সতর্ক পাহারা রাখার আদেশ দিয়েছেন যাতে করে একজন মানুষও না বীরভূমে পালাতে পারে"।

(৩২ক) ফকির ও সন্ন্যাসীরা ছিল বণিক, সৈনিক ও মহাজন (***The Indian Economic and Social History Review***, ভল্যুম-৮, নং ২, জুন, ১৯৭১, পৃঃ ২১৩, ডি. এইচ. এ. কফ্ এবং স্টুয়ার্ড এন. গর্ডনের ফকির এবং সন্ন্যাসীদের ওপর টীকা—Notes ও মন্তব্য) আর জমিদারদের কাছে তাদের সাহায্য অত্যন্ত দরকারী ছিল (লঙ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নং ৫৫৮)।

(৩৩) হাউলোর জমিদার পোরান কিসেন (প্রাণকৃষ্ণ) সিংহের আর্জি, Prodgs. of C.C.R. at Murshidabad. ২৩শে জানুয়ারী, ১৭৭২।

(৩৪) তদেব

(৩৫) এটা মনে রাখা দরকার যে, বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে চুয়াড়, সন্ন্যাসী আর ফকিরেরাই কেবল ডাকাতি করত এমন নয়, হাড়ী, বাগ্‌দী, ডোম এবং এরকম আরও বহু নিম্ন সম্প্রদাযের মানুষেরাও একাজ করত। এইসব মানুষদের পারিশ্রমিক দিয়ে কুলি হিসাবে জমিদারেরা নিয়োগ করতেন।

(৩৬) সামাজিক উদ্বৃত্ত শোষণের বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ***Ranjit Sen, Economics of Revenue Minimization, 1757-1793 : Bengal, A Case Study***। জমিদার ও তাদের আমলারা শুধুই যে রাষ্ট্রের শোষণ সহ্য করতেন তা নয়; অন্য নানা অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হত। উদাহরণস্বরূপ ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে দামোদর সিংহ যখন বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন তখন তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, ডাকাত, আমলা, ও ক্ষুদ্র জমিদারদের জোটের হাতে তিনি হয়রান হয়েছেন :

"আমার দুঃসহ অবস্থাটা এতই সাঙঘাতিক যে আমার পক্ষে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আমার গৃহের সর্বস্ব লুঠ করার আগে আইন্দার জিৎ (ইন্দ্রজিৎ) পেরঘী আমাব রাজ্য তার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল এবং আমাকে বিন্দুমাত্র সম্মানও দেখায়নি। এইজন্য আমি তাকে বরখাস্ত করেছিলাম এবং সে তার বেতনের জন্য আমাকে জোর করে বর্ধমানে নিয়ে গিয়েছিল। আর ডাকাতদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের জমিদার এবং মোহন বল ও জাহামের জমিদার রণজিৎস্বরূপ নারায়ণ একসঙ্গে গিয়ে বিষ্ণুপুর লুঠ ও দুর্গ ঘেরাও করেছিল।" লঙ্, সিলেকসনস্, নং ৫৪০।

(৩৭) আমাদের আলোচ্য সময়কালে কোম্পানী প্রশাসন জমিদারদের অসংখ্য উপরি আয়কে বন্ধ করে দিয়েছিল যার মধ্যে জমিদারি ঘাট বা জমিদাবির মধ্যে দিয়ে যাওয়া নৌকার ওপর ধার্য কর, হালদারী বা বিবাহ কর, নজর ও সেলামী বা প্রথাসিদ্ধ শুল্ক এবং বাজীজমা ও বিবিধ জরিমানা ছিল উল্লেখযোগ্য।

(৩৭ক) ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহম্মদ রেজা খান বাংলাদেশের ভূসম্পত্তির প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ "জমিদার আর তালুকদারেরাই হলেন তাঁদের নিজেদের জমির মালিক। রাজা তাঁদের শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু উচ্ছেদ করতে পারেন না। তাঁদের অধিকারটা হোল বংশানুক্রমিক। রাজাদের জমির উপর প্রত্যক্ষ কোন সম্পত্তি নেই। এমনকি মসজিদ নির্মাণ আর কবরস্থানের জন্যও তাঁরা জমি ক্রয় করেন" — আব্দুল মাজেদ খান, ***The Transition in Bengal, etc***. (কেম্ব্রিজ, ১৯৬৯)-তে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১৫।

(৩৭খ) তাকাভি ঋণদানটা ছিল ত্রাণের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ব্যবস্থা।

(৩৭গ) "বসত এলাকার থেকে মাসে মাসে এবং শস্যক্ষেত্র থেকে ফসল ওঠার সময়ে জমিদার ও তালুকদারেরা রাজস্ব পেতেন।" "তাঁদের প্রদেয় অর্থ তাঁরা দিতেন বছরের প্রথমার্ধের শেষে ৬/১৬ এবং শেষার্ধে ১০/১৬ ভাগ। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা, খাজনা আদায়ের সম্ভাব্য আশা কিংবা তা বৃদ্ধি করার যুক্তিসম্মত কারণ সম্বন্ধে সরকারী অফিসারদের দিয়ে মাসিক পরীক্ষা করান হয়েছিল বা হত। এরই ফলস্বরূপ আলিবর্দীর কালে পুরনো বকেয়া পড়ে থাকাটা ছিল খুবই বিরল ব্যাপার; যখনই তা দেখা দিত তখনই তাদের কারণ অনুসন্ধান করা হত। তা যুক্তিসম্মত মনে হলে রাজস্ব হ্রাস এবং ত্রুটি মার্জনা করা হোত। তা নাহলে এটা জমিদারদের ওপর ধার্য করা হত এবং তাদের কাছ থেকে আদায় করা হত" — আব্দুল মাজেদ খান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪। জমিদারদের পক্ষে অর্থনৈতিক আনুগত্য যে কেন অপরিহার্য ছিল রেজা খানের এই মন্তব্যই তা বলে দেয়।

(৩৮) বর্ণ কাছারি (Caste Cutcherry) বা বর্ণ আদালতের প্রধান হিসাবে, যিনি বিবাহের ওপর কর ধার্য্য করতে পারেন এমন ব্যক্তি হিসাবে এবং সর্বোপরি যিনি ব্রাহ্মণ বৃত্তিদান করতে পারেন এমন এক মানুষ হিসাবে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত ও এই ধরনের অসংখ্য কাজই জমিদারদের সামাজিক প্রভুত্ব গড়ে তুলেছিল।

(৩৯) সিরাজের বিরুদ্ধে নদীয়ার রাজার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া এবং ১৭৫৯-'৬০ খ্রীস্টাব্দে

বর্ধমান, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের যুবরাজ আলি গহরের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন দেশের রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জমিদারদের শক্তিরই ইঙ্গিত দেয়।

(৩৯ক) সুভাষ ভট্টাচার্য্য তাঁর ***Masrist Miscellany*** নং ১০-এ এক প্রবন্ধে সামাজিক ডাকাতির ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(৪০) ই. জে. হবস্‌বম, ***Bandits***. পৃঃ ১৮।

(৪১) জর্জ হ্যাচকে রঙপুরের রেসিডেন্ট রবার্ট গারলিং, ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮৭, Dinage. Dist. Records, ভল্যুম-১, পৃঃ ৭৫।

(৪২) "মিঃ গ্রে'র গোমস্তা হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গানজীপুরের জমিদার উক্ত তুররাত সিং যেখানে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল সেইস্থানেই ফাঁসি হবে বলে দণ্ডাদেশ পেয়েছেন, এবং তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করার জন্য আর আমাদের গোমস্তাদের প্রতি অন্যান্য মন্দ আচরণের জন্য উক্ত ফৌজদার শিরাজ আলি তাঁর পূর্ণিয়ার শাসন ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত হবেন।" — লঙ্, সিলেকশনস্, নং ৬২৬।

(৪৩) "আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, জালাসোর (জলেশ্বর) এবং পাটনার কৃষকদের রসদসহ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের আদেশ দান ছাড়া কোম্পানীর পক্ষে এই পরগণার ওপর অধিকার বজায় রাখা সম্ভব নয়।" — মেজর ম্যাকফারসনকে ক্যাপ্টেন ফেনউইক, ১৭৮১ (উইলিয়াম চার্লস ম্যাকফারসন সম্পাদিত ***Soldiering in India, 1764-1787 Extracts from Journals and letters left by Lt. Col. Allen Macpherson and Lt. Colonel John Macpherson of the East India Company's Service*** [ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত লেঃ কর্নেল অ্যালান ম্যাকফারসন ও লেঃ কর্নেল জন ম্যাকফারসনের দিনপঞ্জী ও পত্রের সারাংশ] এডিনবারা ও লণ্ডন, ১৯২৮।

(৪৪) লঙ্, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নং ৭০১।

(৪৫) এম. পি. রায়, ***Origin, Growth and Suppression of Pindaris***, নতুন দিল্লী, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১২। "এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা এত বড় দলের — মিলিত এক অস্তিত্বের — বিলোপের — এমন পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা যায়" — শ্রীরায় এইভাবেই Malcolm-কে উদ্ধৃত করে পিণ্ডারি দমনের বর্ণনা করেছেন — একই গ্রন্থ।

(৪৬) দিনাজপুরে সহকারী প্রধান (Assistant) আর্চিবল্ড স্টেপলস্‌কে এইচ. কোটরেল লিখেছিলেন, ৪ঠা নভেম্বর, ১৭৭১ (ফারমিঙ্গার স্বীকার করেছেন যে, তারিখটা সঠিক নাও হতে পারে)। Prodgs. C.C.R. at Murshidabad, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭২।

(৪৭) লঙ্, সিলেকসনস্, নং ৬৬৩।

(৪৮) ***Midnapore Letters Received 1777-1800*** [অতঃপর *MR* বলে উল্লিখিত] পত্র, তাং ১৫ই জুন, ১৭৮০, পৃঃ ৪৯।

(৪৯) রাজস্ব বিভাগের উপ-সচিব (Sub-Secretary) বার্লোকে মিলার, ফোর্ট উইলিয়াম, ৮ই আগস্ট, ১৭৯০, Rev. (Jud) Prodgs.. ভল্যুম-১।

(৫০) নোয়াখালির লক্ষ্মীপুরে ইংরেজদের একটা কুঠি ছিল।

(৫১) ফোর্ট উইলিয়ামে নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রারকে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট আর. রকস্-এর চিঠি Rev. (Jud) Prodgs. ১লা এপ্রিল, ১৭৯১।

(৫২) সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন, ২০শে মে, ১৭৯১, Rev. (Jud) Prodgs, ১৩ই মে, ১৭৯১।

(৫২ক) "প্রায় আশি মাইল দীর্ঘ এবং ষাট মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ড জুড়ে পশ্চিমের জঙ্গল অবস্থিত। পূর্বে মেদিনীপুর, পশ্চিমে সিংভুম—উত্তরে পাচেৎ ও দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ দ্বারা এটি পরিবেষ্টিত — এই গোটা এলাকাটার অতি অল্প জমিই চাষ হয় এবং এর অতি অল্প অংশই চাষের যোগ্য। (মৃত্তিকা) প্রচণ্ড রকম শিলাময় — অঞ্চলটা পর্বতময় ও ঘন বনাচ্ছাদিত যা একে অনেক স্থানে পুরোপুরিই অগম্য করে তুলেছে। চিরদিনই এটি মেদিনীপুর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু প্রশাসনিক অবস্থানের দিক দিয়ে একটি অধীনস্থ অঞ্চল রূপে নবাবী শাসনের সঙ্গে কখনই এর সম্পর্ক ছিল না আর জমিদারেরা তাঁদের খাজনা অথবা রাজস্ব কখনও দিতেন এবং কখনও দিতেন না — মিঃ গ্রাহাম রেসিডেন্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত এই ভূখণ্ড কোনরকম স্থায়ী অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয়নি — তিনিই জমিদারদের আজ্ঞাধীন করেছিলেন এবং যা তাঁরা দিয়ে থাকেন সেই ১,২০০ টাকার পরিবর্তে বার্ষিক ২,২০০ টাকা রাজস্বের জন্য তাঁদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। এই অঞ্চলটি দুটি থানায় বিভক্ত—একটি থানা বলরামপুর এবং অন্যটি থানা জানপুর নামে পরিচিত। প্রথমটি নয়টি এবং শেষোক্তটি আটটি পরগণায় পুনর্বিভক্ত এবং আপন প্রজাবর্গের মধ্যে রাজা উপাধি দ্বারা সম্মানপ্রাপ্ত একেকজন জমিদারের দ্বারা এগুলোর একেকটির শাসনকার্য পরিচালিত হয় — এইসব জমিদারেরা নিছকই দস্যুমাত্র যাঁরা নিজেদের প্রতিবেশীদের এবং পরস্পর পরস্পরকে লুণ্ঠন করেন আর তাঁদের প্রজারা ডাকাত যাদের প্রধানত এইসব বর্বর কাজে তাঁরা নিয়োগ করেন — এইসব লুঠতরাজ জমিদার ও তাঁর প্রজাদের সবসময় যুদ্ধসাজে সজ্জিত রাখে কারণ ফসল সংগ্রহের পর তাঁদের মধ্যে দৈবাৎ কখনও কেউ হয়ত একজন বা দুজন থাকেন যাঁরা নিজ সম্পত্তি রক্ষা কিংবা প্রতিবেশীকে আক্রমণের জন্য তাঁর প্রজাদের আপন পতাকাতলে সমবেত হওয়ার ডাক দেন না — আমি বলতে পারি যে অনিশ্চিত রাজস্ব, অবাধ্য জমিদার এবং অশিষ্ট ও অবাধ্য প্রজা হোল এই সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতারই ফল" — কলকাতা কাউন্সিলকে এডওয়ার্ড বেবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৩। Midnapur Dist. Records. ভল্যু-৪, পৃঃ ১০৬।

(৫৩) "আমাদের পশ্চিমের জঙ্গলের পাহাড়ে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক চুয়াড় সন্নিহিত জেলাগুলোর বড় বড় দলের সঙ্গে মিলিতভাবে বরাবুম (বীরভূম) ও ঘাটশিলার পরগণা আক্রমণ করেছিল" - ভেরেলস্টকে ভ্যান্সিটার্ট, ২০শে ডিসেম্বর, ১৭৬৯। Midnapur Dist. Recds., ভল্যুম ২, পৃঃ ১৩০।

(৫৪) লক্ষ্মীপুরের চারদিকে ডাকাতের সমাবেশটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ঢাকা আর চট্টগ্রাম এই দু'জায়গা থেকেই লক্ষ্মীপুরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল (লঙ্, সিলেকসনস্, নং ৬৩২)। সামরিক নিরাপত্তা ছাড়া সেখানে কোম্পানীর ব্যবসাটাও ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল : "স্রোতের প্রচণ্ডতা (বন্যার ফলে) লখীপুরে পাড় ভেঙ্গেছে ফলে নদী কুঠির পাদদেশ প্লাবিত করছে, আমরা কোম্পানীর ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছি এবং এর অর্ধেক ঢাকায় ও অর্ধেক চট্টগ্রামে সরিয়ে দিয়েছি" — লঙ্, সিলেক্সনস্ (Selections), নং ৭০৯।

(৫৫) হান্টার, ডব্লু. ডব্লু. ***Annals of Rural Bengal*** (Indian Studies : Past and Present), কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ১৫।

(৫৬) এ দুটোই ছিল এক ও অভিন্ন জঙ্গল কিন্তু সরকারী নথিতে একে দু'নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫৭) ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে কমিটি অফ রেভিনিউকে অপসারিত করেছিল।

(৫৮) Comm. of Rev. Prodgs., ৬ই এপ্রিল, ১৭৮৬ এবং BOR [Board of Revenue] Prodgs, ভল্যুম-২।

(৫৯) নিম্নলিখিত বিষয়টি মহঃ রেজা খানের সীলমোহরাঙ্কিত একটি পরোয়ানা :

"মালদহ, বেতিয়া গোপালপুর এবং আঙ্‌রেজাবাদের কুঠি সংলগ্ন এলাকাসমূহের জমিদার ও চৌধুরীদের জানান হচ্ছে যে, যদি কোন চোর তাঁতিদের বাড়ী থেকে কাপড় চুরি করে তবে তাকে খুঁজে বের করে চুরি-করা কাপড়সমেত হাজির করতে হবে। তাদের সেই কাপড় তাঁতিদের ফিরিয়ে দিতে হবে এবং যাতে সে তার অপরাধের জন্য দণ্ড পেতে পারে সেজন্য চোরকে অবশ্যই হাজির করতে হবে। তাঁরা যদি চোরকে হাজির করতে ব্যর্থ হন তবে তাঁদের অবশ্যই সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে হবে, অন্যথায় তাঁরা সমুচিত শাস্তি পাবেন — এই আদেশকে জরুরী এবং অবশ্য পালনীয় হিসাবে গণ্য করা হউক।" — Prodgs. C.C.R. at Murshidabad (ভল্যু-৪), ৭ই মার্চ, ১৭৭১।

(৬০) দুকুলের জবানবন্দী, BOR, Prodgs.

(৬১) মুর্শিদাবাদে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে নাটোরের সুপারভাইজার (চিঠির তারিখ ছেঁড়া), Rev. Deptt. : Letters Copy Book of the Supervisor of Rajshahi at Nator (একটিই মাত্র খণ্ড. ৩রা ডিসেম্বর, ১৭৬৯ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭২)।

(৬২) ঢাকায় কেলসলকে নাটোরের সুপারভাইজার লিখেছিলেন, ১৮ই মে, ১৭৭০ : Letters Copy Book of the Supervisor of Rajshahi etc.

(৬৩) Prodgs. C.C. at Cossimbazar, ২৮শে জুন, ১৭৭২ (পৃঃ ১২২)।

(৬৪) তদেব।

(৬৫) Prodgs. C.C at Cossimbazar. ১৫ই আগস্ট, ১৭৭২ (পৃঃ ১২২)।

(৬৬) মুর্শিদাবাদ রাজস্ব পরিষদকে ঢাকার সুপাব ভাইজার, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১, Prodgs C.C.R. (ভল্যুম ১), ১লা এপ্রিল, ১৭৭১।

(৬৭) ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে যারা বাহারবন্ধ অর্থ লুঠ করেছিল তাদের দলে এমনকিছু লোক ছিল যারা বোগুরা থেকে এসেছিল— নোট নং ৫৮ দ্রষ্টব্য।

(৬৮) "ফৌজদারী কর্তৃত্ব এবং তার ওপর নির্ভরশীল থানাদারির বিলোপ। এই প্রতিষ্ঠান জনগণের শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করত এবং যেকোন অঞ্চলে সংঘটিত প্রতিটি হাঙ্গামা কিংবা দুর্ঘটনার সকল সংবাদ সববরাহের সরকারী যন্ত্র হিসাবে কাজ কবত। এর অপসারণেব সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতদের সাহস বেড়ে গিয়েছে, এবং দেশের শান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধবনের ঘটনার সংবাদ সরকারকে দেবার জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থাও হয়নি" — ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিলে লেখা হেস্টিংসের পত্র থেকে নেওয়া, ফারমিঙ্গার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৬।

(৬৯) Jud. (Crim) Prodgs.. (ভল্যুম ১), ৩রা মে, ১৭৯৩।

(৭০) সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছেন, Jud. (Crim) Prodgs. ৩রা মে, ১৭৯৩।

(৭১) তদেব।

(৭২) তদেব।

(৭৩) তদেব।

(৭৪) তদেব।

(৭৪ক) সপরিষদ গভর্নর-জেনারেলকে ম্যাজিস্ট্রেট, Jud. (Crim) Prodgs.. ৩রা মে, ১৭৯৩।

(৭৫) নোট নং ৫৮ দ্রষ্টব্য।

(৭৬) Prodgs. BOR. ১৮ই জুলাই, ১৭৮৬, এবং Prodgs COR, ৬ই এপ্রিল, ১৭৮৬।

(৭৭) আশ্চর্যের বিষয় বাংলাদেশের ডাকাতদের কাজ সম্বন্ধে তাঁর কাছে যে কোন সাধারণ তথ্য ছিল হেস্টিংস তা স্বীকার করেন নি। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তিনি লিখেছিলেন ঃ "ঐসব দুষ্কর্মের (ডাকাতির) সংবাদ সরকারীভাবে বোর্ডের সদস্যদের জানান হয়েছে কিনা আমি জানি না। আমার কাছে এটা এসেছে কেবলমাত্র বেসরকারী তথ্যের মাধ্যমে"। -- ফারমিঙ্গার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৬ নোট।

(৭৮) হেস্টিংস তাঁর ১৯শে এপ্রিল, ১৭৭৪-এর চিঠিতে লিখেছিলেন ---

"আমি ডাকাতদলের সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে আমাদের প্রশাসনের নিয়মনিষ্ঠা ও সুঠামভাব (precison) যা আমাদের নতুন ন্যায়ালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে, তার অভাব দেখে তা বর্ণনা করতে ব্যথা পাচ্ছি। ডাকাতদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ভীতি এবং তজ্জনিত অসুবিধা

এমন কি এরকম একটা ধারণাকেও নিশ্চিতভাবে গড়ে তোলে যে, যেহেতু সাধারণভাবে রাত্রিতে কিংবা ছদ্মবেশে তারা দুষ্কর্ম করে থাকে তাই মুসলমান আদালতে, এ ধরনের একজন দুষ্কৃতি, তা সে যতই কুখ্যাত হোক না কেন, শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় কারণ সেখানে প্রতিটি বড় ঘটনার জন্য দুটি প্রমাণের প্রয়োজন (যা সহজলভ্য নয়)। ডাকাতির অপরাধে যারা শাস্তি পেয়েছে তাদের মামলার নথি থেকে এমন কোন ঘটনার কথা আমি স্মরণ করতে পারি না যেখানে কেবলমাত্র তাদের স্বীকারোক্তির বদলে সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ যা হয়েছে তা সবই স্বীকারোক্তির দ্বারা এবং তা এত বেশী ক্ষেত্রে ঘটেছে যে আমার সন্দেহ হয় এটা অসাধু উপায়ে হয়েছে।"

ফারমিঙ্গার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৬-২৪৭।
Jud. (Crim.) Prodgs. 3 May. 1793.

(৮০) ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে বীরকুলের লবণ কাছারি লুণ্ঠনের ঘটনা দেশের মধ্যেকার তথাকথিত ডাকাতদের সামনে কোম্পানীর প্রশাসনের অসহায় অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে যখন একশজন মানুষ তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন কোম্পানীর মোহরার (মুহুরি) আর চৌকিদারেরা অসহায় বোধ করেছিলেন। আক্রমণকারীরা ছিল সুসংগঠিত। মেদিনীপুরের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "ডাকাতি চলার সময় জামকুমদহের (এই এলাকাটা মারাঠাদের অধীনে ছিল) সশস্ত্র মানুষে বোঝাই দুটো দস্যু নৌকা বীরকুলে আমার (ইংরেজ প্রতিনিধির) বাংলো ও হিজলী খাঁড়ির মুখ বরাবর এলাকায় নজর রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।" এইভাবে যখন একশ মানুষের একটা দল কাছারি লুঠ করছিল তখন আর একদল সশস্ত্র মানুষ সম্ভাব্য বাইরের আক্রমণকে ঠেকাবার জন্য চারদিকে নজর রেখেছিল — ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর মিঃ চ্যাপম্যান কর্তৃক লবণ দপ্তরের সেক্রেটারীকে লেখা, ফোর্ট উইলিয়াম, মেদিনীপুর সল্ট পেপারস্, পৃঃ ১১৮, এছাড়াও পূর্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যেকার পত্র, ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৯৯ খ্রীঃ, একই নথি।

(৮১) Jud. (Crim). Prodgs. 10 May, 1793 : বীরভূম, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমানে লুণ্ঠনরত ও বসবাসকারী ডাকাত ও লুঠেরা প্রধান, দলপতি ও সর্দারদের তালিকা সংযোগে নিজামত আদালতের কাছে রেজিস্ট্রার জমা দিয়েছেন, ২৯শে এপ্রিল, ১৭৯৩।

(৮২) একই গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৮৩) একই গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৮৪) লঙ. সিলেকসনস্, নং ৭০৯।

(৮৫) লঙ, সিলেকসন্স্, নং ৭৬২, ৭৭৫।

(৮৬) লঙ, সিলেকসন্স্, নং ৭৭৫।

(৮৭) কুচবিহার রাজের কাজে সন্ন্যাসীদের জড়িত হওয়ার বিষয়ে জানার জন্য ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ***Sir Jadunath Sarkar Commemoration, Vol. II*** তে N. B. Roy-এর লেখা "Naga Sannyasi Ganeshgeer and the Kuchbihar Disturbance of 1787 A.D."

প্রথম পরিশিষ্ট

বাংলার ডাকাতদের ওপরকার এক আধুনিক গবেষণা থেকে উদ্ধৃতি
সুভাষ ভট্টাচার্যর বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সামাজিক ডাকাতি ১৭৬৫-১৮১৩
(মার্কসিস্ট মিসেলানি নং ১০)
পৃঃ ৪৯-৫০

এক অর্থে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আদিম এবং প্রাক্‌-রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটা ধবন — একটা অস্পষ্ট প্রতিবাদই হচ্ছে সামাজিক ডাকাতি।[১] কৃষক সমাজই সামাজিক ডাকাতের জন্ম দেয়। যদিও সামাজিক ডাকাতিটা প্রায় ধ্বংসাত্মক এমনকি পাশবিক আকার নেয় তবুও সাধারণভাবে সামাজিক অসাম্য ও অবিচার আর কখনো কখনো বা সাময়িক অভাবের ফলশ্রুতি হিসাবেই তা ঘটে থাকে। সামাজিক ডাকাতি সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর দিলে বিষয়টাকে আমরা ভাল করে বুঝতে পারব। প্রথমত, যাদের আমরা সামাজিক ডাকাত বলে আখ্যা দিতে চাইছি মুখ্যত তারা হোল কৃষক-দস্যু।[২] শুধু আইনকে অগ্রাহ্য করেছে বা আইনের পথকে বর্জন করেছে বলেই যে তারা দস্যু তা নয়, সরকারী ধারণানুযায়ী তারা সেইরকম সাব্যস্ত হয়েছে বলেই তারা দস্যু। অধিকন্তু উচ্ছেদ আর উৎপীড়ন কৃষকদের "পালাতে ও ডাকাত হতে" বাধ্য করে না।[৩] যদিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে তবুও অনেক ক্ষেত্রেই ডাকাতেরা গ্রামবাসী ও কৃষকদের সহানুভূতি আদায় করে থাকে। ভারতে ইংরেজ সরকারের পক্ষে তাদের দমন করা কেন যে অনেক সময়ই শক্ত হয়ে পড়ত এটা ছিল তারই একটা কারণ। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে মিন্টো লিখেছিলেন যেসব অঞ্চলে তাদের 'ভয়াবহ কর্তৃত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে শাস্তি দিয়ে তাদের সংশোধন করাটা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ মানুষেরা দলনায়কদের শ্রদ্ধা করত আর সরকারের "নিজেকে রক্ষার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে সামান্যতম সাহায্য পাবার মতন কর্তৃত্ব কিংবা প্রভাব ছিল না।"[৪] দ্বিতীয় যে বিষয়টা এখানে উল্লেখ করা দরকার তা হোল সামাজিক ডাকাতি, যার সম্বন্ধে আমরা আলাচনা করব, গ্রাম অঞ্চলেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রাম-সমাজের সঙ্গে ডাকাতদের সম্পর্কটা কৌতূহলজনক হলেও তাকে কিন্তু সহজে নির্ধারণ করা যায় না। ডাকাতরা ছিল সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তি (outsider) যারা সাধারণের জীবনধারণ প্রণালীকে ঘৃণা করত। তবুও হবস্‌বম মতে সে "গ্রাম-সমাজের মধ্যে ভাল মতনই ছিল। ডাকাতদের কার্যকলাপ সাধারণ গ্রাম্যজনেদের প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করত না। ডাকাতদের লুঠতরাজের আঘাত সইতে হোত ধনী কিংবা মোটামুটি ধনী ব্যক্তি আর সরকারী অর্থবাহকদের (Treasure Parties) যাদের অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার কালে লুঠ হোত। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে দস্যুরা ক্ষুদ্র আপন অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত কৃষকদের কখনোই আক্রমণ করত না, তবে সম্ভবত ইচ্ছা করে তারা এটা করত না। সামাজিক ডাকাতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল সাধারণভাবে ডাকাতেরা কৃষকদের তাদের শিকারের লক্ষ্য হিসাবে মনে করত না। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ছিল কারণ "দরিদ্রের থেকে ধনীর কাছে নেবার জিনিষ ছিল বেশী"।[৫]

পাঠটীকা

মূলবচনার পাদটীকা ১ যে অংশে আছে সে অংশ এখানে উদ্বৃত হয়নি. যে অংশ থেকে উদ্বৃত হয়েছে সে অংশের প্রথম টীকার নম্বর ২। তাই এখানে ২ নং টীকা থেকে শুরু হল।

(২) হবসবম. ***Primitive Rebels***, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৫, পৃঃ ২৩। এই গ্রন্থটি প্রথমে ***Social Bandits and Primitive Rebels*** নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

(৩) হবসবম, Bandits. পৃঃ ১৭।

(৪) মুর জুনিয়র ব্যারিংটন, ***Social Origins of Dictatorship and Democracy,*** পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৬৯, পৃঃ ১৭১। মাঞ্চু আমলের চীনের পল্লী অঞ্চল সম্বন্ধে মুর এ কথা বলেছেন।

(৫) লোভেট কর্তৃক উদ্ধৃত, ডডওয়েল, এইচ. এইচ. (সংস্করণ)। ***The Combridge History of India***. নিউ দিল্লী, ১৯৫৮, ভল্যুম-৬, অধ্যায় ২, পৃঃ ৩৪।

(৬) হবসবম. ***Primitive Rebels***, পৃঃ ১৯।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিশকে লেখা কুচবিহারের কমিশনার সি. এ. ব্রুসের পত্র, কুচবিহার, ২৬শে এপ্রিল, ১৭৯৩

(Jud. (Crim) Prodgs. 3 May, 1793)

"মহাশয়

দু'বছর আগে, যখন মিঃ পারসেল এবং অন্যান্যরা নিহত হয়েছিলেন, এই স্থানে সন্ন্যাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি; যতদূব ফৌজদারি কাজ চালানো সম্ভব ছিল ততদূরই এই বিষয়টার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ছড়িয়ে পড়া জনশ্রুতির জন্য প্রয়োজনীয় যে বিষয়কে বেশীদিন উপেক্ষা করা যায না সেই বিষয়কে বাজনৈতিক আলোকে কোনরকম বিচার করা হয়েছিল বলে আমি মনে করি না। আসাম, দ্রিঙ ও বাজনী প্রভৃতি অঞ্চলের ছিদ্রান্বেষীরা বর্তমান অশান্তিজনিত প্রতিকূলতা থেকে এইরকম একটা ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছাড়া কোন ইউরোপীয় বা অন্যদের হত্যাকাণ্ডকে সরকার গ্রাহ্য করে না এবং এই ধারণার সমর্থনে তারা লেফটেন্যান্ট পারসেলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা উল্লেখ করে।

বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এত ক্ষতিকর একটা ধারণার অস্তিত্ব এবং এর মধ্যেকার ইংরেজ সরকার বিরোধী কুৎসিত মন্তব্য একজনকে এর প্রতিকারে উৎসাহিত করতে পারে এবং আমি, প্রতিবিধানের অন্য কোন কার্যকরী উপায় না দেখে, মাননীয় মহাশয়ের নিকট বিদেশী শক্তিবর্গের কাছ থেকে এই ধরনের মানহানিকর বক্তব্যের প্রতিবিধানের উপায় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

যে উপায়ের কথা আমি সুপারিশ করছি তা হোল এলাকার মধ্যে অবস্থিত নিষ্কর জমি এবং অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্ত হিন্দুদের উপসনাস্থল যেমন দুধনাথ মন্দিরের, যেখানে সন্ন্যাসীদের যাতায়াত আছে, তার ওপর জরিমানা (অর্থাৎ কর) ধার্য করা। এই উপাসনাস্থলের চৌহদ্দির মধ্যেই এর উপাসকদের দ্বারা একজন নিরস্ত্র ভদ্রলোককে, যাঁর বিরোধ নিবারণের ক্ষমতা যোগী গোপায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে চেয়েছিল, তাঁকে হত্যার মতন ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর সাজাওয়াল, কোম্পানীর দু'জন সিপাই এবং অন্যান্যরা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিলেন। এই অপরাধ সংঘটিত হবার পর আমিই সরকারী পদাধিকারী প্রথম ব্যক্তি যিনি জনমানসে এর প্রতিক্রিয়াকে লক্ষ্য করেছি।

সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ-বিরোধী আলোকে এর বিচার করা হচ্ছে এবং অকুস্থলে হাজির থাকার জন্য আমি প্রতিবেশী বিদেশীদের এই আশ্বাসদানের সরকারী কর্তব্যপালনে দ্বিধা করিনি যে এরকম কোন কাজই শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাবে না। যে বড় গাছের নীচে মিঃ পারসেল নিহত হয়েছিলেন তা সর্বসাধারণের সামনে কেটে ফেলার, মাটি খোঁড়া

ও ছড়িয়ে দেবার জন্য আমি আদেশ দিয়েছি এবং পাঁচশ টাকা জরিমানা ধার্য করেছি যা আদায়ের অনুমতিদানের জন্য আমি মাননীয় মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

বোর্ড অফ রেভিনিউর প্রস্তাব

" . . . . . লেফটেন্যান্ট পারসেলকে হত্যার সঙ্গে যারা সত্যি সত্যিই জড়িত সেইসব মানুষদের বিচার করতে পারলে বোর্ড (অফ রেভিনিউ) অত্যন্ত খুশী হবে কিন্তু অপরাধ সংগঠনের সঙ্গে কোনভাবেই জড়িত নন এমন মানুষদের ওপরও শাস্তি হিসাবে বর্তাবে বলে মন্দিরের ওপর জরিমানা ধার্য সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবকে তাঁরা অনুমোদন করতে পারেন না। কাজেই তাঁরা চান যে, প্রকৃত হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া এবং গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত বিচারাধীন ঘটনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা থেকে তিনি বিরত থাকবেন।"

তৃতীয় পরিশিষ্ট

"বর্তমানে বীরভূম, রাদাশী (রাজশাহী), মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও লুণ্ঠনকারী ডাকাত ও দস্যুদলের সর্দার বা মুখ্য নেতাদের তালিকা"

("রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে এন. (নিজামত) আদালতকে পাঠানো এনক্লোজার তারিখ ২৯শে এপ্রিল, ১৭৯৩", Jud. (Crim) Prodgs. 10 May. 1793.)

সর্দার বা প্রধানদের নাম	নির্দেশক চিহ্ন	অপরাধীদের সাধারণ আবাসস্থল	প্রতিটি দলের বর্ণিত শক্তি	অপরাধ প্রমাণে প্রস্তাবিত পুরস্কার
		গ্রাম পরগণা গ্রাম জেলা		
কারাকাত বাগ্‌দী		অজানা		১০০
দুসুয়া বাগ্‌দী	এ	ধীরানদহ হাটী মুর্শিদাবাদ	১০০	১০০
সুরূপ ডোম				৫০
গোবিন্দ সর্দার	এ	কোমাসমৌত হাকাণ্ড মুর্শিদাবাদ	২৫	৫০
মাকি ডোম				১৫০
ছিদাম বাগ্‌দী				১৫০
সুনা (সোনা) বাগ্‌দী	বি	বলশাস শাহজাদপুর মুর্শিদাবাদ	১৫০	১৫০
রত্না বাগ্‌দী				১৫০
দুনা ডোম				১৫০
আনন্দ বাউড়ী		বুরকুল (বীরকুল)		১৫০
নফরা ডোম	বি	হীরাপুর বাজেফাতিপুর মুর্শিদাবাদ	১৫০	১৫০
বাঞ্ছা ডোম		হীরাপুর		১৫০
জগ্‌গা সর্দার	এ	খান্দপুর কুতুবপুর বীরভূম	৬০	১০০
সুরূপ (স্বরূপ) সর্দার				১০০
গোকলা বাউড়ী				১০০
যুগলা বাউড়ী		ফিউগঞ্জ অজানা		১০০
হালুয়া বাউড়ী	এ	বুটিপুর উল্লেখ নেই		১০০
দৌরমা হাড়ী		শাসপুর উল্লেখ নেই মুর্শিদাবাদ	১০০	১০০
গুলেনা হাড়ী				১০০

সর্দার বা প্রধানদের নাম	নির্দেশক চিহ্ন	অপরাধীদের সাধারণ আবাসস্থল			প্রতিটি দলের বর্ণিত শক্তি	অপরাধ প্রমাণে প্রস্তাবিত পুরস্কার
		গ্রাম	পরগণা	গ্রাম জেলা		
দুর্গা ডোম	বি					২০০
শঙ্কর সর্দার		আউসকরণ				১৫০
মোহি সর্দার		এবং	বর্ণিত			১৫০
লোচন সর্দার	এ	সোটা		মুর্শিদাবাদ		১৫০
কিসেন (কিষাণ) সর্দার			হয়নি		১০০	১৫০
রামপোরসাউদ সরদার (রামপ্রসাদ)						১৫০
বুড়ো বা বড়া সর্দাব	বি					২৫০
ওবৃডি সর্দাব						২৫০
বাগুয়া হাড়ী						১০০
ওনুপা হাড়ী	এ	পৌঙ্কাব হাউস (পাঙ্খাববাড়ি)	আজমতশাহী	এবং বর্ধমান	১০০	১০০
গোলবক্সা হাড়ী						১০০
রাসু এসুদি কসাই						১০০
গুলমা ডোম		সুরডাঙ্গা				২০০
শিকারী ডোমের পুত্র	এ	এবং	উল্লেখ	রাদশী (রাজশাহী)	২০০	
গোলকা দান হাড়ী		আউলগঞ্জ	নেই	বীরভূম		২০০
গোলকা ডোম		রিয়াউন (রয়ান)				৫০
সুরূপ হাড়ী	এ	কেলুলি এবং বরবাকসিং		মুর্শিদাবাদ	৬০	৫০
কুলে বাগদী						৫০
সোহী বাউড়ী		নারায়ণপুর	উল্লেখ	মুর্শিদাবাদ	৫০	৫০
লুকুয়া বাউড়ী	এ		নেই		৫০	
ওনুপা ডোম		উল্লেখ	রাদাশী (রাজশাহী)		৫০	৫০
	এ	শাপুর	নেই			
গোলকাব বাগদী					১০০	
বাঙ্গবাট বাগ্না		সুবি				১০০
ওনুপা বাগ্না						১০০
গোলাক ব্রাম্মিন (ব্রাহ্মণ)						১০০

সর্দার বা প্রধানদের নাম	নির্দেশক চিহ্ন	অপরাধীদের সাধারণ আবাসস্থল	প্রতিটি দলের বর্ণিত শক্তি	অপরাধ প্রমাণে প্রস্তাবিত পুরস্কার
		গ্রাম পরগণা গ্রাম জেলা		
হুদ্ (হুড্) মজুমদার	এ	পিটারি উল্লেখ নেই		১০০
শেখ মাসির	এ	গোসালিয়া মুর্শিদাবাদ	১৫০	১০০
শাকে এউমান্দ দি		এবং		১০০
রামকান্ত রাকিত (রক্ষিত)		হোরান		১০০
রামরায় রাজপুত		নোরান (নোরুন)		১০০
সোনাতন ধুম		উল্লেখ		৫০
	এ	গোবিন্দপুর বাদশী	২৫	
বোক্কা ধুম		নেই		৫০
নফবা হাউী		সেদিসারী		১৫০
ওনুপা হাউী		কুমিরী উল্লেখ নেই		১৫০
	এ	মুর্শিদাবাদ	৩০০	
শেকুরা বাগ্দী		এবং		১৫০
বুক্তা হাড়ী		জুকুরহাটি		১৫০
বৃন্দাবান্দ দোস (দাস)		উল্লেখ		৩০
(বৃন্দাবন)	এ	নিয়ানপাড়া বর্ধমান	১০	
		(নয়নপাড়া) নেই		
দুলিব দোস (দাস) বৈরাগী				৩০
বাঞ্চা সরদার		তিলুকারী		১৫০
শিবা সরদার		গোপালপুর উল্লেখ		১৫০
	এ			৫০
গুয়েশ সরদার		এবং নেই		১৫০
বঙ্কট বাউড়ী		রাহকাওড়া		১৫০
জুল্লা (জুগ) সরদার	বি	ঈশানপুর উল্লেখ নেই		
		রাদশী (রাজশাহী)	৬০	৫০০
গুমুলাহ ডোম	এ	ঈশানপুর উল্লেখ নেই	সংখ্যার উল্লেখ	
		রাদশী	নেই	৫০০

সর্দার বা প্রধানদের নাম	নির্দেশক চিহ্ন	অপরাধীদের সাধারণ আবাসস্থল	প্রতিটি দলের বর্ণিত শক্তি	অপরাধ প্রমাণে প্রস্তাবিত পুরস্কার
		গ্রাম পরগণা গ্রাম জেলা		
বাঞ্চা বাগ্দী	এ	ইয়াকুত সেবাক মোরিজা বীরভূম	১৫০	৫০০
সুখেন্দু বাগ্দী	বি	বুলাউস শাজাদপুর মুর্শিদাবাদ	১৫০	৫০০
মানকা সর্দার	বি	চোটাগয়া বাজির ফাতিপুর মুর্শিদাবাদ	৪০	ধরা পড়েছিল
গোকন বাগ্দী সরদার	এ	কোনিপুর বাজির মুর্শিদাবাদ ফাতিপুর	২৫	৫০০
পুরোয়াদি (পুরন্দর) সরদার	এ	মাইনিয়াহ সাবুক মোরিসা বীরভূম	১০০	৫০০
সুকিকিরা সরদার		একিনরাহ্ মাইসেরাহ্ পাচিত		২০০
রাঘব সরদার	সি	শ্যামসুন্দর পুব ঐ ঐ		২০০
দুলোল শিহার সরদার		মুসাহ্তেরী ঐ ঐ	১০০	২০০
ভৌসু বাউড়ে সরদাব		মুক্তাবাগ ঐ ঐ		২০০
গোলাম রায় সরদার	সি	কুশতুল্লাহ মাইসেরাহ পাচিত	৬০	১৫০
তুল্মা সরদার	সি	শ্যামসুন্দরপুর মাইসেরাহ পাচিত	৫০	১০০
আফজুল হাউড়ি শেবাদ লরাজ	সি	হারুরি সানপারি বর্ধমান (শানপাবড়ি)	১০০	ধরা পড়েছিল।

নির্দেশের ব্যাখ্যা ঃ

এ — কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদের তথ্য।
বি — মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের তথ্য।
সি — কেবলমাত্র বীরভূমের তথ্য।
সর্দার বা প্রধান — ৭৭
দুষ্কর্মের সহযোগীদের নিরূপিত (মোটামুটি) সংখ্যা — ২,৩৬৫
মোট — ২,৪৪২

বীরভূম ২২শে এপ্রিল, ১৭৯৩
সি, কিটিং

বিঃ দ্রঃ — সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল ডাকাতদের গ্রেপ্তারের নথি (Records) অনুমোদন করেছিলেন।

চতুর্থ পরিশিষ্ট

বোর্ড অফ রেভিনিউকে লেখা রাজশাহীর কালেক্টর পিটার স্পিকের পত্র, ৩০শে এপ্রিল, ১৭৮৬

(বোর্ড অফ রেভিনিউর কার্যবিবরণী, ১৮ই জুলাই, ১৭৮৬)

রাজশাহীতে যে ডাকাতি হয়েছিল এই পত্র থেকে সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। পথে বাধা দিয়ে ডাকাতেরা বাহারবন্ধের অর্থ লুঠ করেছিল। বাহারবন্ধের জমিদারকে সেই হারানো অর্থের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য রাজশাহীর রাণীর কাছে এক পরওয়ানা পাঠানো হয়েছিল। কালেক্টর বোর্ডকে লিখেছিলেন :

"নোহাট্টার জমিদারির কর্মচারীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও অর্থের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তা মালখানায় জমা দিতে অস্বীকার করা সম্পর্কে মিঃ বিবির বিবরণের সঙ্গে রাণীর উত্তরের মিল আছে। মফস্বল নায়েবদের অধীনস্থ বাহিনীর পক্ষে এত বড় আর এত দুঃসাহসী এক ডাকাতদলের অতি দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন সম্ভব ছিল কিনা অথবা তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য তারা উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি সমাবেশ করতে পারত কিনা আপনারাই তার শ্রেষ্ঠ বিচারক। সম্প্রতি যেখানে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে সেই সিলবেরিস থেকে আসার পথে এ সম্পর্কিত কথাবার্তা আমার এক কর্মচারীর কানে গিয়েছিল। সাধারণভাবে ডাকাতদের প্রধানত বোগরার লোক বলেই মনে হয়েছিল এটা সে আমাকে জানিয়েছিল। আর ডাকাতদের সঙ্গে যে অনেক স্ত্রীলোক ও ডুলি ছিল এবং ডাকাতির রাত্রে সেই অর্থ বিশ ক্রোশ নিয়ে গিয়েছিল বলে তারা যে কথাবার্তা বলছিল অন্য এক প্রসঙ্গে তার উল্লেখও সে করেছিল। আমার জানা ডাকাতদের এক দুঃসাহসিক আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে। একজন হাবিলদার, বারজন সিপাই আর সেই সঙ্গে জগৎ শেঠের কুঠির বরকন্দাজ ও পিয়নের পাহারায় মুর্শিদাবাদ থানার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্তস্থানে রঙপুর অর্থের একাংশ আক্রান্ত হয়েও শুধুমাত্র পাহারাদার থাকায় আর জীবন বাঁচাবার তাগিদে তারা লড়াই করায় তা রক্ষা পেয়েছিল। হাবিলদার আর পাঁচজন সিপাই ভীষণভাবে আহত হয়েছিল এবং দু'জন সিপাই মারা গিয়েছিল। কান্তবাবুর লোকেরা সে সময় কালেক্টর মিঃ পারলিঙ-এর কাজে নিযুক্ত ছিল এবং তারা নিশ্চয়ই এটা স্মরণ করবে।"

পঞ্চম পরিশিষ্ট

"বাহারবন্ধ অর্থের লুণ্ঠন সম্পর্কে রাজশাহীর জমিদারকে পাঠানো পরোয়ানা"

(বোর্ড অফ রেভিনিউর কার্যবিবরণী, ১৮ই জুলাই, ১৭৮৬)

"বাহারবন্ধ পরগণার জমিদার লোকানাথ নন্দী অভিযোগ করে কমিটির কাছে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন যে, তিনি মুন্সীরাম হাবিলদার এবং বরকন্দাজদের তত্ত্বাবধানে ১৫,১৫০ টাকা হুজুরকে পাঠিয়েছিলেন, যেটা নিরাপদে রানা (রাণী) ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত

চাকলা ভিতরিয়ার নহাটায় পৌঁছেছিল ২০শে ফাগুন (ফাল্গুন), যেদিন রাত্রিতে দস্যুরা, কিছু প্রহরীকে হত্যা এবং অন্যদের জখম করে সেই অর্থ লুঠ করেছিল। যেহেতু এটা হুজুরের আদেশ এবং দেশের রীতি, যে কোন জমিদারের জমিদারির মধ্যে ডাকাতি হলে হয় তিনি ডাকাতদের হাজির করবেন না হয় অর্থ প্রত্যার্পণ করবেন আমি কমিটির কাছ থেকে সেই জায়গায় জমিদার কেমন চৌকিদার দিয়েছিলেন তা অনুসন্ধান করার আদেশ পেয়েছি। যদি আপনার কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু থাকে তবে আপনি অবশ্যই লিখে জানাবেন নতুবা আপনি অবশ্যই তস্করদের হাজির করবেন কিংবা অর্থ প্রদান করবেন। অতএব যথাশীঘ্র সম্ভব এই ডাকাতির বিশদ বিবরণ আমাকে জানাবার জন্য আমি আপনাকে লিখছি যাতে করে আমি তা কমিটিকে জানাতে পারি।"

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট

"উপরে বর্ণিত পরোয়ানার উত্তরে জমিদারের (রাণীর) জবাব"
(পরোয়ানা অর্থে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিশিষ্টে বর্ণিত পরোয়ানা)

(বোর্ড অফ রেভিনিউর কার্যবিবরণী, ১৮ই জুলাই; ১৭৮৬)

"বাহারবন্ধ অর্থের ডাকাতি এবং তৎসম্পর্কিত হুজুরের আদেশ সম্বলিত আপনার পত্র আমি পেয়েছি। মফস্বল থেকে ডাকাতির সংবাদ এবং মিঃ রবার্ট বিবির কাছ থেকে একটা পত্র আগে আমি পেয়েছিলাম। বিশদ বিবরণ আমাকে জানাবার জন্য আমি নহাটার নায়েব এবং থানাদারকে লিখেছিলাম। উত্তরে তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, অর্থ পৌঁছানোর পর রক্ষীরা তা কাছারির বাইরে রাখায় থানাদার হাবিলদারকে সেই অর্থ কাছারির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য পরামর্শ দেন কিন্তু তাঁর কথায় হাবিলদার গুরুত্ব দেননি। রীতি অনুযায়ী আমার চৌকিদারেরা সেখানে ছিল, কিন্তু দস্যুরা সংখ্যায় এতই বেশী ছিল যে তারা তাদেব প্রতিরোধ করতে পারেনি। পরে তারা টমটম ইত্যাদি বাজিয়ে সম্ভাব্য সবরকম অনুসন্ধান চালায়, কিন্তু দস্যুদের কোন খোঁজ পায় না; থানাদার, নায়েব এখনও পর্যন্ত মিঃ বিবির আজ্ঞাধীন, কিছু তস্করকে তারা গ্রেপ্তার করেছে যাদের জবানবন্দী তারা আমার কাছে পাঠিয়েছে যা আমি আমার উকিলকে দিয়ে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে কোন ঘটনা আমার গোচরে এলে আমি আপনাকে জানাব।"

সপ্তম পরিশিষ্ট

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহীর ডাকাতি সম্পর্কে "ডাকাত সর্দার" দুকুলের "জবানবন্দী"

(বোর্ড অফ রেভিনিউর কার্যবিবরণী, ১৮ই জুলাই, ১৭৮৬)

"১৬ই ফাগুন (ফাল্গুন) বিশু কোচ ও সানা (সোনা) হাড়ী আমার বাড়ীতে এসেছিল এবং আমাকে বলেছিল যে, সুবনিয়ার বাসিন্দা নিতাই ও সনৎউল্লা ডাকাত আমাকে ডেকেছে আর আমাকে আমার অস্ত্র নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। সেইমত আমি আমার ঢাল ও

তলোয়ার নিয়ে সেখানে যাই। আক্রিলগঞ্জে বড় নদী পাড় হবার এবং যতক্ষণ না কিছু অর্থ, যা তারা লুঠ করবে. তা সেই পথে আসে ততক্ষণ পুকরিয়া গ্রামে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্তের কথা সর্দাররা আমাকে জানায়। এই অভিযানের জন্য তলোয়ার, বল্লম ও তীরধনুকে সজ্জিত পঞ্চাশজন লোক (ডাকাত) সমবেত হয়েছিল। লশকরপুরের বাসিন্দা আলম নামের একজন ডাকাতকে চর হিসাবে ভবানীগঞ্জে পাঠানো হয়েছিল। ১৭ই ফাগুন (ফাল্গুন) গোদৌলকটিতে আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে ফেরী নৌকায় করে নদী পাড় হই এবং সন্ধ্যায় আক্রিগঞ্জে (আক্রিলগঞ্জ) পৌঁছাই ও সারারাত ঐ জায়গার কাছে অবস্থান করি। ১৮ তারিখ সকালে আলম ডাকাত বাহারবন্ধ থেকে প্রচুর অর্থ আসছে বলে খবর পাঠিয়ে আমাদের প্রস্তুত হতে বলে। সেইমত আমরা মাছ ধরার নৌকায় যা আমরা দখল করেছিলাম তাতে করে দু'দলে ভাগ হয়ে নদীটার একটা শাখা পাড় হই ও কিমতোলা গ্রামে যাই এবং আমাদের পৌঁছানোর সংবাদ আলমকে পাঠাই আর তারপরে সহোয়া গ্রামের দিকে যাই। নহাটায় অর্থ পৌঁছিয়েছে বলে ২০ তারিখ আলম আমাদের খবর পাঠায়। সন্ধ্যায় আমরা নহাটার কাছে পৌঁছাই। দুপুর দুটোর সময় আমরা কিরকম পাহারা ছিল তা দেখার জন্য সন্নাহ্উল্লা এবং বিশওয়া (বিশ্ব) সরদারকে পাঠাই, তারা ঘুরে এসে জানায় যে বুটিয়ারকোনার কাছে সিপাইরা পাহারায় আছে 'কে আসে বলে' সিপাইরা চ্যালেঞ্জ করেছিল (দলিলে এই কথাগুলো রেখাঙ্কিত ছিল), তারা উত্তর দিয়েছিল যে তারা গ্রামের কৃষক; তারা বলেছিল সেটাই ছিল উপযুক্ত সময়। এরপরে আমরা নিজেরা প্রস্তুত হয়েছিলাম এবং তিন দলে ভাগ হয়ে সেখানে গিয়েছিলাম, জুমাউল ডাকাত তার বল্লম দিয়ে পাহারাদার সিপাইকে হত্যা করেছিল, আমি আমার তলোয়ারের দু'টো আঘাতে একজনকে হত্যা করেছিলাম, বিভিন্ন লোকের হাতে সাতজন মানুষ খুন হয়েছিল এবং অন্যান্যরা আহত হয়েছিল, আমি আমার তলোয়ার দিয়ে একজনের হাঁটুতে আঘাত করেছিলাম. আমরা ঘরে ঢুকেছিলাম এবং আমাদের মধ্যে ষোলজন অর্থ, যা থলির মধ্যে ছিল. সরিয়ে ফেলেছিল। আমরা নাওয়াইক (নায়েক) সর্দারের বাড়ীতে অর্থ নিয়ে গিয়েছিলাম। সে আমাদের দৈনিক খরচের জন্য কিছু টাকা নিতে বলেছিল এবং পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে বাকি অংশ ভাগ করা হবে বলে জানিয়েছিল; এরপর আমরা নিজেদের বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলাম। আলম সর্দার ও তার ছেলে এবং মুতরু ডাকাতরা থাকে আক্‌রিগঞ্জের পশ্চিমে; ভগবানগোলায় কয়েকটা বাবলাগাছের তলায় কয়েকজন ডাকাত থাকে, তাদের নাম আমি জানি না, প্রকাশ্যে তারা তামাক আর লঙ্কা বিক্রি করে। বিশুয়া ডাকাত আমায় বলেছিল যে, এইসব ডাকাতরা সবসময়েই জামনির বিরকিতুল্লা (বরকতুল্লা) কাজীর বাড়ীতে আশ্রয় পায়, যখন জুটিয়রাম (জটায়ুরাম) থেকে চারজন পিয়ন ডাকাতদের ধরতে এসেছিল তখন লুমনির সর্দার ডাকাত এবং অন্যান্যরা কাজীর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিল ও আত্মগোপন করেছিল। আমার জবানবন্দীর সাক্ষী হিসাবে লোকজনদের হাজির করা হোক।"

অষ্টম পরিশিষ্ট

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল নহাটায় ডাকাতি সম্পর্কে ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিলের (অর্থাৎ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের) কাছ থেকে কমিটি অফ রেভিনিউ নিম্নলিখিত পত্র পেয়েছিলেন

(কমিটি অফ রেভিনিউর কার্য বিবরণী, ৬ই এপ্রিল, ১৭৮৬)

"আমরা চাই যাঁর জমিদারিতে ডাকাতি হয়েছে তাঁর কর্মচারীরা যারা অর্থের পাহারায় ছিল তাদের সাহায্য আর নিরাপত্তার জন্য কোনরকমের ব্যবস্থা এবং কি ধরনের নিরাপত্তার আয়োজন করেছিলেন তা আপনাদের জানাবার জন্য আপনারা রাজশাহীর রাণীকে অনুরোধ করুন এবং যদি নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর কর্মচারীদের অবহেলার ফলেই এটা ঘটেছে বলে প্রমাণ হয় তবে সেই ক্ষতি যে তাঁকে পূরণ করতে হবে, এবং তা যে প্রাচীন প্রথা ও সরকারী বিধিসম্মত এই কথা তাঁকে জানিয়ে দিন।" (কলকাতা, কাউন্সিল কর্তৃক রাজস্ব কমিটিকে লেখা, ফোর্ট উইলিয়াম, ৩০শে মার্চ, ১৭৮৬)। এই পত্রের সঙ্গে ছিল কলকাতা কাউন্সিলকে লেখা নাটোরের ম্যাজিস্ট্রেটের পত্র। এর থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে পারি ঃ (১) ভিতোরিয়া জেলার নহাটায় ডাকাতি হয়েছিল। (২) কান্তবাবু অর্থ পাঠিয়েছিলেন এবং তা মুর্শিদাবাদে যাচ্ছিল। এই অর্থ ছিল বাহারবন্ধের রাজস্ব। (৩) পাঁচজন সিপাই, ন'জন বরকন্দাজ এবং আঠারোজন পিয়ন এর পাহারায় ছিল, যারা ১লা তারিখের সন্ধ্যায় পথে নহাটায় থেমেছিল। সাধারণভাবে পথিকদের জন্য প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাদের অর্থ কাছারীর মালখানায় জমা দেবার বদলে তারা যেখানে বিশ্রাম করছিল সেই সরাইখানা বা বিশ্রামাগারে নিজেদের জিম্মায় ও পাহারায় রাখাকেই তারা বেশী নিরাপদ বলে মনে করেছিল। বিপদের মুহূর্তে যারা পালিয়ে গিয়েছিল সেই ডুলি বা টমটম ছাড়া নায়েব বা থানাদার তাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করেন নি কিংবা তাদের কোন প্রহরী বা চৌকিদার দেননি, এই অবস্থায় একজন সিপাই চৌকিদার এবং দু'জন বরকন্দাজকে চৌকি দেবার জন্য রেখে অর্থ পাহারায় নিযুক্ত লোকজনের বেশীর ভাগই হয় সরাইখানার ভিতরে না হয় তার দরজার সামনে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই সময় তলোয়ার, বল্লমে সজ্জিত হয়ে প্রায় দু'শজন ডাকাত হঠাৎই দল বেঁধে আক্রমণ করে পাহারাদারকে কেটে ফেলে এবং সাতজনকে হত্যা ও ষোলজনকে আহত করে ষোলটা থলিতে পনের হাজার পাঁচশ টাকার সবটাই নিয়ে নিয়েছিল এবং নহাটার মানুষেরা এসে যাবে বলে সচকিত হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ধাবন করলে (অস্পষ্ট), যা সম্ভব ছিল না, এত বড় দলের কিছু না কিছু সন্ধান হয়তো পাওয়া যেত; কিন্তু অপরাধীদের খুঁজে বার করার জন্য থানাদার পরের দিন তিনজন পাইক পাঠাবার ফলে তারা অর্থসহ পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। বেসরকারীভাবে তখনই খবর পাওয়া ছাড়া ঘটনা সম্পর্কে সরকারী কোন সংবাদ কয়েকদিন যাবৎ আমার কাছে পৌঁছায়নি। এই ঘটনার তদন্তের এবং সংলগ্ন এলাকার চারদিকে অপরাধীদের খুঁজে বার করার জন্য আমি নহাটায় লোক পাঠিয়েছিলাম। এছাড়া একই ধরনের নির্দেশ দিয়ে অন্যদের আমি ভবানীগঞ্জে পাঠিয়েছিলাম যেখানে পূর্ববর্তী সন্ধ্যায় অর্থ থেমেছিল; আর ডাকাতদের সামান্যতম সন্ধান পাওয়া ছাড়াই অনেকগুলো দিন কেটে গিয়েছে বলে আমি

এক পুরস্কার দেবার কথা চিন্তা করেছি যা এতবড় একটা দলের কোন একজনকে তার সহযোগীদের সম্বন্ধে তথ্য জোগাতে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যেই দলের প্রধানদের খুঁজে বার করলে এবং অর্থ উদ্ধার করলে যে কোন ব্যক্তিকেই পাঁচশ টাকা দেওয়া হবে বলে আমি ঘোষণা করেছি এবং মাননীয় মহাশয় সে পরিকল্পনা আপনার অনুমোদন পাবে বলে আমি আশা করছি।

যেহেতু ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী সমস্ত জমিদারেরাই শুধু যে অঞ্চলের শান্তিরক্ষার ব্যাপারেই জবাবদিহি করতে বাধ্য তাই নয় বিভিন্ন জেলায় ক্ষতির পরিমাণ পরিশোধের জন্যও দায়ী। তাই যেখানে অঞ্চলের শান্তিরক্ষায় জমিদারদের অবহেলা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যেখানে এ ব্যাপারে এ রকম স্পষ্ট অবহেলার পরও পরগণার জনগণ কর্তৃক এমন বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ উদ্ধারের জন্য কোন উদ্যম নেওয়া হয়নি, এমন ঘটনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা বিবেচনার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। (রাজস্ব বিভাগের বিবেচনার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি।)" (রাজস্ব বিভাগের কমিশনারের কাছে লেখা নাটোরের ম্যাজিস্ট্রেট আব বিবির পত্র, ২০শে মার্চ, ১৭৮৬)।

নবম পরিশিষ্ট

"পরগণা বাহারবন্ধের" জমিদার লোকনাথ নন্দীর (কান্তবাবুর পুত্র) আবেদনপত্র"

(কমিটি অফ রেভিনিউর কার্যবিবরণী, ৬ই এপ্রিল, ১৭৮৬)

"মফস্বলের রাস্তার ধারে অবস্থিত আমার জমিদারি পরগণা বাহারবন্ধের রাজস্ব পনের হাজার পাঁচশ এক টাকা মুন্সীরাম হাবিলদার, বরকন্দাজ এবং অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে ২০শে ফাগুন (ফাল্গুন) বুধবার মহারাণী ভবানীর জমিদারি ভিতোরিয়ার নহাট্টায় পৌঁছেছিল। রাত্রিকালে কিছুসংখ্যক দস্যু পাহারাদারদের আক্রমণ করেছিল, কয়েকজনকে হত্যা এবং বহুজনকে জখম করে অর্থ নিয়ে পালিয়েছিল। এ সম্বন্ধে আমি রাজস্ব কমিটির ভদ্রমহোদয়গণের কাছে দরখাস্ত করেছিলাম কিন্তু তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের কাজ আদায় করা এবং এইসব ঘটনার প্রতিবিধানের দায়িত্ব সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের। সরকারের রাজস্ব লুঠ হয়েছে এবং এর স্থায়ী বিধি ও প্রথা হল এই যে, যদি কখনো সরকারী রাজস্ব লুঠ হয় তবে যাঁর জমিদারিতে এই লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে সেই জমিদার সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে একযোগে লুণ্ঠিত সম্পদসহ ডাকাতদের হাজির করবেন ও তাদের হুজুরের কাছে নিয়ে আসবেন আর ডাকাতদের ধরতে ও হাজির করতে ব্যর্থ হলে সম্পদ অপহরণের জন্য দায়ী হবেন। আমি তাই আপনার মহামান্য বোর্ডের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে আপনি সন্দেহভাজন ডাকাতদের ধরবার ও লুণ্ঠিত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেবার জন্য মহারানী ভবানীর আমলাকে কঠোর ও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবেন। আমি আরো প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, এই সম্বন্ধে তদন্ত চলাকালে আমার কাছ থেকে মাঘ মাসের পাওনার দাবী স্থগিত রাখার জন্য রাজস্ব কমিটির ভদ্রমহোদয়গণকে নির্দেশ দেওয়া হোক এবং ভবিষ্যতে আমার রাজস্বের নিরাপত্তার খাতিরে নায়েবের আবেদন অনুযায়ী প্রতি কিস্তির নিরাপত্তার জন্য রঙপুরের কালেক্টরের সুপারিন্টেডেন্টকে কিছুসংখ্যক সিপাই এবং অন্যান্যদের নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। এ নাহলে নিরাপদে রাজস্ব আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা দেখা দেবে।"

চতুর্থ অধ্যায়

ইংরেজের রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা এবং মোগল নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভাঙ্গন

(১) মহম্মদ রেজা খানের বক্তব্য

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের সময় থেকেই কোম্পানীর কাছে ডাকাতিটা একটা স্থায়ী আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ডাকাতি সমস্যার দিকে নজর দেবার জন্য সরকার ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ রেজা খানকে অনুরোধ করেছিলেন।[১] পাঁচ বছর পরে মহম্মদ রেজা খান কোম্পানীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে দেশের সরকারের অন্যতম কাজ ছিল "মফস্বল থেকে দস্যুদের বিতাড়িত করা"[২] যার অর্থ হোল পল্লী অঞ্চল থেকে ডাকাতদের নিশ্চিহ্ন করা এবং "ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারের হাত থেকে তালুকদারদের রক্ষা করা।"[৩] একবছর পরে কোম্পানীর অনুরোধে নায়েব দেওয়ান তাঁর বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করে জানিয়েছিলেন ঃ

"মফস্বলের তালুকগুলোতে পাহারাদার পাঠাবার একমাত্র উদ্দেশ্য হোল কোনরকম সীমানাব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকা দেশদ্রোহী (Seditious) মানুষদের দ্বারা বলপূর্বক কিংবা অন্যায়ভাবে স্বত্বদখলের বিরুদ্ধে স্বত্বাধিকারীদের নিরাপত্তাবিধান এবং আনাগোনাকাবীদেব ("comers and goers") উৎপীড়নের হাত থেকে কৃষক ও অধিবাসীদের রক্ষা করা।"[১]

প্রাচীনকালে এইভাবেই পল্লী অঞ্চলের শান্তি রক্ষিত হোত। "সীমানার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকা দেশদ্রোহী"[৩] আর "আনাগোনাকারীরা" ছিল এমনসব মানুষ যারা ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিককার বছরগুলোতে নতুন শাসনকে দুর্বল করে দিতে ডাকাতরূপে দলবদ্ধ হয়েছিল। আমাদের আলোচ্যকালে সন্ন্যাসী আর ফকিরেরা ছিল এমনই সব ভবঘুরে মানুষ[৪] যাদের রাজদ্রোহিতা সম্বন্ধে ইংরেজের কোন সন্দেহই ছিল না। মোগল নথিতে কিন্তু এদের ডাকাত বলা হয়নি এবং মোগল শাসনব্যবস্থার শেষ মুখ্য প্রতিনিধি মহঃ রেজা খানও ডাকাতদের থেকে এইসব মানুষদের আলাদা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। অথচ ইংরেজ আমলে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটাই গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। মোগল আমলে গ্রামীণ অভ্যন্তর কাঠামোর মধ্যে এমন এক কার্যকরী শক্তির অস্তিত্ব বজায় ছিল যা জনগণের ভাসমান অংশকে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোট বাঁধা থেকে বিরত রাখতে পারত। কিন্তু যেহেতু এরা সবাই ছিল মধ্যস্বত্বভোগী—এদের অস্তিত্ব বজায় থাকার অর্থ ছিল মধ্যবর্তী স্তরে রাজস্বে ভাগ বসান এবং দেশের আঞ্চলিক রাজস্ব থেকে পাওয়া মুনাফাকে হ্রাস করা—তাই কোম্পানীর শাসন এই শক্তিগুলোকেই নষ্ট করে দিয়েছিল। বাংলাদেশে কোম্পানীর শাসনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল রাজস্বের সর্বাধিকরণ অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব লাভ। এই লক্ষ্যই সামাজিক উদ্বৃত্তের তলানিটুকু পর্যন্ত আত্মসাৎ করার চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। মোগলরা, তাঁদের স্বকীয় মহিমায় বাস করতেন। থাকতেন জনগণ থেকে অনেক দূরে নিজেদের বিজন আভিজাত্যে। ফলে

অধস্তন প্রশাসনে অপ্রত্যক্ষ শাসন কায়েম হত। শাসনের নিম্নতলে স্তরে স্তরে অসংখ্য মানুষকে বিধি মেনে স্থান দিতেন নবাবরা। তাঁদের রাজস্ব ও কর্তৃত্বের অনেকটাই তাঁরা গ্রামবাংলার অসংখ্য স্থানীয় প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে প্রাসাদ ও ক্ষেত্রের মধ্যেকার শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল স্তর বিভক্ত মানুষের অবস্থানে। আর সেইসঙ্গে গ্রামবাংলার অভ্যন্তরে শ্রেণী শোষণের এমন এক পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যার মাধ্যমে মোগলদের শাসন ক্ষমতা ও শৌর্য প্রকাশ পেয়েছিল। কোম্পানীর শাসন এক নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ভিন্নতর নিষ্পেষণের নীতি প্রবর্তন করেছিল। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা আর মধ্যবর্তী স্বত্বভোগীদের সমৃদ্ধি —এ দুটোই ছিল একটা বাণিজ্যিক কোম্পানীর বিশেষ অধিকার ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল বিষয়। ফলে এখন এর জায়গা নিল নির্মম এক রাষ্ট্রীয় শক্তি।

(২) সামাজিক হিংসা নিয়ন্ত্রণের মোগল কৌশল

নিষ্কর তথা রাজস্বমুক্ত ভূমিদান ব্যবস্থাটা ছিল মোগলদের এমনই এক হাতিয়ার যার সাহায্যে তাঁরা প্রশংসনীয়ভাবে সামাজিক হিংসার প্রবণতাকে দমন করেছিলেন। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল রাজস্ব দপ্তরকে লেখা তমলুকের ম্যাজিস্ট্রেটের পত্রে ১৭৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত বহাল থাকা তমলুকের মোগল পুলিশী ব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] তিনি জানিয়েছিলেন ঃ

"পরগণা মাইসাউদলে (মহিষাদল) ফৌজদারী পোইক (পাইক) এবং তমলুকে দিগওয়ার নামক কর্মচারীদের দ্বারা এইসব জেলাগুলোর (মহিষাদল ও তমলুক) আরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।"

মহিষাদলে ১৫৬ জন পাইক ও ৮ জন সর্দার ছিল। তারা "ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের ভাতা পেত।" তমলুকে ছিল ২ জন সর্দার, ২ জন নায়েব সর্দার এবং ১২৪ জন দিগওয়ার। মহিষাদলে ৮ জন সর্দারের অধীনে ছিল ২০১ বিঘা ১২ কাঠা ৬ ছটাক জমি। এইসব জমি থেকে মাসে আয় হোত ১৫৭ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক সর্দারের মাথাপিছু মাসিক আয় ছিল গড়ে ১ টাকা ১০ আনা। ১৫৬ জন পাইকের দখলে ছিল ১,৬৯৩ বিঘা ২ কাঠা ১১ ছটাক জমি যার থেকে মাসে আয় হোত ১,৩৮১ টাকা ৭ আনা অর্থাৎ মাসে গড়ে মাথাপিছু প্রায় ১১ আনা। তমলুকে দু'জন সর্দার, দু'জন নায়েব এবং ১২৪ জন দিগওয়ারের দখলে ছিল ৭৬৮ বিঘা জমি, জমা (অর্থাৎ প্রদেয় খাজনা) অনুসারে যার অর্থমূল্য ছিল ১,৫৩৬ টাকা অর্থাৎ মাসে গড়ে মাথাপিছু ১ টাকা। ম্যাজিস্ট্রেট আরো জানিয়েছিলেন ঃ

"পূর্বে জেলাগুলোর প্রত্যক্ষ পরিচালন ক্ষমতার অধিকারী থাকার ফলে জমিদারেরাই পাইক ও দিগওয়ারদের নিয়োগ করতেন, শান্তিরক্ষা এবং আপন ক্ষমতার মধ্যে ডাকাতি প্রতিরোধে সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বনের কবুলিয়ৎ দানের পরিবর্তে তাঁদের সনদ প্রদান করতেন আর তারা সরকার কিংবা জমিদার কারুকেই কোনরকম সেলামি দানে বাধ্য ছিলেন না . . . . "।

এইভাবে আপন অধীনস্থ যে সব মানুষদের মধ্যে জমিদারেরা জমি বিতরণ করতেন তারাই জমিদারের সশস্ত্র বাহিনী হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে দেশের শান্তিরক্ষার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করত। শান্তিরক্ষা ও ডাকাতি প্রতিরোধ করবে এমনটা কবুল না করলে তাদের জমি দেওয়া হত না। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের এক নথিতে দেখা যায় যে, বর্ধমানের জমিদারের অধীনে ৪৮,৯৫৮ বিঘা ৭ কাঠা জমি তাঁর থানাদারি কোতয়ালি এবং অন্যান্য শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল।[৭] মোগল নথিতে এইসব জমিকে চাকরান জমি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও "থানাদারদের[৮] খোরাকি বাবদ মাসিক টাঃ ২,০৪০-১৫-১৫" জমিদাররা ব্যয় করতেন। থানাদারদের কাজ সম্বন্ধে নথিতে বলা হয়েছে ঃ

"থানাদারদের কাজ হোল ডাকাতদের হাত থেকে রাজপথকে মুক্ত রাখা আর চুরি ও ডাকাতিজনিত ক্ষয়ক্ষতির দায়ভারও তাঁদেরই বহন করতে হয়। প্রদেশের সর্বত্রই তাঁরা ছড়িয়ে আছে এবং তাঁদের আপন আপন থানার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল নির্দেশনামা প্রধান কাছারী থেকে তাদের কাছে পাঠানো হয়। আপন এলাকার তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা তাঁদের আর কাছারীর শাসন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীও তাঁরাই। সংক্ষেপে বলতে গেলে তারাই হলেন এলাকার রক্ষক, তাদের ছাড়া রায়তরা নিজেদের জীবন তথা সম্পত্তির নিরাপত্তার কথা চিন্তাও করতে পাবে না"।[৮]

নিয়মমাফিক শান্তিরক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থানাদারদের স্বাধীনতা ও গ্রাম-সমাজে তাঁদের উপস্থিতিকে এইভাবেই ইংরেজের সরকারী নথিতে দেখানো হয়েছে। জমিদারেরা রাজস্ব আদায় করে তার এক-দশমাংশ নিজেরা রেখে বাকি অংশটুকু সরকারের ঘরে জমা দিতেন। আর এটা করলেই সরকারের অধীনস্থ জমিদার হিসাবে সরকারেব হয়ে এলাকার অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করবেন এই শর্তে জমিদারেরা চূড়ান্ত স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা লাভ করতেন। শুধু তা-ই নয় আবওয়াব[৯] নামের আড়ালে অতিরিক্ত আয়ের এবং সেই সঙ্গে নিষ্কর জমি ভোগ দখলের সুযোগ পেতেন।[১০] এইভাবে জমিদারেরা সরকারের অধীনে থেকে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ও আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে এঁরাও আবার একইভাবে তাঁদের অগণিত কর্মচারীদের নিষ্কর জমি ভোগ দখলের এবং রসুম, বৃত্তি, সেলামী ইত্যাদি নামে অর্থ আদায়ের অধিকার দিতেন। এইভাবেই মোগল আমলের সাধারণ শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ক্ষমতা ও সম্পত্তির ক্রমবিন্যাস হয়েছিল। বহু বছরের প্রশ্নাতীত ও স্বীকৃত কর্তৃত্ব ও সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারের মধ্যে গ্রাম-সমাজের কাজী, মুফতি, কানুনগো, ফৌজদার, থানাদারদের অবস্থান এবং এঁদের মতন অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও কর্তৃত্ব সম্পর্কিত ধারণার এই প্রেক্ষাপটেই মোগলদের শ্রেণী কাঠামোর বিকাশ ঘটেছিল। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বর্ধমানের পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে মোগলদের শ্রেণী কাঠামোকে এইভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন ঃ

"বর্ধমানের জমিদারিতে জমিদারের ঠিক নীচেই ছিলেন বক্‌সী যিনি মুচলেকা বা চুক্তি

অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপহৃত জিনিষপত্র বা তস্করকে হাজির করতে কিংবা ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকতেন। প্রতিটি জেলায় বক্সীর নীচে থাকতেন জমিদারি ফৌজদার বা থানাদারেরা যাঁরা ছিলেন বক্সীর অধীনস্থ জমিদারের চাকরান (জীবনধারণের জন্য দেয় জমি ও তার মালিক) কর্মচারী। সন্দেহজনক এলাকায় পথিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হত। বণিকদের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল।"[১১]

জমিদারের অধীনতা স্বীকার করবে, এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করবে এবং এইভাবে তাদের প্রভু জমিদারকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সাহায্য করবে এই শর্তে জমিদার তাঁর শাসন ও পীড়ন ক্ষমতাকে আপন অধীনস্থ ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করতেন। এইভাবে রচিত হত স্বশাসনের সোপান যার উপর দাঁড়িয়ে থাকত গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার ক্রমকাঠামো। বস্তুত এটা ছিল সামাজিক শ্রেণী কাঠামোর সোপান বেয়ে ওপর থেকে নীচে নেমে আসা স্বশাসন (autonomy), কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের বন্দোবস্ত। তার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে ঐ একই শ্রেণী কাঠামোর নীচুতলা থেকে ক্রমান্বয়ে উপরে উঠে সর্বোচ্চ তল পর্যন্ত ছড়িয়ে যেত অন্য এক বিশ্বাস, আনুগত্য আর কর্তব্যসাধনের বাস্তব প্রয়াস। রাজধানীতে অবস্থানরত শাসকপ্রধান এবং দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁরই শাসন প্রতিনিধিদের মধ্যেকার এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা দৈনন্দিন শাসনের ক্ষেত্রে মোগলদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগকে বহুলাংশে হ্রাস করেছিল। মোগলদের ব্যাপক মঞ্জুরী ব্যবস্থার মধ্যেই আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত সকল ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই শাসন কাঠামোর মধ্যে প্রতিটি শ্রেণীই ছিল জমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেইসব জমিগুলো ছিল আবার রাজস্বমুক্ত। এই ব্যবস্থা একদিকে যেমন তাদের স্থানান্তর গমনের প্রবণতাকে খর্ব করে একটা আঞ্চলিক সীমার মধ্যে তাদের বেঁধে রাখত তেমনি আবার সীমিত সম্পত্তি ও কর্ম-অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও সাফল্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখত। নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিটি সদস্যের আত্মসন্তোষ থাকায় প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব দাবীর প্রয়োজনে ব্যক্তিগত অভ্যুত্থানের প্রয়াস নস্যাৎ হয়ে যেত আর উচ্চতর শ্রেণীর শ্রেণীগত আত্মপ্রত্যয় অধস্তন শ্রেণীগুলির শ্রেণী সংঘাতের মনোভাবকে সংযত রাখত। বস্তুত প্রতিটি শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট কাজ, উদ্যম আর তাতে সকলের অনুমোদনের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। মোগলরা যে রাজস্বলোভী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই আর সেই রাজস্ব সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁরা অসংখ্য অধিকার, উপ-অধিকার, এবং অধস্তন ভোগস্বত্বের স্তর গড়ে তুলেছিলেন এবং এরই মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা আর দায়িত্বপ্রাপ্ত এমন এক ব্যাপক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্বৃত্তের দখলদার মধ্যবর্তী শ্রেণী হিসাবে যাদের কাজের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। দেশের মধ্যে থেকে তারা সম্পদ সংগ্রহ করত কিন্তু তাদের নিষ্কর জমি ভোগের এবং সেই সঙ্গে উপরি আয়ের আনুষঙ্গিক অধিকার লাভের মধ্যে দিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হোত তা-ই রাষ্ট্রকে গুরুভার রাজস্ব আরোপের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে গড়ে দিত।[১১৭]

(৩) কোম্পানীর কাজের ভিত্তি ছিল অবিশ্বাস

শুরু থেকেই সাধারণভাবে গ্রামের আমলাতন্ত্রের প্রতি কোম্পানী প্রশাসনের একটা অবিশ্বাসের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। ১৭৭০ সালে কোম্পানী প্রশাসনের নীতি নির্ধারক গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য বেচার এই নীতি নির্ধারণ করেন যে "ইংরেজ ভদ্রজনেরাই . . প্রকৃত কাজের উৎস হওয়া উচিত।"[১৩] রাজস্ব, পুলিশ ও বিচারকার্যের তদারকির জন্য মোগল আমলের আমিন উপাধি দিয়ে ইংরেজ সুপারভাইজারদের জেলায় জেলায় পাঠানো হয়। আপন দায়িত্ব গ্রহণের পরই নদীয়ার সুপারভাইজার "নদীয়ার রাজার অসৎ চরিত্র" নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দেন।[১৪] রঙপুরের সুপারভাইজার সেখানকার রাজার প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাইকের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে "পুরো দলটাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য" সুপারিশ করেন।[১৫] রাজশাহী থেকে সুপারভাইজার মফস্বল আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী কাজীদের বরখাস্তের কথা জানান।[১৬] শ্রীহট্টের সুপাবভাইজার থানাদারি ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার এবং তা সঙ্কোচনের জন্য সুপারিশ করেন।[১৭] চট্টগ্রামের সুপারভাইজারের রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢাকার ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) "এমন অযোগ্য জমিদারদের স্বতন্ত্রদপ্তর সদব কাছারী রাখার অনুমতি কেন দেওয়া হবে" সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।[১৮] স্বল্প আদায়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিপুল সংখ্যক কর্মচাবী নিয়োগ এবং তার জন্য বিপুল ব্যয় এই দুই কারণে সরকার ছোট ছোট জমিদারদের সদর কাছারী রাখার বিরোধিতা কবতেন।[১৯] আমিল এবং দেশীয় আদায়কারীদের দুর্নীতিগ্রস্ত কাজেব তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন বীরভূমের সুপারভাইজার।[২০] যশোরের সুপারভাইজার জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন এবং ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদেব (জমিদারদের) দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিযেছিলেন।[২১] এইভাবে জেলাগুলোতে মোগল প্রশাসন ব্যবস্থা যে কিবকম অকার্যকাবী হয়ে পড়েছিল সে সম্বন্ধে দেওয়ানীলাভের প্রথম দশক থেকেই কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার ইংরেজ প্রশাসকদের কাছে প্রচুব রিপোর্ট আসতে শুরু করে। বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বে এ ধরনের একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে মোগল শাসনব্যবস্থা সুশাসনের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য হারিয়েছে। মোগল ব্যবস্থার অসারতার বিষয়ে ইংরেজরা যে ইতিমধ্যেই ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে ২৪ পরগণার জমিদারদের অপসারণের মধ্যে দিয়ে সে-কথা প্রকাশ পেয়েছিল।[২১ক] সাধারণভাবে দায়িত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে আমিল, জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের দাবী নস্যাৎ করার লক্ষ্য নিয়ে দেশের মধ্যে সুপারভাইজারদের নিয়োগ করা হয়েছিল।[২২] বলতে গেলে বাংলার পুরনো আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে কোম্পানীর প্রশাসকদের ধারণাটা ছিল খুবই তিক্ত। কার্টিয়ার "এই দুষ্টচক্রের দুস্কর্ম" সম্পর্কে লিখেছিলেন : "এদের মেনে নেওয়ার অর্থ হোল তাদের প্রশাসনের অনুমোদন দান করা।"[২৩] ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রথমবার চট্টগ্রামে যাবার পর ভেরেলস্ট লিখেছিলেন: "এখানে আগে যারা রাজস্ব পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সেইসব মানুষের আমাদের কাছে রাজস্ব গোপন করা এবং আমাদের কাজকে জটিল করার প্রবল প্রয়াসের দুষ্ট অভিপ্রায় এতদিনে বাধা পেয়েছে।"[২৪] ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের কালেক্টর একজন ইউরোপীয় কর্মচারী চেয়েছিলেন — "একজন ভারতীয় বা কৃষ্ণাঙ্গ আমাদের সমস্ত

উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেবে" — বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন।[১৫] একজন দেশীয় বাজাকে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য কোম্পানীর প্রশাসনিক মহলে দুর্নামের অধিকারী বর্ধমানেব কালেক্টর কিনলক ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউকে জানিয়েছিলেন ঃ "বিপজ্জনক ও ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিরা তরুণ রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করেছে এবং তাঁকে বিপথে চালিত করছে"।[১৬]

গোড়ার পর্বে ইংরেজের আধিপত্যের সূচনা হবার দিনে বাংলাদেশের মানুষদের সম্বন্ধে ইংরেজের ধারণা যে কতটা খারাপ ছিল এগুলো হোল ইংরেজেরই সরকারী নথিপত্র থেকে পাওয়া তারই কিছু নমুনা নাত্র। অথচ ইংরেজের নথিতে যাঁদের এইভাবে 'দুষ্টজন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে মোগল আমলে তাঁরাই কিন্তু প্রাসাদ থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তারাই শতাব্দী পরম্পরায় চালিয়ে এসেছে দেশীয় প্রশাসন। বহু বছর ধরে কলকাতার ইংরেজ প্রশাসকেরা চিনতেন শুধু কোম্পানীর স্বার্থপব ব্যক্তিদের ও তাদের সহযোগী বন্ধুবান্ধবদের যারা ছিল শুধু আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। বেনিয়া, দালাল আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই তাঁরা কেবল পরিচিত ছিলেন। তাঁদেরই মধ্যমণি ছিলেন কান্তবাবু, রাজা নবকৃষ্ণ, কাশীনাথবাবু গঙ্গাগোবিন্দ এবং তাদেরই মতন অন্যান্যবা — দেশের অভ্যন্তরে কান্তবাবু ও নবকৃষ্ণরা ছিলেন না যাঁরা নিজেদের বন্ধক দিয়ে বড়লোক হযেছিলেন। সেখানে ছিল সাধারণ মানুষ স্বাধীন ও আত্মপ্রত্যয়শীল। নিজেদের আড়াল করে রাখা এমনসব মানুষজনের সংস্পর্শে ইংরেজরা সেখানে এসেছিল যাঁরা এক প্রচণ্ড আক্রমণমুখী সরকারের অপ্রতিরোধ্য দমন নীতির বিরুদ্ধে আপন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নিজেদের সম্পদ ও তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ইংরাজদের কাছ থেকে গোপন রাখতে তৎপর ছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জমিদার এবং তাঁদের লোকজনের ওপর মোগলদেরও কোন আস্থা ছিল না। তবুও কিন্তু দেশের অভ্যন্তরভাগের সামাজিক উদ্বৃত্তের আত্মসাৎকারী, পরজীবী বলে এদের উচ্ছেদের কোন চেষ্টাও মোগলরা করেন নি।[১৭] কারণ তাঁরা জানতেন যে, বহু শতাব্দী ধরে দেশের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এইসব জমিদার ও গ্রামের আমলারা দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই সঙ্গে সমাজের নীচের স্তরের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকারীদেরও মুখপাত্র তারাই। আবার ওপর থেকে নেমে আসা রাষ্ট্রিক অত্যাচারের অস্ত্র হিসাবে কৃষকদের বিরুদ্ধে তারাই ব্যবহৃত হত। এইসব মানুষেরাই শেষপর্যন্ত গ্রাম সমাজের ঐক্যরক্ষাকারী হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত সরকারী দাবী আর তার বিরুদ্ধে জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এ দুয়েব মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন জমিদার আর তাঁদের আমলারা। পুরো অষ্টাদশ শতাব্দী ধরেই রাজস্বলোভী বাংলার নবাবেরা রাজ্যের জমিদারিগুলোকে রাজস্ব প্রদানকারী সুসংগঠিত সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য একদিকে যেমন সবসময়ই জমিদারদের শক্তি বাড়াতে চেয়েছিলেন[১৮] অন্যদিকে তেমনিই আবার রাজস্ব সংগ্রহকে জোরদার করার প্রয়োজনে কিংবা গোপন সম্পদকে খুঁজে বার করার প্রবল তাগিদে জমিদারদের মাথার উপরে আমিলদের[১৯] নিয়োগ করতেন। এটা ঠিক যে, মুর্শিকুলি খানের[১৯ক] আমলের মতন কোন কোন সময় জমিদারদের নির্মমভাবে প্রহার করা হলেও গ্রাম-বাংলার প্রভু হিসাবে তাঁদের অধিকারকে বড় একটা অস্বীকার করাও হোত

না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময়টা ধরেই জমিদারদের ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে খর্ব করা হয়েছিল। তাঁদের বিচার ও শান্তিরক্ষার দায়িত্বকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের আমলারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁদের উপরি আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিজস্ব আরক্ষাবাহিনী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্বের উৎসটাই তাঁদের শুকিয়ে গিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় পর্যন্ত যখন ২৪ পরগণার জমিদারেরা মাঝেমধ্যেই জমিদারিচ্যুত হয়েছিলেন তখন সরকার ২৪ পরগণার জমিদারদের মতন তাঁদের স্বশাসনের আর সেই সঙ্গে রাজস্বের অধিকার কেড়ে নেবে এই আশঙ্কায় বাংলার জমিদারেরা সর্বক্ষণ আতঙ্কে দিন কাটিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থায় তাই তারা হয় নিজেদের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন আর না হয় আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছিলেন অর্থাৎ আত্মরক্ষার খাতিবে হয় তাঁরা নিজেদের সম্পদকে লুকিয়ে রেখেছিলেন কিংবা নিজেদের শাসন আর ক্ষমতাকে বজায় রাখতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে এক জমিদার কর্তৃক তাঁর গোমস্তাকে পাঠানো নির্দেশনামার উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

"রামপ্রসাদ মোহরার জেনেছে যে, মিঃ স্টেপলস (Staples) খুবই তাড়াতাড়ি মফস্বলে আসবেন এবং তিনি জমা ও আদায়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করবেন। তাই আপনি আপনার জেলার হিসাব অবশ্যই ঠিকভাবে তৈরী করে রাখবেন। দেশ খরচা, মাথুট, শাদী খরচ বিট্টি বিরত্তি (বৃত্তি) খাতে কোন কিছুই যেন দেখানো না হয়, সদরে মাসিক শর্তে রায়তদের দেওয়া চিট্টা ও রসিদের এবং চার ধরনের খাজনার ক্ষেত্রেই যে শুধু রায়তদের নাম থাকবে সেদিকে আপনি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। মঙ্গলবার ১০ই ফাগুন (ফাল্গুন) স্টেপলস রওনা দেবেন একথা খেয়াল রেখে সেইমত কাজ করবেন। আমি আপনাকে বলতে চাই যে, নিজের কাজে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করবেন এবং খুব সতর্কভাবে আপনার জেলার সমস্ত রায়ত ও এতেমামদারদের আগে থেকেই সাবধান করে দেবেন।"

এই পত্রের পরিশিষ্ট রাজা নিজের হাতে লিখেছিলেন ঃ "যা লিখছি তা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, এই পরিকল্পনাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিশ্চয়ই যাবেন এবং আমাদের তাঁকে সঙ্গ দিতে হবে। তিনি রায়ত ও এতেমামদারদের মাসিক চিট্টা ও রসিদ মিলিয়ে দেখবেন। যদি কোন অমিল দেখা যায় তবে আপনার ফাঁসি হবে। কাগজপত্র ও লেখার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন এবং আপনার চারপাশের জিলাদারদের খবর পাঠাবেন যে তাঁরা যেন সকলেই একমত হন"।

জমিদার, এতেমামদার, জিলাদার, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলা এমন কি রায়ত অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ জোট বেঁধে কোন প্রশাসনের কাছে সংবাদ গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। দৃশ্যত জমিদার এবং তাঁদের লোকজনেরা তাঁদের সম্পদকে ইংরেজের প্রবল হস্তক্ষেপের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা কাউন্সিল সামুয়েল লুইসকে "দেশীয় আমিনদের করা স্থানীয় পরীক্ষায় খুব বেশী প্রতারণা ও অতিরঞ্জনের সুযোগ থাকে" বলে সতর্ক করে দিয়ে তাঁকে "ব্যক্তিগত অনুসন্ধান মারফৎ সঠিক হিসাব নেবার" জন্য

পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩৩] এরই আগের বছর মেদিনীপুর থেকে ফার্গুসন জমিদাবদের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও চক্রান্ত, অন্যায় বিষয়ে প্রশ্রয়দান আর গোপন কাজে জড়িত থাকার ব্যাপারে তাঁদের আসক্তির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন।[৩৪] তিনি জানিয়েছিলেন যে, "দেশীয় মানুষদের সভ্য করার এবং আমাদের সরকারের সঙ্গে তাদের পরিচিত করার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেওয়ার, জমিদারদের উৎপীড়ন কমানো এবং তাদের অত্যাচারেব বিরুদ্ধে যে প্রতিবিধান আছে সে সম্বন্ধে রায়তদের অবহিত করে ও শিক্ষা দিয়ে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতাকে হ্রাস করার ইচ্ছাই" তাঁর মেদিনীপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্য।[৩৫] একেবারে শুরু থেকেই জমিদারদের হাতে থাকা বিচার ও পুলিশী কাজের দায়িত্ব যতটা সম্ভব বেশী পরিমাণে সরকারের হাতে ফিরিয়ে নিয়ে ভারতীয় জনসমাজকে যুক্তিবাদী ও বিচারশীল করে তোলাই ছিল ইংরেজদের লক্ষ্য। ইংরেজ শাসকগণ জমিদারদের অত্যাচারের যন্ত্র হিসাবেই দেখেছিলেন, মোগলরাও এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন নি আবার ইংরেজদের মতন তাঁরা কিন্তু কখনোই এ কথাকেও অস্বীকারও করেন নি যে, রাজস্ব সংগ্রাহক, বিচারকর্তা, অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী, পুলিশকর্তা, ঋণদানকারী[৩৬] ও কররেহাইদানকারী, বাঁধনির্মাতা, বিদ্যালয় ও মন্দিরের মতন প্রতিষ্ঠান নির্মাণকারী আর সর্বোপরি গ্রাম্যজনতার প্রভু — এককথায় শক্তির দ্বারা রচিত শাসনের নীতির সঙ্গে শাসন শক্তির প্রয়োগের সমন্বয় সাধনকারী ব্যক্তি হিসাবে জমিদার এবং তাঁদের আমলারা গ্রাম-সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিরোধে অক্ষম গ্রাম-সমাজ, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি নিয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকত তার দৈনন্দিন জীবন ও শাসনক্ষেত্রে গতানুগতিকতার ভারে ভারাক্রান্ত মোগল আমলের একটা গ্রাম এমনই এক শান্ত-সরল পরিবেশকে গড়ে তুলত যার ওপর ভিত্তি করেই সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে জমিদার শ্রেণীর ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারত। মোগল আমলে বাংলাদেশে এ ধরনের নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে নদীয়ার একজন রাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কিংবা নাটোরের রাণী ভবানী বড় উদাহরণ হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা নিশ্চিতভাবেই এমন একটা আচরণের আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন যা বাংলাদেশের প্রত্যন্তস্থানে অবস্থিত তুলনায় ছোট অসংখ্য জমিদারেরাও তা অনুসরণ করেছিলেন। এইসব জমিদারদের অবদানকে সাম্প্রতিককালের এক গবেষণায় এইভাবে স্বীকৃতি জানান হয়েছে ঃ "কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রদেশের এই সুস্থিত অবস্থাটা অনেককাংশেই বাংলার জমিদারদের কাছে ঋণী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নয়, তা সে মোগলই হোক বা ইংরেজই হোক।"[৩৭]

অথবা

"সাধারণভাবে জমিদারদের শাসন তুলনামূলকভাবে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের অনুকূল ছিল। সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এবং বিহার ছাড়া, বাংলার জমিদারেরা নিজেদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এলাকা বৃদ্ধির জন্য শক্তিপ্রয়োগ করতেন না। কিংবা মোগল ভারতের অন্যান্য স্থানের জমিদারদের দৃষ্টান্তকেও অনুসরণ করতেন না যেখানে আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী তারা কৃষকদের উপর এমন কর বসাতেন যা তাদের পলায়নে বা বিদ্রোহে প্ররোচিত করত অথবা নিজেরাই বিদ্রোহের উস্কানি দিতেন। এখনো পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায়

ব্যাপক জনশূন্যতা কিংবা গ্রাম্য বিদ্রোহের নজির পাওয়া যায়নি। বাংলার জল কিংবা স্থলপথে পণ্য ও মনুষ্য চলাচলের ক্ষেত্রে জমিদারেরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী নিরাপত্তাবিধানে সক্ষম ছিলেন। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক লিখেছিলেন যে, প্রায়ই মাত্র একজন, দু'জন কিংবা তিনজন মানুষের তত্ত্বাবধানে বণিকেরা বাংলার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সোনা-রূপা পাঠাতে পারতেন।"[৩৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার জমিদারেরা ছিলেন এরকমই। কোম্পানীর শাসনই তাঁদের শয়তানে পরিণত করেছিল, দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী প্রশাসন নদীয়ার রাজাকে জাতিচ্যুত করার হুমকি দেবার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং "এমন সব চরম দণ্ডদানের কথা বলেছিলেন যার প্রয়োগের প্রথা তখন চালু ছিল না।"[৩৯] কোম্পানী বর্ধমানের রাজার এলাকাতেও এই কারণে সৈন্য পাঠাবার কথা চিন্তা করেছিল যাতে "একবার এমন ভয় দেখানো হবে যাতে তিনি তাঁর রাজস্বপ্রদানে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী হবেন।"[৪০] মোগল আমলে যা ছিল একটা বিশেষ ব্যবস্থা সেই ভীতি প্রদর্শনই ইংরেজ আমলে দমন-পীড়নের এক সাধারণ হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। মীরকাশিম যিনি জমিদারদের কাছ থেকে তাঁদের সাধ্যাতিরিক্ত হারে রাজস্ব আদায় করতেন বলে শোনা যায়[৪১] তিনিও কিন্তু তাঁদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে অনুকম্পা দেখাতেন।[৪২] অন্যদিকে জমিদারদের প্রতি ব্যবহারে ইংরেজদের অশ্রদ্ধা ও অনুকম্পার অভাবই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। মোগল আমলেও সাধারণের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অশ্রদ্ধার ভাব যে ছিল না এমন নয়[৪২ক] কিন্তু যখন ব্রিটিশ আমলে একটা আক্রমণমুখী রাষ্ট্রশক্তির চাপ জমিদারদের ওপর এবং তাদের লোকজনদের ওপর পড়ত আর রাষ্ট্রশক্তি যখন বেপরোয়াভাবে গ্রাম-সমাজের মধ্যস্বত্বের স্তর নাকচ করতে প্রয়াসী হত তখনই তার পরিণাম হয়ে উঠত সর্বনাশা। প্রচণ্ড অশ্রদ্ধার সঙ্গে নবাবদের বৃত্তি[৪৩] এবং প্রতিষ্ঠাকে ক্ষুণ্ণ করে এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন[৪৪] ক্লাইভ। নবাবদের[৪৫] এবং সেই সঙ্গে রাজাদের বাহিনীর এক বিরাট[৪৬] অংশকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। এইভাবে যেসব পাইক, বরকন্দাজরা ছাঁটাই হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিল বিহারী, ভোজপুরী, জাঠ, রোহিলা, পাঠান — যাঁরা আলিবর্দি থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নবাব আর রাজাদের দরবারে কাজ করেছিলেন।[৪৭] এ সময় ঐসব মানুষেরা নিঃস্ব জনতায় পরিণত হওয়ার ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের মনে যে ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল সেটাই শেষপর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছিল। ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক জমিদারেরই পৃথক পৃথক তিন শ্রেণীর আমলা ছিল ঃ একদল আমলা জমিদারের পারিবারিক ও সদর কাছারির কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে এইসব আমলারা সদরে থাকতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর আমলারা রাজস্ব ও শুল্ক দপ্তরের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন এবং রাস্তা ও নদীর ধারে, হাট, বাজার ও এইরকম নানান ধরনের স্থানে অসংখ্য চৌকিতে থাকতেন। তৃতীয় শ্রেণীর আমলারা ছিলেন থানাদারি আমলা; জমিদারদের বিশাল পুলিশ ও আধা-কর্মচারী হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন এরা। তা ছাড়াও ছিলেন দেওয়ানী এবং নিজামত দপ্তরের কাজী, কানুনগো, ফৌজদার এবং এই ধরনের অন্যান্য কর্মচারীরা। এইসব মানুষেরা সকলেই ইংরেজ শাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

(৪) ইংরেজদের অবিশ্বাসের পরিণাম

ইংরেজের নথি থেকে কিছু উদাহরণ দিলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর প্রশাসন মেদিনীপুরে কানুনগো এবং তাঁদের আমলাদের সমস্ত ভাতা কেটে দিয়ে রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।[৪৭] অথচ এঁদেব বাদ দিয়ে গ্রামীণ শাসন সম্ভব ছিল না। আর তাই গ্রাহাম লিখেছিলেন, "অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে তাঁদের ছাড়া ভালভাবে কাজ চালানো যায় না . . . . ."।[৪৮] ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বীরভূমের সুপারভাইজার রাজার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১২,৮৫৩ থেকে কমিয়ে ৮,৮৩২ করেছিলেন আর এইভাবে ৬১,৪৩৪ বিঘা নিষ্কর জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন।[৪৯] প্রায় একই সময়ে দিনাজপুরে আমিলদের কর্মচারীদের মাসিক বেতন ৩,২৮৯ টাকা থেকে কমিয়ে মাসে ১,০০০ টাকা মাত্র করা হয়েছিল। রাজার ৭,৫৬০ জন কর্মচারীর মধ্যে ৩,৯৪০ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং ৬৪,৪৭৩ বিঘা নিষ্কর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।[৫০] এরই পাশাপাশি সরকার শুল্ক আদায়ের জন্য তৈরী সমস্ত চৌকি[৫১] বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। বাণিজ্য চলার স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করাটা এই কাজের উদ্দেশ্য হলেও এটা করতে গিয়ে কোম্পানীর প্রশাসন বহু মানুষকে কর্মচ্যুত করেছিল। সদরের বাইরের জমিদারদের আমলাদের ছাঁটাই করাব সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বড় বড় জমিদারির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সংস্কার পরিকল্পনাও কোম্পানী গ্রহণ করেছিল। দিনাজপুবে "তাঁর কাজে লাগে না তাঁব (রাজার) এমন সব আমলাদের ছাঁটাই করার" সিদ্ধান্ত কোম্পানী গ্রহণ করেছিল।[৫২] কিন্তু জমিদারদের কাছে আমলাদের কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা কে ঠিক করবে? ১,৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউ রাজার কর্মচারীদের বাৎসরিক ব্যয় ১৭,৮৮১ টাকা ৯ আনা থেকে কমিয়ে ১৪,৯৭৬ টাকা করেছিলেন।[৫২ক] তাঁরা বরকন্দাজদের ভাতাও এই যুক্তিতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে "এই ব্যয়ের জন্য জমিদার তাঁর চাকরান জমি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজিভোগ করে থাকেন।"[৫২খ] ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানে জনস্টোন যখন রাজার "নাজদিয়ান বাহিনীকে" সংকুচিত করেছিলেন[৫৩] তখন সেটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল আর তাই এর একটা অংশকে কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স আরো এক ধাপ এগিয়ে পুরো বাহিনীটাকেই তুলে দেবার জন্য দাবী জানিয়েছিলেন।[৫৪] যখন জমিদারি প্রশাসনের তদারকির জন্য পাঠানো স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকেরা জমিদারদের বাহিনীকে অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেছিলেন তখন ক্লাইভের মতন কোম্পানীর কেন্দ্রীয় প্রশাসকেরা নবাবের বাহিনীকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে করেছিলেন। ইংরেজ আমলে আমলাদের বরখাস্ত করা বা তাঁদের ভাতা হ্রাস করাটা ছিল দেশী শক্তিবর্গকে নিরস্ত্র করা এবং মধ্যবর্তী স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা রাজস্বে ভাগ বসানর প্রয়াসকে হ্রাস করার একটা নীতিমাত্র। ১,৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ভেরেলস্ট বর্ধমানের রাজার বাহিনীর বেতন বাবদ ব্যয় ২২,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫,০০০ টাকা তো করেছিলেনই সেই সঙ্গে তা পুরোপুরি ভেঙ্গে দেবার জন্যও কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন।[৫৫] ঐ একই বছরে মেদিনীপুরের ফৌজদার, কানুনগো, তহশীলদার এবং তাঁদের অধীনস্থ আমলাদের ভাতা কেটে নিয়ে তা জেলার রাজস্বের সঙ্গে

যুক্ত করা হয়েছিল।[৫১] অতীতে আমলাদের ভাতা বা দস্তুরী বন্ধের কথা চিন্তাও করা হোত না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এরই পরিণতি হিসাবে তাদের মধ্যে প্রথমে বিস্ময়, তারপর ঘৃণা ও ক্ষোভ এবং শেষে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছিল।

(৫) থানাদারি ব্যবস্থা

ইংরেজ আমলে সবথেকে বড় বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল দেশের অভ্যন্তরস্থিত থানাদারদের ক্ষেত্রে। তাঁদের প্রতি ইংরেজের বৈরিতা দেশের শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষাকরী সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকেই নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছিল।

জমিদারদের সঙ্গে জোট বাঁধা এবং কোম্পানীর লবণ-পরওয়ানার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপরাধে ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের বলরামপুরের থানাদারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজের বাণিজ্য, ডাকব্যবস্থা, রাজস্ব প্রশাসন এবং তাদের অন্যান্য যে কোন ধরনের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য কোম্পানী প্রশাসনের প্রতি জমিদারদের বৈরিতা এবং ফৌজদার, থানাদার, আমিল, গোমস্তা আর অধস্তন আমলাদের সঙ্গে জমিদারদের জোট বাঁধা সেই আমলের বাংলার ইতিহাসের একটা খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে বলরামপুরের থানাদারের বরখাস্ত সম্বন্ধে জেলা প্রশাসকের রিপোর্ট ছিল এই রকম ঃ

"আমি দেখেছি যে জমিদারদের লোকেরা তাঁদের কাছে পাঠানো লবণ পরওয়ানাকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না এবং তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বলরামপুরের থানাদারের প্রশ্রয়েই এই কাজে প্রবৃত্ত হন", ". . . . এখানে (বলরামপুরে) তাঁর অবস্থানের পুরোটা সময় তিনি (থানাদার) (এই রকম) প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং ব্যবসা থেকে দস্তুরী নিয়েছেন বলে আমি তাঁকে অবিলম্বে বরখাস্ত করেছি।"[৫৬ক] এরই পাঁচ বছর পরে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার থানাদার সেখানকার সুপারভাইজার থ্যাকারের সুপারিশক্রমে বরখাস্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সেখানকার জমিদারের সঙ্গে হাত মেলাবার এবং কোম্পানীর চুন সংগ্রহের কাজে বাধা দেবার অভিযোগ আনা হয়েছিল।[৫৬খ] জমিদারের সঙ্গে থানাদারের মিলন ছাড়াও তাঁকে বরখাস্ত করার অন্য কারণও ছিল। ১৭৭১-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে একবছর শ্রীহট্টে থানাদারের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ এতই বেশী ছিল যা কোম্পানীর প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ১৭৭২-এর ১০ই অক্টোবর ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Commitee of Circuit) সুপারভাইজারকে যা লিখেছিলেন তাতে তাঁরা সুপারভাইজারের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই একমত হয়েছিলেন ঃ "শ্রীহট্টে ব্যয় . . . স্পষ্টতই অত্যন্ত বেশী . . . তাঁদের একজনের বরখাস্ত থেকে আমরা ভালমতন আয় বৃদ্ধির আশা করতে পারি . . . "[৫৬গ] এটা ঠিক যে, কেন্দ্রীয় প্রশাসন থানাদার পদকে স্থায়ীভাবে তুলে দিতে চাননি। তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, থানাদারের কার্যকলাপই তাঁর বরখাস্তের জন্য দায়ী হবে। কিন্তু থানাদারকে বরখাস্ত করাটা কোম্পানীর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ত না কারণ থানাদার ছিলেন নিজামতের কর্মচারী, দেওয়ানের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর) কর্মচারী নন, আর তাই এর জন্য নিজামতের

আগাম অনুমোদন দরকার হোত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সময়ে কোম্পানী সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠায় কোম্পানীর প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষে থানাদারকে গ্রেপ্তার করার কোন অসুবিধাই ছিল না। থানাদারদের কোম্পানী শুধু এইটুকু অনুগ্রহ দেখাত যে তাদের বিচারের জন্য মুর্শিদাবাদে নিজামতের কাছে পাঠানো হোত।[৫৬ঘ]

১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতাব কেন্দ্রীয় প্রশাসন বর্ধমানের পুরো থানাদারি ব্যবস্থাটাকেই তুলে দিতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন কিন্তু এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ঃ

"আমি ৪৪১ জনকে ছাঁটাই করার পর বর্তমানে তাদের (থানাদারি বাহিনীর) সংখ্যা দাঁড়িয়েছে, ৩,২৫২ জন। সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের সংখ্যা হ্রাস করা এবং তাদের জায়গায় এক ব্যাটেলিয়ন সিপাই নিয়োগের ফলে কোম্পানীর ওপর যে শুধুমাত্র চুরি-ডাকাতির ক্ষতিপূরণের দায়িত্বই বর্তাবে না, বরং বর্তাবে সমস্ত অঞ্চলের জবরদস্তি আদায় ও উৎপীড়নের দায়িত্বও সিপাইরা, যা সর্বজনবিদিতভাবে সত্য যে এককভাবে দায়িত্ব পেলে এবং নিজেদের প্রভুদের কর্ত্তৃত্বের বাইরে গেলে করে থাকে।"[৫৭]

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে লাগামছুট হলেই সিপাইরা অর্থাৎ সশস্ত্র মানুষরা অভ্যস্ত কাজের বাইরে আইনের অনুমোদন নেই এমন কাজও করত। বর্ধমান এবং অন্যত্র যারা গ্রামের ওপর নজর রাখত এমনসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বলা হোত "গ্রাম সেবেনজামি ব্যক্তি"। এদের নিয়েই কোতয়ালি দপ্তর গড়ে উঠত আর বিশেষ করে রাত্রে তারাই গ্রাম পাহারা দিত। ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানীর কর্তৃত্ব কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স বর্ধমানের সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে কোম্পানীর এক ব্যাটেলিয়ন সিপাই-এর সাহায্যে সমস্ত জেলার নিরাপত্তা বিধান করতে চেয়েছিলেন।[৫৮] কলকাতার সিলেক্ট কমিটিরও ইচ্ছা ছিল একেই কার্যকরী করা। এর আগে বর্ধমানে রাজার 'নাগদীন' বাহিনীর একাংশকে হ্রাস করার ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারী জনস্টোনের সাফল্য এ ধরনের ইচ্ছাকে আরো জোরদার করে তুলেছিল। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে থানাদারি কর্মচারীদের অধিকারভুক্ত 'থানাজোত' জমি নামে পরিচিত বিপুল পরিমাণ নিষ্কর চাকরান জমির একাংশ নিয়ে নেওয়া হলেও তা পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়নি। গ্রাম সেরেনজামি কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাসের প্রশ্নে বর্ধমানের স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি ঃ

"এই শ্রেণী (থানাজোত জমির অধিকারীদের মুখোমুখী গ্রাম সেরেনজামি জমির অধিকারীরা) সম্পূর্ণভাবে আগের মতনই রয়েছে; সমস্ত অঞ্চল সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত তাই তাদের কোন অংশকে বাতিল করা যাবে না এবং কৃষকদের রাজস্বের ক্ষেত্রে তার আদায়কারীদের অর্থাভাবের ওজর কিংবা তা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের অনিচ্ছা সর্বব্যাপী তাই আমি কোন অংশ হ্রাসের ঝুঁকি নিতে পারি না। এই শ্রেণীর বিপুলসংখ্যক কর্মচারীরা খুব ভাল করেই এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করে দিয়েছে আর সেজন্যই তাদের কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনাটা প্রায় অপ্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে; যাই হোক্, এ ব্যাপারে

আপনাকে একটা পরিষ্কার ধারণা দেবার জন্য আমি একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব। এইসব কর্মচারীরা এলাকার প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে থাকা কোতয়াল ও পাইক ছাড়া আর কিছুই নয়, এদের মধ্যে ৮,৫০০ জনেরও বেশী রয়েছে নিকৃষ্ট এলাকা হিসাবে পরিচিত বিচ্ছিন্ন এলাকায়। এইসব মানুষেরা রাতে পাহারা দেয় এবং যেখানে তারা নিযুক্ত থাকে সেই গ্রামের সমস্ত চুরির ঘটনার জন্য তারা দায়ী থাকে। তারা ক্ষেতের ফসল এবং সেইসঙ্গে তা কাটা ও মজুত করার পর কৃষক ও জোতদারদের মধ্যে ভাগ না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর নজর রাখে, জোতদারদের গোমস্তাদের খাজনা দেবার জন্য রায়তদের নির্দেশ দেয়, আপন কর্তৃত্বের দ্বারা খাজনা দিতে বাধ্য করে আর মূল কাছারিতে অর্থ পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়। এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া নিরপেক্ষ হিসাব অনুযায়ী একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি গ্রামে গড় অনুপাত তিনজন ব্যক্তির বেশী নয়, সাকুল্যে তাদের অধিকারভুক্ত ভূসম্পত্তির পরিমাণ ১৮$^{১}/_{১}$ বিঘা।"[৬০]

বাংলাদেশের গ্রাম-সমাজে গ্রাম সেরেনজামি ভূসম্পত্তির অধিকারীরা একটা শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। এরা ছিল রায়তদের ঠিক ওপরের শ্রেণী। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ আবার নিজেরাই ছিল রায়ত। এই রায়ত আর গ্রামরক্ষীদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কটা এতই গভীর ছিল যে একটা শ্রেণীর বাস্তুচ্যুতি অন্য শ্রেণীকে প্রভাবিত করত। এটা যে অনেকটাই এরকম ছিল তার কারণ হোল গ্রামে পুলিশ কর্মচারীদের কৃষিজমি ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই প্রকৃত কৃষিকাজের দায়িত্ব বহন করত। মেদিনীপুরে পাইকান জমির মালিক পাইকরা বেশীর ভাগই ছিল কৃষক। হাতে অস্ত্র থাকায় বিপুলসংখ্যক সাধারণ রায়ত যাদের তারা নিয়ন্ত্রণে রাখত তাদের সঙ্গে তারা নিজেদের পার্থক্য গড়ে নিয়েছিল — এ ছিল এমনই এক কাজ যা করতে না পারলে তাদের চাকরান জমির অধিকারই বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। মোগল আমলের ভূমিদান ব্যবস্থা তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করেছিল ঃ প্রথমত, লোকসংখ্যা পর্যাপ্ত নয় এমন পরিস্থিতিতেও জমিকে কৃষির আওতায় নিয়ে এসেছিল এই ব্যবস্থা।[৬১] দ্বিতীয়ত, রূপার ঘাটতির জন্য যখন অর্থের প্রচলন খুবই কম ছিল তখন নগদ অর্থে বেতন দেবার দায়িত্ব থেকে সরকারকে এই ব্যবস্থা মুক্তি দিয়েছিল[৬২] এবং তৃতীয়ত এই ব্যবস্থা একটা জেলার বিপুলসংখ্যক মানুষকে জমির সঙ্গে যুক্ত রেখে তাদের স্থানান্তর গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে কৃষির সঙ্গে যুক্ত কিংবা কৃষিকাজে তদারককারী মানুষদের একাংশের পলায়নী মনোবৃত্তি এর ফলে নষ্ট হয়ে যেত। এরকম ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে উৎপাদন আর তারই সঙ্গে রাজস্বের অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। প্রশাসনের ওপর তলার অসহনীয় নিষ্পেষণের চাপে অসহায় সাধারণ রায়তদের মনে যখন জমি ছেড়ে চলে যাবার প্রবণতা দেখা দিত তখন তাদের নিজস্ব এলাকার মধ্যে ধরে রাখার দায়িত্ব গ্রাম্য পুলিশবাহিনীর সদস্যদের ওপরই বর্তাতো। এইভাবে গ্রামরক্ষীবাহিনীর সদস্যরা মূল কৃষি উৎপাদকদের, একই গ্রাম বা পরগণার বাসিন্দা হওয়ার দরুন এবং সেইসঙ্গে জীবিকা অর্জনের একই ধরনের উৎস অর্থাৎ জমির ওপর নির্ভরশীলতার দরুন, গ্রাম্যরক্ষীবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মূল কৃষি উৎপাদকদের এক নৈকট্য ও কার্যকরী যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। যাদের সঙ্গে তাদের একটা নৈকট্য গড়ে উঠেছিল, তাদের সাথেই তারা একটা কার্যকরী যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল যে

যোগসূত্র ডাকাতির বনিয়াদ রূপে কাজ করতে পারতো। কাজেই যখন কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স বা লণ্ডনে অবস্থিত কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কিংবা সিলেক্ট কমিটি অর্থাৎ কলকাতাস্থিত কোম্পানীর স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রের জন্য কিছু করার নামে রাজস্বের অংশভোগকারী দেশের মধ্যেকার নিম্নতম পর্যায়ের রাজপ্রতিনিধিত্বকে বিলোপ করতে চেয়েছিলেন তখন দেশের মধ্যে অবস্থিত তাঁদেরই অধীনস্থ কর্মচারীদের কণ্ঠে এর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ধ্বনিত হয়েছিল। এর কিছু বছর পরে কমবয়সী ও বেপরোয়া সুপার ভাইজার, কালেক্টর ইত্যাদি পদের ব্যক্তিদের জেলাগুলোতে পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁরাই কলকাতার কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রবল অপছন্দের কথা মনে রেখে দেশের অভ্যন্তরের থানাদার ও তাঁদের লোকজনের কাজে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীহট্ট থেকে পাঠানো থ্যাকারের নিম্নলিখিত রিপোর্টের কথা উল্লেখ করতে পারি :

"আমার পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় হবে শ্রীহট্ট অঞ্চলের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় যা অযথা সাঙ্ঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ কোন কাজে লাগছে না তা কমিয়ে ফেলা . . আমার সন্দেহ নেই যে তান্নাদারদের (থানাদারদের) ব্যয়ের বড় অংশই বন্ধ করা যেতে পারে।"[৬৩]

শ্রীহট্টে থানাদারি খরচ নিঃসন্দেহেই খুবই বেশী ছিল,[৬৪] তবুও আর্থিক ব্যাপারটাই যে শুধু সেখানকার তরুণ সুপারভাইজারের চিন্তাকে প্রভাবিত করেনি তা নিশ্চতভাবেই বলা চলে। শ্রীহট্টের পাণ্ডুয়ার থানাদারকে থ্যাকারে (Thackeray) যে বরখাস্ত করার কথা বলেছিলেন তার কারণ সে জমিদারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল এবং কোম্পানীর চুন সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।[৬৫] যাই হোক, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ থানাদারের বরখাস্তকে সমর্থন করলেও থানাদারি ব্যয় হ্রাসের জন্য থ্যাকারের প্রস্তাবকে মেনে নেননি। কমিটি অফ সার্কিট সুপারভাইজারকে উত্তরে লিখেছিলেন :

"তান্নাদার (থানাদারদের) ব্যয় সম্পর্কে আপনার বক্তব্য অত্যন্ত সঠিক বলেই মনে হয় . . . তা সত্ত্বেও শ্রীহট্ট একটা সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় বর্তমান ব্যবস্থার কোনরকম আকস্মিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে আমরা অনুমোদন করতে পারি না এবং এই ব্যবস্থাকে যদি আমরা মেনে নিই তবে তাকে কার্যকরী করার জন্য আপনাকে যে কোন সংখ্যক সিপাই পাঠাবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।"[৬৬]

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বর্ধমানে থানাদারি বাহিনীকে ভেঙ্গে দিতে চাইলেও শ্রীহট্টে কিন্তু তাঁরা ঐ ব্যবস্থাকেই বজায় রাখতে চেয়েছিলেন এবং দুটো ঘটনাতেই প্রশাসকদের কেন্দ্রীয় মতামত স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এ ধরনের ঘটনার তৃতীয় নজির আমরা দেখতে পাই দিনাজপুরের ঘটনায়। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে দিনাজপুর থেকে উইলিয়াম ম্যারিয়ট মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদকে (Controlling Council of Revenue) নিম্নলিখিত চিঠি দিয়েছিলেন :

"এই কারণে (ডাকাতির কারণে), বর্ধমানে যে ব্যবস্থা যথাযথভাবে অবলম্বন করা হয়েছে তার মতন করে বিবেচনা করা যায় কিনা দেখার জন্য আমি বিনীতভাবে আপনার কাছে পেশ করছি। আসন্ন বন্দোবস্তে প্রতিটি পরগণায় একটি করে থানা, যার থানাদার সব ডাকাতির জন্য দায়ী থাকবে, স্থাপন হয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। আমি নিশ্চিত যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সুফল সর্বজনীন হবে এবং ব্যয়ও বেশী হবে না — বিগত বন্দোবস্তে যে চাকরান জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে তা-ই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার পক্ষে যথেষ্ট . . . ."।[৬৭]

মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদ (Controlling Council of Revenue) এর উত্তরে লিখেছিলেন ঃ

"প্রতিটি পরগণায় থানা স্থাপনের প্রস্তাবে আমরা এখনই সম্মতি দিতে পারি না। এইরকম প্রতিষ্ঠানের থানাদারেরা আর বেশীমাত্রায় ডাকাতির জন্য দায়ী থাকতে পারবে না, অন্ততপক্ষে সেসবের ক্ষতিপূরণে আরো সক্ষম হবার চেয়ে (তারা নির্ভরশীল হবে সরকারের উপর) সরকার থেকে পাওয়া ভাতা তাদের ক্ষমতা যোগাবে; এবং বর্ধমানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে যে সুফল পাওয়া গিয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি, তার জন্য তাদের কর্তব্য পালনের জন্য থানাদারি চৌকির সর্তকতা বা থানাদারদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের থেকেও থানাদারদের দেওয়া বাট্টা হিসাবে নগদ অর্থ ভাণ্ডারই বেশী দায়ী এবং এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষতিপূরণের জন্য (সরকারের) খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তাই যেহেতু এই পরিকল্পনার ফলে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শেষপর্যন্ত সরকারের ওপর বর্তাবে তাই আমরা এতে সম্মতি দিতে পারি না, এবং আমরা আরো মনে করি যে দিনাজপুরে এখনও পর্যন্ত বহাল থাকা জমির ওপর নির্ভরশীল কর্মচারীদের এমনভাবে বণ্টন ও ব্যবহার করতে হবে যে থানাদারি চৌকির কাছ থেকে প্রাপ্য সকল সুফল পাওয়া যাবে।"[৬৮]

অথচ এর ঠিক একবছর আগে সরকার দিনাজপুরের সুপারভাইজারকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোম্পানীর "আসামীদের" (অর্থ অস্পষ্ট) এবং সেইসঙ্গে রায়তদের "রাত্রে দস্যু ও ডাকাতদের" হাত থেকে রক্ষা করার জন্য থানাদারদের বাধ্য করা হোক।[৬৮(ক)] এখন যদি গ্রামের শান্তিরক্ষার কাজে থানাদারদের উপস্থিতি এতই প্রয়োজনীয় হয় তবে সুপারভাইজারের প্রস্তাবকে মর্যাদা না দেবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কোম্পানীর প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল রাজস্ব, তার আদায় ও প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচের মধ্যদিয়ে তার বৃদ্ধি। কাজেই এ অবস্থায় সরকারী রাজস্বের একটা বড় অংশ ব্যয় হবে বলে কোম্পানীর প্রশাসন প্রচণ্ডভাবেই নতুন থানা স্থাপনের বিরোধী ছিল। একদম শুরু থেকেই সরকার দেশের পুলিশী প্রশাসনের ব্যয় কমাবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এর বড় উদাহরণ পাওয়া যায় বর্ধমানের ক্ষেত্রে। সেখানে রাজা জেলার শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁর অধীনে থানাদারেরা বেতন হিসাবে জমি পেতেন। আর রাজা তাদের কাছ থেকে বার্ষিক ৫,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় করতেন। এই রাজস্বই আবার শেষপর্যন্ত কৃষকদের ওপর চেপে তাদের প্রচণ্ড দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াত কারণ থানাদাররা তাদের দেয় রাজস্ব আদায় করে নিতে কৃষকদের থেকে। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর অনুরোধে

এই রাজস্ব উঠে গিয়েছিল। অন্যদিকে রাজা তাঁর নগদীন প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয় বার্ষিক ১,০৩,৩৬০ টাকা তাঁর প্রদেয় রাজস্ব থেকে ছাড় পেয়েছিলেন। ১৭৮৭-র জুন মাসে কোম্পানী রাজার এই ১,০৩,৩৬০ টাকার ভাতা ৫০,০০০ টাকায় কমিয়ে এনেছিল এবং এটা সমগ্র জেলা জুড়ে পাইক চৌকিদার বাহিনী পোষণের পক্ষে যথেষ্ট বলেই বিবেচিত হয়েছিল।[৬৮(খ)] এইভাবে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সরকার বর্ধমান জমিদারি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল আর তা করতে গিয়ে সরকার রাজার তহবিলে এমনই প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল যাতে করে নিজের জেলা রক্ষার জন্য ব্যয়ের সামর্থ তাঁর ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। একইভাবে ১৭৯৩-এ যখন তমলুকের ব্যবসায়ী ও মুদিদের কাছ থেকে[৬৯] পুলিশী কর[৬৮-গ] আদায় করা হচ্ছিল তখন সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের (Governor General-in-Council) নির্দেশে[৭০] সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট দুটো থানা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৭১] তিনি অবশ্য কর্তৃপক্ষের ব্যয় সঙ্কোচন নীতি স্থগিত রাখার জন্য তাঁদের কাছে আবেদন করেছিলেন :

"দারোগা, বরকন্দাজদের বেতন কমানো উচিত নয়, এখন তাদের বেতন বা ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আশা করা যায় যে তারা আর তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় আসা মানুষদের অসৎকারণে উত্যক্ত করবে না।"[৭২]

১৭৭২ সালে নদীয়ায় ২৭টি থানা ছিল।[৭৩] অথচ ১৭৭৩-এ সেই জেলারই শান্তিরক্ষার জন্য থানা ছিল ২১টি।[৭৪] নদীয়ার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট রাজস্ব দপ্তরকে লিখেছিলেন যে, গভর্ণর জেনারেলের আদেশে সম্মতি দিয়ে তিনি

"থানার সংখ্যা বেশ ভালমাত্রায় হ্রাস করেছেন, যদিও এখনও পর্যন্ত মাসিক ব্যয় তাঁর বিগত ৭ই ডিসেম্বরের আদেশে অনুমোদিত পরিমাণকে ছাড়িয়ে পুলিশী খাতে ৩৬৭ টাকা বাড়বে। তবুও জেলার বিস্তৃতির কথা চিন্তা করে আমি আশা করি মাননীয় মহাশয় অধিকার ক্ষেত্রের সংখ্যাকে (অর্থাৎ থানার সংখ্যাকে) খুব বেশী বলে বিবেচনা করবেন না, বিশেষ করে যেহেতু সম্প্রতি বিভিন্ন পরগণা এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আমি তালিকাভুক্ত শেষ পাঁচটি থানা বজায় রাখাকে আবশ্যক বলে মনে করি কারণ সেগুলি হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত যেখানে জেলার অভ্যন্তর ভাগের থেকে ডাকাতি অনেক বেশী সংখ্যায় হয়ে থাকে।"[৭৫]

উপরের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বরের কোর্টের পত্রে নিহিত থানাদারি বাহিনীর পরিবর্তে ইংরেজ সিপাই নিয়োগ বিষয়ক ইংরেজের মূল পরিকল্পনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা ঘোষণার সময় পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি।[৭৫ক] কোম্পানীর প্রশাসন থানাদারি ব্যবস্থাকে বজায় রেখেছিলেন কিন্তু তাদের সংখ্যা ও আয়তনকে হ্রাস করেছিলেন। এইভাবে মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজার নদীর পশ্চিমে ৪৯ ক্রোশ অর্থাৎ প্রায় ৯৮ মাইল এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মাত্র পাঁচটি থানার ওপর ন্যস্ত ছিল। প্রতিটি থানায় একজন দারোগা, একজন জমাদার, দশজন বরকন্দাজ এবং একজন মোহরার থাকত।[৭৭] ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে দেশের অভ্যন্তরে একটা থানার কাঠামোটা ছিল এইরকম।[৭৮] এ এক মজার ব্যাপার যে বাংলাদেশে ডাকাতিটা যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল তখন কোম্পানীর প্রশাসন কিন্তু আপন আপন এলাকায় কার্যকরী নজরদারির জন্য থানার সংখ্যা কিংবা থানার

কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেন নি। দেওয়ানী লাভের ঠিক পরেই কোম্পানী প্রশাসন চেয়েছিলেন যে, নায়েব-নাজিম হিসাবে মহম্মদ রেজাখান নিজে ডাকাতি সমস্যার দিকে নজর দেবেন। এর অর্থ ছিল এই যে ডাকাতির বিরুদ্ধে লড়াই-এর খরচ নবাবের দপ্তর নিজামতের হিসাবে দেখানো হবে এবং আঞ্চলিক রাজস্বের কোন অংশই এই খাতে ব্যয় করা হবে না। ফলে ইতিমধ্যেই কোম্পানীর কাজে আয় কমে যাওয়ায় দুর্দশাগ্রস্ত নিজামত অতিরিক্ত ব্যয়জনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। পরে ক্রমান্বয়ে পুলিশী প্রশাসন কোম্পানী গ্রহণ করার পর এ ব্যাপারে সে চূড়ান্ত ব্যয় সঙ্কোচনের নীতিকে অনুসরণ করেছিল। ডাকাতি সমস্যার সমাধানে দারোগা, জমাদার, পাইক আর বরকন্দাজ বাহিনী যে যথেষ্ট সক্ষম নয় এ বিষয়ে অন্তত কোম্পানী প্রশাসন সুনিশ্চিত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দুস্কর্মে জড়িত থাকায় থানার এলাকার মধ্যে[৭৯] ডাকাতি হয়েছে এরকম নজির কম নেই। ডাকাতির প্রতিটি ঘটনার জন্য জমিদারদের দায়ী করার চেষ্টা হয়েছিল[৮০] কিন্তু জমিদারদের ক্ষমতা ও সঙ্গতি হ্রাস করে তাঁদের নামসর্বস্ব করে তোলায় সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব কৃষকদের ওপর চাপাবার চেষ্টাও করা হয়েছিল[৮১] কিন্তু তাও কার্যকরী হয়নি। মোগলদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পূর্ণভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শ্রেণীবিন্যাসের সুবিধা ও লাভ উৎসমূলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। থানার কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তা নিয়ে কোন কোন জায়গায় অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছিল।[৮২] মোগলদের অধীনে বক্সী, দারোগা, জমাদার, মোগলদের ঘাটওয়াল, দিগ্‌ওয়ার এবং অসংখ্য পাইক ও বরকন্দাজ মিলে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস গড়ে তুলেছিলো। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এদের নেতৃত্ব দিতেন জমিদার এবং খাসজমিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল ফৌজদারের। এইসব মানুষেরা জমির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং তা থেকেই তাদের অন্নের সংস্থান হোত। আর এইভাবেই তারা গ্রামের স্থায়ী জনসংখ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। দূর থেকে নবাব জমিদারদেব এবং জমিদারেরা তাঁদের লোকজনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন ফলে শাসনকার্য যেমন সুন্দরভাবে চলত তেমনি একইসঙ্গে নিরাপত্তাও বজায় থাকত। এই ব্যবস্থায় উর্ধ্বতন অধস্তনকে যেমন শোষণ করতেন তেমন শোষিত সামাজিক উদ্বৃত্তের (Social Surplus) একটি অংশ তাদের দিয়ে দিতেন, আর তার সঙ্গে দিতেন স্বাধিকার (autonomy)। এই উর্ধ্বতন অধস্তনের কাছ থেকে পেত ট্রিবিউট আর তার বিনিময়ে অধস্তন পেত নিজের অবস্থানের নিশ্চয়তা। এই উভয় তরফের দেওয়া-নেওয়া সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখত।

পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছিল উপযুক্ত বিচারবিভাগ যা গ্রাম এবং জেলান্তরে ফৌজদারী অপরাধের বিচার করত এবং স্বল্পব্যয়ে বিচারকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিত।[৮৩] কোম্পানীর শাসনে এইসব সংস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলেছিল। ভীষণভাবে তারা বঞ্চনাবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আর এর থেকেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা। ডাকাতিটা ছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এই গণসংগ্রামের একটা রূপমাত্র। বঞ্চনার থেকে উত্থিত যন্ত্রণার জঠরে জন্ম নেওয়া জিঘাংসার সামাজিকে রূপই হল ডাকাতি।

(৬) ইংরেজের প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস

কোম্পানীর ছাঁটাই এবং দখলনীতির ফলে দেশের অভ্যন্তরস্থিত মানুষজনের ওপর কেমন প্রভাব পড়েছিল তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি। এখন আমরা দেখব ইংরেজের আর্থিক নীতি বা প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ পদ্ধতি, যা দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগকে ভীষণভাবেই নষ্ট করেছিল, তা তাদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল। দেশের বিপুলসংখ্যক জনগণ মূলত কোম্পানীর বিভিন্ন প্রধান (Chiefs) ও কালেক্টরদের' সংস্থায় কাজ করত। ইংরেজের সরকারী নথিতে এদের বলা হোত আমলা। ১৭৮৬-র এক রিপোর্টে আমলাদের জন্য ব্যয় সংকোচন প্রস্তাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর সেই ব্যয় সংকোচনের হিসাব জানা যায় নীচের সারণি থেকে ঃ

জেলার নাম	আমলাদের জন্য বর্তমান ব্যয়	আমলাদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়
পূর্ণিয়া	৪০৫	৪০০
নদীয়া	১,৩৫৭	৪০০
২৪ পরগণা	৭৯২	৪০০
কলকাতা শহর	৪০৬	৪০০
রাজশাহী	৪৩৯	৪০০
হুগলী	৪৫৩	৪০০
মুর্শিদাবাদ	৬৮৫	৪০০
ঢাকা	৬৮৯	৪০০
মেদিনীপুর	৪৩৯	৪০০
রঙপুর	৪৫০	৪০০
শ্রীহট্ট	৫২৩	৪০০
মোট	৬,৬৩৮	৪,৪০০

(বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, দিনাজপুর, ঘোড়াঘাট, লস্করপুর, যশোহর, ময়মনসিংহ,

৪০০ টাকা।)

(সূত্রঃ Statement of the Establishments of the Present Chiefs and Collectors, with proposed Encrease and Decrease therein : Prodgs. BOR. 12 June, 1780)

এইভাবে কোম্পানীর সংস্থাগুলো থেকে দেশীয় আমলাদের ছাঁটাই-এর মাধ্যমে কোম্পানীর মাসিক ২,০৩৮ টাকা বা বার্ষিক ২৪,৪৫৬ টাকা বাঁচিয়েছিল। এটা উল্লেখ করা দরকার যে, যে বছর বহরবন্দের অর্থ লুঠ হয়েছিল সেই বছরেই ইংরেজের সংস্থাগুলোতে আমলা সংখ্যাহ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এর মাত্র চার বছর পরে ঐ একই জায়গার অর্থ আবার লুঠ হয়েছিল।[illegible] দেশীয় মানুষদের ক্ষেত্রে একবছরের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস নিশ্চয়ই

এমনকিছু বড় ঘটনা ছিল না যা এই ধরণের গণ হিংসাত্মক কাজে প্ররোচনা জোগাতে পারে। আসলে বহু বছর আগে থেকেই মানুষের মনে হতাশা জমে উঠেছিল। ১৭৭২-এর কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করলে এবং সেই খাতের ব্যয়কে ১৭৮৬-র ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করলে কোম্পানীর শাসনের প্রতি মানুষের কেন যে এত ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কিত একটা পরিষ্কার চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। ১৭৭১-৭২-এ ঢাকায় হুজুরী দপ্তর আর নিজামত দপ্তর নামে দু'টো বড় দপ্তর ছিল। হুজুরী দপ্তরের অধীনে ছিল ছ'টা দপ্তর ঃ (ক) দেওয়ানী কাছারি, (খ) তহশীল কাছারি, (গ) আদালত কাছারি, (ঘ) মুস্তাফি কাছারি, (ঙ) সুপারভাইজারের দপ্তর, (চ) সাধারণ কর্মসংস্থান এবং মুর্শিদাবাদে নানা আধিকারিকের কাজে নিযুক্ত অফিসাবদের দপ্তর।[৮৫] এইসব দপ্তরগুলো ছিল ঢাকা ডিভিশনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ[৮৬]

দেওয়ানী কাছারি	৩৮
তহশীল কাছারি	১০
আদালত কাছারি	৬
মুস্তাফি কাছারি	১০
সুপারভাইজারের দপ্তর	৬
মুর্শিদাবাদের আধিকারিকের কাজে নিযুক্ত অফিসার	৮
সাধারণ নিয়োগ	৪১
	১১৯

১৭৮৬-তে ঢাকার প্রধান (Chief) ও কালেক্টরের সংস্থার মধ্যে এইসব দপ্তরগুলো ছিল না।[৮৯] আসলে এইসব দপ্তরগুলো হয় উঠে গিয়েছিল আর না হয় তাদের আকার এতই ছোট করে ফেলা হয়েছিল যে ১৭৮৬-তে প্রধান (Chief) বা কালেক্টরদের সংস্থাগুলোর বর্ণনায় এদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। পরিবর্তে দেশীয় আমলাদের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪০০ টাকা অথচ ১৭৭২-এ দেওয়ানী কাছারির জন্য মাসে ব্যয় হোত ৫,৬৪৪ টাকা।[৯০] সরকারী ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যয় সংকোচনের একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সমাজ জীবনের ওপরও নিশ্চিতভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রথমত, এটা পুরানো অভিজাততন্ত্রকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ১৭৭২-এ দেওয়ানী কাছারির দেওয়ান রাজা হিম্মত সিংহ মাসে ৪,০০০ টাকা বেতন পেতেন।[৯১] কিন্তু কোম্পানীর শাসনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের পদগুলো ক্রমান্বয়ে উঠে গিয়েছিল। শহরের আর শহরের বাইরে অসংখ্য অধস্তন দেওয়ান ছিলেন। এইসব দেওয়ানদের অধীনে ছিলেন নায়েব-দেওয়ান, পেশকার, সেরেস্তাদার, মুহুরী, দারোগা, বক্সী, খাজাঞ্চি এবং অন্যান্য কর্মচারীরা। ১৭৭২-এ ঢাকার দেওয়ানী

কাছারির নায়েব-দেওয়ান মাসে ৫০০ টাকা, পেশকার ১২০ টাকা, নায়েব ২০০ টাকা, সেরেস্তাদাব ২০০ টাকা বেতন পেতেন।[৬২] এইসব মানুষদের শুধু যে পদমর্যাদাই ছিল তা নয় বরং ব্যক্তিগত গৃহস্থালির এবং তৎসংক্রান্ত প্রশাসনের কাজে কিংবা তাঁদের সরকারী কাজে লোকজনকে নিয়োগ করার সামর্থ্যও তাঁদের ছিল। তাই যখন তাঁদের কাজ চলে গেল বা আয় কমল তখন তাঁদের মানুষকে কাজ দেবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেল। মোগল আমলে পদমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষেরই কাজ দেবার ক্ষমতা ছিল। সেই সময়ে পদবিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছিল যে, প্রতিটি পদাধিকারীই তাঁদের চতুর্পার্শ্বের বহুসংখ্যক মানুষকে কাজ দিতে পারতেন। এইসব মানুষেরা যে সবসময়ই প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিলেন এমন নয়। আসলে মোগলদের রাজস্ব, বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থা ভীষণরকম জটিল ছিল এবং প্রতিটি পদক্ষেপে উপযুক্ত ব্যক্তির কাজের দরকার পড়ত।[৬৩] অধস্তন কর্মচারীদের যেমন আপন কাজের জন্য তাঁদের প্রভুদের ওপর নির্ভর করতে হোত, তেমনি প্রভুদেরও তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের অধস্তন কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করতে হোত। এটা ছিল শ্রেণীগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ব্যবস্থা। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি জমিদারিরই ছিল বহুস্তরীয় প্রশাসন।[৬৪] শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণীর মানুষেরই ছিল অপরিহার্য ভূমিকা। তাদের এই অপরিহার্যতাই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধের বাঁধনে বেঁধে রাখত যাতে করে একটা পরিপূর্ণ সুসংবদ্ধ ব্যবস্থায় একটা শ্রেণী অন্যশ্রেণীকে সংযত রাখত এবং একটা শ্রেণীর অতিরিক্ত উন্নতি ও অধিকার চেতনা এবং লাভের আশা অন্য শ্রেণীর অনুরূপ আশা ও দাবীর সামনে সংযত থাকতে বাধ্য হত। এ সবের ফলে বিক্ষিপ্তভাবে সাধারণ ডাকাতি বা কিছু রাজপথ ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও ডাকাতির আকারে সামাজিক অধিকার দাবীর ঘটনা মোগল শাসিত বাংলায় দেখা যায়নি।

(৭) মোগল পদবিন্যাসব্যবস্থা (Mughal Rank System)

নিজেদের এলাকার প্রতিটি ডাকাতির জন্য জমিদারদের দায়ী করার মোগল ব্যবস্থাই দেখিয়ে দেয় যে, দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শ্রেণীব্যবস্থাকে তাঁরা কত কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। একজন জমিদার, কোতোয়াল,[৬৫] বক্সী, জমাদার, দারোগা, মুহুরী, পিওন, পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল, হরকরা — এরা সকলেই গ্রাম-বাংলার পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর গড়ে তুলেছিল। রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জমিদার থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে নীচের স্তরে দেওয়ান, নায়েব-দেওয়ান, সেরেস্তাদার, খাজাঞ্চী, পেশকার, তহবিলদার, মুহুরী, মুন্সী, পাটওয়ারী, মণ্ডল এবং অন্যান্যদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল আর এক শ্রেণীব্যবস্থা। কি পুলিশ দপ্তরের, কি রাজস্ব দপ্তরের এইসব অফিসারদের বেশীরভাগই জমিদারদের কাছ থেকে নিষ্কর জমি পেতেন। অন্যদিকে এইসব অফিসারেরাও আবার জমিদারকে তাঁর বিচার কার্যে, বিশেষ করে গ্রামের জাতি কাছারির (Caste Cutchery) প্রধান হিসাবে কার্য সম্পাদনে সাহায্য করতেন। কারিগর ও কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষেরা জমিদারির আমলাদের কাছে সব সময় বাঁধা থাকতেন। কোম্পানীর প্রশাসকেরা যে-কোন প্রয়োজন পড়লেই কুলি, ভারবাহী পশু, মাঝি, ডাকহরকরা, এমন কি জ্বালানি কাঠ, ইঁট, চুন ইত্যাদি ইমারতী জিনিষের জন্যও

জমিদারদের মুখাপেক্ষী হতেন। এ থেকেই গ্রাম বাংলায় জড়িয়ে থাকা জীবন কর্মসূত্রে যে পরস্পর নির্ভরশীল ছিল তার ব্যাখ্যা মেলে। গ্রাম-সমাজের সব মানুষই তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা, জ্ঞান ও তথ্য, সংগঠন ও সামর্থ নিয়ে হয় জমিদারদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আর না হয় শ্রেণী কাঠামোর যে-কোন স্তরে এক বা একাধিক মানুষের প্রভাবাধীন থাকতেন। কাজেই সময়মত রাজস্ব দিলে নবাবী শাসন জমিদারকে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রেখে তাঁকে স্বচ্ছন্দে শান্তির ব্যবস্থাপক হিসাবে গড়ে তুলতেন। নানানভাবে জমিদারদের পঙ্গু করে দেওয়া কোম্পানীর শাসন এই নীতিকে বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব শোষণের নীতিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ১৭৭০-এ মেদিনীপুরের একটা ছোট জমিদারী কুচাঙ দেওয়া হয়েছিল বামনহাটির নায়েব-জমিদারকে যিনি এই মর্মে একটা মুচলেকা দিয়েছিলেন যে, "আমাদের মেদিনীপুর জেলাগুলোর (ঘাটশীলা ইত্যাদি) যে-কোনটিতে অশান্তি ও চুরির জন্য তাঁর পক্ষ থেকে তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।"[৯৬] শুধুমাত্র কুচাঙ থেকেই নয়, তাঁর নিজের জমিদারী বামনহাটি থেকেও বিতাড়িত হবেন এই ভয়েই তিনি এই মুচলেকা দিয়েছিলেন।[৯৭] এর আগে ১৭৬৭-তে ফার্গুসন, যিনি মেদিনীপুরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তিনি ফুলকুসুমের[৯৮] জমিদার সুন্দরনারায়ণের কাছ থেকে তারই এলাকার অন্তর্গত আনন্দপুরে ডাকাতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করেছিলেন। শোনা যায় "ফুলকুসুমের জমিদারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের এমন সুন্দর সুযোগ নষ্ট না করার জন্য ফার্গুসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।"[৯৯] এরই পাশাপাশি চলেছিল স্থানীয় আরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষকদের যুক্ত করার চেষ্টা। ১৭৭২-এ নদীয়ার কৃষকদের যে আমিলনামা[১০০] দেওয়া হয়েছিল তার পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধারায় নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছিল ঃ

"তোমাকে গোপন সম্পদ ও বিধিসম্মত উত্তরাধিকারী নয় এমন ব্যক্তিদের সম্পত্তি যা সরকারের দ্বারা বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং সেইসঙ্গে সম্ভাব্য হত্যা, চুরি, আর ডাকাতি সম্বন্ধে তথ্য অবিলম্বে জানাতে হবে।

চৌকি এবং প্রত্যেকটি ডিভিশন ও সাব-ডিভিশনের সীমানা সম্পর্কে তোমাকে সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল বিষয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে সময়মত জানাতে হবে।"[১০১]

১৭৭৭-এ জমির ঠিকাদারদের (farmers) যে কবুলিয়ৎ[১০২] দেওয়া হয়েছিল তাতে আরো বেশী স্পষ্ট করে এইসব নির্দেশের উল্লেখ ছিল ঃ

"আমার চৌহদ্দীর মধ্যেকার রাজপথের প্রহরা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সতর্ক থাকব যাতে করে পথিক ও যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবে স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদে। কোন চোর বা ডাকাতদের আমি আশ্রয় দেব না। আর কোন ব্যক্তির সম্পদ চুরি গেলে কিংবা ডাকাতি হলে আমি সম্পদসহ চোর ও ডাকাতদের খুঁজে বার করব না হলে আমি মালিককে তার (হৃত) সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার এবং ঐসব দোষী ব্যক্তিদের সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য দায়ী থাকব"।[১০৩]

এগুলো ছিল ঠিকাদারদের নিয়ন্ত্রণে জমি ও তাব রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেবাব জন্য সম্পাদিত চুক্তির শর্ত। পুরুষানুক্রমিক অধিকারপ্রাপ্ত জমিদারদের ক্ষেত্রে ডাকাতদের খুঁজে বার করার দায়-দায়িত্ব এমন একটা রীতিতে পরিণত হয়েছিল যেটা আবার অন্য কতকগুলো বিষয়ের ওপর অর্থাৎ সরকারের দেওয়া কিছু সুবিধা ও ছাড়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জমিদারদের যখন ক্রমেই বেশী করে এইসব সুবিধাগুলো ছেড়ে দিতে হয়েছিল তখন জমিদারদের কাছেও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনটা অপ্রয়োজনীয় আর অন্যায্য বলেই মনে হয়েছিল। অথচ এ ব্যাপারে সরকার অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসেছিল। ১৭৯০ সালে বর্ধমানের রাজা বীরভূম কোষাগার থেকে কলকাতায় পাঠানো ৩০,০০০ টাকার অর্ধেক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১০৪] মনিরামপুর থানায় এই অর্থ ডাকাতেরা লুঠ করেছিল। রাজার রক্ষীবাহিনী লুঠ হওয়া অর্থের কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। "রাজা অভিযোগ করেছিলেন যে অর্থ পাঠানোর কোন সংবাদ তিনি পাননি ফলে যা তিনি সাধারণভাবে করে থাকেন, দায়ী পরগণার ওপর জরিমানা ধার্য করে তার দেয় অর্থ তিনি দিতে পারেন নি।"[১০৫] এর দু'বছব আগে বর্ধমানের দুটি পরগণা সেনপাহাড়ী ও শেরগড় ডাকাতদের আখড়া হয়ে উঠেছিল যাবা ডাকাত সর্দার জীবনার নেতৃত্বে ইংরেজদের ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। যখন কোম্পানী কুঠির সিপাইরা লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তখন রাজার সিপাইরা তাদের যথাযথ সাহায্য কবেনি। এর ফলে রাজা ও কোম্পানীর মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত এ সময় বর্ধমানে কোম্পানীর কোন বাহিনীই ছিল না। সরকারী তহবিল রক্ষার জন্য রাজার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কালেক্টর কিনলক (Kinloch)-এর অধীনে এক'শ সিপাই-এর একটা বাহিনী ছিল।[১০৬] এর জন্য মাসে ব্যয় হোত ৬১৯ টাকা।[১০৭] ১৭৮৮-র সেপ্টেম্বরে কিনলকের মৃত্যুর পর সরকার আদেশ দেন যে, এইসব সিপাইদের জন্য মাসিক ব্যয় পাইকদের জন্য রাজাকে দেয় ভাতা থেকে বহন করতে হবে। এইভাবে রাজার উপর নিদারুণ আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাঁকে ক্রমশ নিঃস্ব হওয়ার পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। আসলে নতুন কালেক্টর ব্রুকই এই ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আর সরকারও তা গ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়ে হার্স্ট মন্তব্য করেছেন ঃ

"সমস্যার এই সরল সমাধানের বার্তাটুকু বোর্ডের কাছে ধরা পড়েছিল, কিন্তু রাজার কাছে ধরা পড়েনি। রাজা লক্ষ্য করেছিলেন যে কিনলকের মৃত্যুর পর দু'মাস ধরে তাঁর নিজস্ব কর্মচারীদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর (সৈন্যবাহিনীর) বেতন দানের ব্যবস্থা করাটাও তাঁর নিকট প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যাই হোক তাঁর প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়েছে এবং কোম্পানীর রক্ষীদের বেতন দেবার প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর পাইকের সংখ্যা কমাতে হয়েছে।"[১০৮]

১৭৮৮-তে বর্ধমানের পরিস্থিতিটা ছিল খুবই সরল। কোম্পানীর রাজস্ব-রক্ষার জন্য রাজার খরচে কোম্পানী একশ জন সিপাই-এর একটা বাহিনী রেখেছিল। এ সত্ত্বেও ১৭৯০-এ যখন কোম্পানীর অর্থ বীরভূম থেকে কলকাতায় যাওয়ার পথে বর্ধমানে লুঠ হয়েছিল তখন রাজাকে

তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। আর এসব ঘটেছিল এমনই একটা সময়ে যখন বর্ধমানের রাজার সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হচ্ছিল। ১৭৮৯-এর জুনে মঙ্গলঘাট পরগণা বিক্রি হয়ে গেল। তাঁর (রাজার) জমিদারি ভেঙ্গে পড়ার প্রথম ঘটনা ছিল এটাই।[১০৯] পরের বছর মে মাসে আরো দুটো পরগণা আজমতশাহী ও মোজফরশাহী, বিক্রির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।[১১০] ১৭৮৯-এর মে মাসে রাজা সরকারকে লিখেছিলেন যে, বন্যা ও খরা তাঁর দেশকে এমনভাবে শেষ করে ফেলেছে যে তিনি "জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে এবং তাঁর পরিচ্ছদ ও গৃহস্থালির আসবাবপত্র বন্ধক দিয়ে টাকা নিতে বাধ্য হয়েছেন।"[১১১] এ সবের বিশেষ কোন প্রভাব সরকারের ওপর পড়েনি। জমিদারির আয়তন, তার শক্তি, তার কর্মচারীর সংখ্যা এবং রাজস্ব সংকোচন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তাতে করে জমিদারির অভ্যন্তরীণ শান্তি আগের মতনই বজায় থাকবে এমন আশা করাটাই ছিল ভুল। বর্ধমানের রাজা কুপরামর্শদাতাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছেন — এই বিশ্বাসকেই সরকার ধরে রেখেছিল আর ১৭৮৯-এর মার্চ মাসে সরকার রাজার অন্যতম প্রধান ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা দয়ালচাঁদকে জেলা ছেড়ে চলে যাবার এবং গভর্ণর জেনারেলের সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া ফিরে না আসার আদেশ দিয়েছিলেন।[১১২] বাংলার সবথেকে বড় ও বিখ্যাত জমিদারিগুলোর মধ্যে এটা নিশ্চিত যে অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে আপন মানুষজনকে সমবেত করার একটা প্রবণতা জমিদারদের মধ্যে সঠিকভাবেই গড়ে উঠেছিল।আঠারো শতকে নানান ধরনের সামাজিক অস্থিরতার একটা রূপ ছিল কোম্পানীর শাসনে ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত মানুষজনের যূথবদ্ধতা। রাষ্ট্রিয় হিংসাকে প্রত্যাঘাত করার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ ও বদ্ধমুষ্ঠি মানুষের এমন সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ যা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় দেখা গিয়েছিল।

এইভাবে যেসব মানুষেরা জোটবদ্ধ হয়েছিল তারা কেউ স্বজাতির দ্বারা পরিত্যক্ত নয়, অন্ধকার জগতের বাসিন্দাও নয়, অকস্মাৎ কোন কারণে আইনের আশ্রয়চ্যুতির সাধারণ দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েও কেউ সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি, বরং তারা ছিল নিছকই সেইসব মানুষ কোম্পানীর প্রশাসন যাদের অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করেছিল, যাদের অভ্যস্ত জীবন থেকে উৎখাত করে ছিন্নমূল মানুষে পরিণত করেছিল। দস্যুতা ইতিহাসে নিশ্চয়ই কোন বাঞ্ছিত ঘটনা নয়। কিন্তু যখন বিদেশী শাসন প্রতিরোধকল্পে জমিদারেরা একটা শ্রেণী হিসাবে সাধারণভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি কিংবা একক বা যৌথভাবে তারা কখনো নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেন নি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যখন বিদ্রোহের আকারে গণ উত্থান স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না এ রকম এক পরিস্থিতিতে সামাজিক উদ্বৃত্তের তলানিটুকু আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে পূর্বতন শাসনের তুলনায় অনেক বেশী নিষ্ঠুর বিদেশী শাসনে যাদের জীবনমূল কেঁপে গিয়েছিল সমাজের সেই বড় অংশের কাছে দস্যুবৃত্তিটাই নিজেদের দাবী উত্থাপনের এক সাধারণ ও সহজসাধ্য উপায় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মোগলবঙ্গের পুরানো সমাজ নবগঠিত ইংরেজ সরকারের চাপে সংকুচিত হয়ে উঠেছিল। নতুন সরকার সেই সমাজের ভিতকে নির্মমভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে মোগলদের

অধীনে শোষণজাত এক আত্মতৃপ্ত শ্রমজীবী মানুষ ও সরকারের মাঝে স্থায়ীভাবে অবস্থানরত মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রেখেছিল। কোম্পানীর প্রশাসন কিন্তু এদেরকে সরকারের সঙ্গে বিপরীত সম্পর্কযুক্ত পরজীবী শ্রেণী হিসাবে গণ্য করত এবং তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করত। অথচ এই মধ্যস্বত্বভোগীরাই স্থায়ীভাবে ও বিপুল সংখ্যায় ছড়িয়ে থাকা নিরীহ নিপীড়িত মানুষের শ্রমের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন-নির্বিকার ছিল বাংলার গ্রাম-সমাজ। বহু আলোচিত এই সমাজ ছিল শেষপর্যন্ত আবেগহীন, একান্তে অবস্থানরত, নিজের মধ্যে নিজেই নিমগ্ন, বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে অনুদ্বিগ্ন। এই চিরস্থির গ্রাম-সমাজের অন্তর্লীন বন্ধনে জড়িয়ে ছিল বনিয়াদি পর্যায়ের উৎপাদক মানুষ কৃষক আর মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার। এই দুইয়ের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা কোম্পানীর শাসকরা বুঝতে পারত না। শোষক হয়ে গ্রাম-সমাজের নেতৃত্বে থাকা এই দুর্দান্ত মধ্য যেমন নীচের মানুষকে শোষণ করত তেমনি শোষণ করত ওপরের রাষ্ট্রকে, উচ্চতর শ্রেণীকে, সরকারকে। যথাযথ রাজস্ব দিয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে দূরে সরিয়ে রাখা, রাজস্ব বা সমাজ উদ্বৃত্তে ভাগ বসানোর অধিকার আদায় করা, গ্রাম-সমাজের ক্ষুদ্র পরিসরে নিজের ক্ষমতা ও স্বাধিকারকে (autonomy) বাঁচিয়ে রাখা, গ্রাম পর্যায়ের পুলিশ ও বিচারের মাধ্যমে বিবাদের মীমাংসা ও কৃষককে উৎপীড়নেব ক্ষমতা অটুট রাখা — এ সবই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রকে শোষণ করার নামান্তর মাত্র। এইভাবে একাধারে ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা ও সম্পদের সংবক্ষণ ও প্রয়োগের জন্য সমালোচিত হয়েও মোগলবঙ্গের সুবিধাপ্রাপ্ত জমিদার শাসিত গ্রাম-সমাজ একটা অখণ্ড সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে কোন জমিদার যদি পীড়নকারীর ভূমিকা নিতেন তবে তিনিই আবার সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। একজন দেওয়ান কিংবা নায়েব, একজন থানাদার বা দারোগা যদি জমিদারের প্রবল প্রতাপকে কৃষকদের দ্বারপ্রান্তে হাজির করত তবে একইভাবে তারাই আবার জমিদারদের স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে ঐসব কৃষকদের রক্ষা করত। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগণার জমিদারদের কিংবা সারা প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য জমিদারদের আমলা এবং অন্যান্য চাকরান কর্মচারীদের কোম্পানী যখন উচ্ছেদ করেছিল তখন তার পিছনে জনসাধারণের মঙ্গলচিন্তা কাজ করেনি। রাজস্বের প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছিল।[১১৩] কোম্পানীর শাসনের এই সীমিত লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধই বাংলাদেশে ডাকাতির আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কৃষকদের গ্রাম্য-বলিষ্ঠতা, আমলাদের পরিকল্পনা করার বুদ্ধি, পাইক ও বরকন্দাজদের সামরিক দক্ষতা আর তারই সঙ্গে জমিদারদের নেতৃত্ব সব মিলে প্রাণহীন সামাজিক পরিবেশে বাঁচার অধিকারের জন্য এক উগ্র মনোভাবকে নিশ্চিতভাবেই গড়ে তুলেছিল। সাধারণভাবে লণ্ঠনের ফসল যে ডাকাতদের উৎসাহিত করত না তা নয় তবুও এসব কিছুরই ওপরে ছিল শক্তিমান আর দলিত সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর অবৈধ সরকারী হস্তক্ষেপকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছা। ১৭৮৬ ও ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর আনুকূল্যপ্রাপ্ত, লোকনাথ নন্দীর পাঠানো বহরবন্ধ অর্থ লুঠ, বর্ধমানে বীরভূমের অর্থ লুঠ, বাখরগঞ্জ ও যোগীগোপায় ইংরেজ হত্যা, শ্রীহট্টের থানাদারের, বর্ধমান ও দিনাজপুরের বড়

বড় আমলাদের কোম্পানী বিরোধী কার্যকলাপ, কোম্পানীর কাজ ছেড়ে তেলেঙ্গাদের জমিদারদের কাছে পালিয়ে যাওয়া, জমিদারদের ইংরেজ বিরোধী কাজের সঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের যোগ দেওয়া (যেমন কুচবিহারে ঘটেছিল) জমিদারদের ইংরেজ-বিরোধী সংগঠন, ডাকাত ধরার কাজে কোম্পানীকে সাহায্য করতে জমিদারদের পাইকদের অস্বীকৃতি, কোম্পানীর সম্পদ লুণ্ঠনকারী ডাকাতদের এক কাজীর আশ্রয় দান, জমিদারির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত কোম্পানীর লোকজনের বিরুদ্ধে একজন জমিদারের ডাকাতদের কাজে লাগানো, দেশের অভ্যন্তরে দুঃসাহসিক ডাকাতির উদ্দেশ্যে কৃষক, চুয়াড়, সন্ন্যাসী, নায়েব, চৌধুরীদের জোটবাঁধা, সরকারের অবৈধ দখলদারীর বিরুদ্ধে বাংলার এক জমিদার পরিবারকে রক্ষার কাজে সন্ন্যাসীদের যোগদান — এসবই ছিল বাংলার অভ্যন্তরে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন যাকে নিছকই বিচ্ছিন্ন কোন আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন, অন্ধকার জগতের বাসিন্দাগণ কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সমাজজীবনের ওপর আক্রমণের ঘটনা এবং সরকারের নিয়ম-নীতির অপনোদনের সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। যে-কোন পর্যায় হোক না কেন এইসব ডাকাতিগুলো ছিল নিশ্চিতভাবেই এক বিদেশী শাসনের নির্মম স্পর্শে জেগে ওঠা জ্বলন্ত কোন জীবনবোধ এবং সেই বোধ-তাড়িত একটা সমাজের উগ্র আত্মাধিকার জাহিরের প্রয়াস। এই উগ্র আত্ম-জাহিরের প্রয়াস থেকেই জন্ম হয়েছিল উদ্বেগ ও কর্মতৎপরতা। সমসাময়িক ইংরেজের নথিতে শাসিতের কর্মকাণ্ডে শাসকের মনে গড়ে ওঠা যে উদ্বেগের চিত্র ফুটে উঠেছে তারই ফলে শেষপর্যন্ত ডাকাতি-সমস্যা বিচারের প্রকৃত প্রেক্ষাপট উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। কিন্তু যখনই ইংরাজদের নিজেদের কথিত কাহিনীর পক্ষপাতিত্বকে ঝেড়ে ফেলে প্রকৃত তথ্যকে উদ্ধার করা গিয়েছে তখনই সুপ্রাচীন কৃষিজগতের আলোড়নের সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে। মৌলিক প্রজাস্বত্বকে উচ্ছেদ করতে উদ্যত সরকারী আক্রমণের মুখে বাংলার সনাতন অপাপবিদ্ধ কৃষকসমাজকে আত্মাধিকার জাহিরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে দেখা গেছে। ঠিক তখনই রাষ্ট্রিক শোষণের মুখে কৃষকরা আত্মরক্ষার প্রয়াসী হয়েছে। কোন একটি গোষ্ঠীর অধিকার দাবী কিংবা বিদ্রোহ নিশ্চয়ই ইতিহাসের কোন বিরল ঘটনা নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দশকগুলোয় বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণীতে ডাকাতিও ছিল এ রকমই এক ঐতিহাসিক উদাহরণ অবিরল দীর্ঘস্থায়ী একটি প্রতিরোধের ঘটনা।

পাঠটীকা

(১) সি. পি. সি. (Calendar of Persian Correspondeuce) ১, নং ২৭৭৬।

(২) ১৭৭০-এর ৩রা ডিসেম্বর একাধারে নায়েব-দেওয়ান ও নায়েব নাজিম মহঃ রেজা খান দিওয়ানি ও নিজামতের অধিকার ক্ষেত্র সম্পর্কে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে দেশকে দস্যুমুক্ত রাখাটা নিজামতের কাজের মধ্যে পড়ে। — আব্দুল মাজেদ খানের ***The Transition in Bengal,*** পৃঃ ২৬৬ দ্রষ্টব্য।

(৩) একই গ্রন্থ।

(৪) Prodgs. C.C.R. (Vol. I). 1 April, 1771। এখানে মহঃ রেজা খান নিজামত ও দিওয়ানির কাজ সম্পর্কে আর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

(৫) ***Indian Economic and Social History Review*** *(Vol. VI. 1969, No. 8)* গর্ডন সন্ন্যাসীদের "স্বভাবগত ভবঘুরে" ("all habitually travelling groups") বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে ডি. এইচ. এ. কফ মন্তব্য করেছেন ("Sannyasi Trader — Soldiers" ***Indian Economic and Social History Review***. Vol. VII. No. 2, June 1971) :

"এখন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহু মানুষকেই তা তারা পেশাদার তীর্থযাত্রী, দূরযাত্রী বণিক, ভাড়াটে সৈনিক কিংবা যে-কোন কারণে জোটবদ্ধ 'ঠগ' যাই হোক না কেন। সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট গড়ে উঠেছে এমন একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাতি আনুগত্য বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাদের সদস্য করার পদ্ধতিগুলো বিশেষের বদলে নির্বিশেষ ধরনেরই ছিল বেশী। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছেড়ে (সাময়িকভাবে বা বরাবরের জন্য), এইসব গোষ্ঠীগুলো দেবতাদের কাছে, বিশেষ করে শিব এবং তাঁর সঙ্গী অন্যান্যদের কাছে বিশেষ নিরাপত্তা প্রার্থনা করত এবং তা পেত।"

এইভাবে কফ (Kolff) সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত জীবন থেকে সরে থাকা পরিত্যক্ত সম্প্রদায় হিসাবে দেখেছেন — তাঁর এই ধারণার সঙ্গে হেস্টিংসের ধারণার প্রচণ্ড রকমের মিল আছে যা বিপজ্জনক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দিনাজপুর থেকে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব পরিষদকে পাঠানো পত্রে (১লা মার্চ, ১৭৭২ খ্রীঃ) উইলিয়ম ম্যারিয়ট "দেশময় ছড়িয়ে থাকা আইন অমান্যকারী ফকির, ডাকাত এবং অন্যান্য অরাজক লোকজনের দ্বারা বারবার লুণ্ঠিত হওয়া" মানুষদের কথা বলেছেন (Prodgs. of C.C.R. at Murshidabad (Vol. IX), 5th March, 1772)। রেজা খান মোগল আমলে 'আনাগোনাকারী মানুষদের' ("comers and goers") রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ প্রশাসকেরা রাষ্ট্রবিরোধী আইন-অমান্যকারী মানুষজনের দেশময় ঘুরে বেড়ানোর কথা বর্ণনা করেছেন।

(৬) রাজস্ব দপ্তরের সেক্রেটারি জি. এইচ. বার্লোকে তমলুকের ম্যাজিস্ট্রেট, ৭ই এপ্রিল, ১৭৯১, Rev. (Jud). Prodgs. 8 April, 1791।

(৭) লঙ, ***Selections*** নং ৯৫৪। এইসব জমিগুলোকে বলা হোত থানাজোত জমি এবং এগুলোর দখলদারি ছিল নিম্নরূপ :

	বিঘা	কাঠা	ছটাক
(ক) বর্ধমানে সড়ক রক্ষার জন্য সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে থাকা থানাদারদের দখলে ছিল	৪৪,৮৪৫	১৪	০
(খ) বর্ধমান কোতওয়ালি বিভাগের দখলে ছিল	২,৬৮৯	৫	০
(গ) রাজার দরবারের নির্দেশে সড়কপথে পথিকদের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন রক্ষীদের দখলে ছিল	১,৪২৩	৮	০
মোট	৪৮,৯৫৮	৭	০

(লঙ *Selections*, নং ৯৫৪)

(৮) লঙ, *Selections*. ৯৫৪।

(৯) বাংলাদেশে দু'ধরনের আবওয়াব ছিল — এক ধরনের আবওয়াব ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য করা এবং একে বলা হোত সুবাদারি আবওয়াব আর অন্য আবওয়াবটি ছিল জমিদারের ধার্য করা, তাকে বলা হত জমিদারি আবওয়াব। বহু ধরনের অতিরিক্ত শুল্ক, যেমন নজরানা, সেলামী, সেয়ার, ঘাট, ঘাটচালন্তা, হালদারি, মাথুত প্রভৃতি জমিদারি আবওয়াবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুবাদারি আবওয়াবের জন্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal,* Vol. II (Dakha University), পৃঃ ৪৩৩-৩৪, রায় এম. এন. গুপ্ত বাহাদুরেব *Land System of Bengal*, পৃঃ ৭৮, আবদুল করিমের *Murshid Quli and His Times*. পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য। শোর তাঁর ১৮ই জুন, ১৭৮৯-এর বিবরণীর (Minute) পরিশিষ্টে ১৭২২ থেকে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রবর্তিত সুবাদারী আবওয়াবের বর্ণনা দিয়েছেন।

(১০) মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে জমিদারেরা নানকর, জলকর, বনকর, ইত্যাদি নামে নিষ্কর জমি ভোগ-দখল করতেন (সরকার সম্পাদিত *History of Bengal*, II. পৃঃ ৪১২)। এছাড়া দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, শিবোত্তর. মহত্তরান ইত্যাদি নামের নিষ্কর জমিও তাঁদের দখলে ছিল। এছাড়াও ছিল আয়মা আর মদদিমাস (মদত-ই-মাস) জমি। রায় এম. এন. গুপ্ত বাহাদুরের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৯৮-১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১১) এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে নিষ্কর ও রাজস্বমুক্ত বা বিন-রাজস্বের জমি এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রাম-সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত এবং ঠিক tribute বা রাষ্ট্রকর্তৃক শোষিত রাজস্ব বা করের মধ্য দিয়ে নিষ্কাশিত সামাজিক উদ্বৃত্তের মতন করে শ্রেণী কাঠামোর সিঁড়ি বেয়ে উপরের স্তরে রাজার দিকে সেই ধারা এগিয়ে যেত না। এর ফলে সরকারের অগোচরে কিংবা তার স্পষ্ট বা নীরব অনুমোদন ছাড়াই গ্রাম-সমাজের কোন কোন স্তরে সম্পদ পুঞ্জীভূত হোত। রাষ্ট্র কর্তৃক জমিদারদের পুলিশী ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অধিগ্রহণের মাধ্যমে মধ্যবর্তী পর্যায়ে আত্মসাতের ঘটনাকে নির্মূল করার ইংরেজের নীতি দেশের অভ্যন্তরের সম্পদের কেন্দ্রগুলোকে ধবংস করে দিয়েছিল।

(১২) N. K. Sinha. *Economic History of Bengal,* Vol. II, পৃঃ ১৫। এটা সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের (G. G. in Council) অভিমত।

(১২ক) অধস্তন জমি ভোগের (Subordinate tenures) গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে পরবর্তী দু'টি ঘটনায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঠিক পরবর্তী পর্বে যখন বাংলার বড় বড় জমিদার পরিবারগুলো (রাজশাহীরাজ, দিনাজপুররাজ, নদীয়ারাজ, বীরভূমরাজ এবং বিষ্ণুপুররাজ) টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল তখন শুধুমাত্র পাটনী ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে বর্ধমানরাজ অক্ষত থেকে গিয়েছিল (অন্য দুটো জমিদার পরিবার—ত্রিপুরা এবং লস্করপুরের পরিবার পতনের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল)। সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন (**The Permanent**

Settlement in Bengal etc. পৃঃ ১৪৩) ঃ "পাটনি অধিকার (পত্তনি ব্যবস্থা) প্রবর্তন করে বর্ধমানের রাজা তাঁর দায-দায়িত্ব সরিযে দিয়েছিলেন পাটনিদারদের (পত্তনিদারদের) ওপর যাদের সঙ্গে তিনি আরেকটা চিরস্থাযী বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন।" এছাড়া ১৮৭৩-এ পাবনায অশান্তির দিনেও ঐ একই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার জমিদারেরা চিরস্থায়ী লীজের আকারে বিপুলসংখ্যক অধস্তন ভোগদখলদার সৃষ্টি করে কৃষক বিদ্রোহের মোকাবিলা করেছিলেন। কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন (***Pubna Disturbances and the Politics of Rent : 1873-1885*, 1974, p. 87**) ঃ "দেওযানি আদালতে প্রজাদেব হযরান করা ছাড়াও ১৮৭৪ খ্রীঃ থেকে জমিদারেরা বিপুল সংখ্যায় লীজ দিয়ে তাদেব (প্রজাদের) চ্যালেঞ্জকে সংযত রাখার চেষ্টা করেছিলেন।" পাবনার ভূমি ব্যবস্থায় পত্তনিদার, দারপত্তনিদাব জোতদার, দারজোতদাররা ছিলেন অসংখ্য অধস্তন স্তরেব স্বত্বভোগী। শ্রী সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ "১৮৭৩-এর আগে থেকে পাবনায় লীজ দেওয়া হলেও তাদের সংখ্যা . . ১৮৭৪ থেকে হঠাৎই বেড়ে গিয়েছিল . . . . এই ব্যবস্থাব বিবর্তন এটাও প্রমাণ করেছে যে, জমিদাবদের এক বৃহদাংশ কৃষক সমিতিগুলির শক্তিকে বুঝতে পেরেই অশান্ত প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বোঝাপড়ার পরিবর্তে মধ্যস্বত্বের উপভোগ দখলের অধিকারীদেব সঙ্গে কৃষিজাত মুনাফাকে ভাগ করে নেওয়াটাই পছন্দ করতেন।" (সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৮)।

(১৩) আব্দুল মাজেদ খান কর্তৃক উদ্ধৃত ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে মার্চের বেচারের পত্র।

(১৪) LCBR (2 vols. in one), পৃঃ ১১৫।

(১৫) LCBR. পৃঃ ১।

(১৬) রাজস্ব দপ্তরে প্রাপ্ত ১৭৭০ খ্রীঃ নাটোরের সুপারভাইজারের রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদকে লেখা পত্র (মূল নথিতে তারিখ ছিঁড়ে গিয়েছে) ঃ *Letter Copy Book of the Supervisor of Rajshahi at Notore, 3rd Dec. 1769 to 15th Sept. 1772.* (একটিই মাত্র খণ্ড)।

(১৭) W.M. Thackery কর্তৃক ঢাকার কমিটি অফ সার্কিটকে লেখা, Prodgs. of C.C. at Dacca (Vol. IV) ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২।

(১৮) Prodgs. of C.C. at Dacca, ১৮ই নভেম্বর, ১৭৭২।

(১৯) তদেব।

(২০) মুর্শিদাবাদে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে লেখা বীরভূমের সুপারভাইজারের পত্র, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১। Prodgs. Of C.C.R., ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১।

(২১) ২৩শে জানুয়ারী, ১৭৭২-এ যশোরের সুপারভাইজারকে লেখা রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদের পত্র। Prodgs. of C.C.R. (Vol. IX), ২৩শে জানুয়ারী, ১৭৭২।

(২১ক) "২৪ পরগণার জমিদারদের উচ্ছেদ মোগল জমিদারি ব্যবস্থার প্রথম ভাঙ্গনকে সূচিত করেছিল" — ***N.K. Sinha, Economic History of Bengal, Vol. II*** পৃঃ ১১০। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য C.W. Gurner-এর "The Zamindars of the Twenty F‹ ur Pargunnahs", ***Bengal Post and Present,*** Vol. XXXIII, Serial No. 65-66, জানুয়ারী-জুন, ১৯২৭, পৃঃ ৮৫-৯১ দ্রষ্টব্য।

(২২) আবদুল মাজেদ খান — পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৯।

(২৩) কার্টিয়ার রেজা খানকে জানিয়েছিলেন, ১৬ই জুন, ১৭৭০, C.P.C. III, নং ২৫৭।

(২৪) H.J.S. Cotton, ***Memorandum on the Revenue History of Chittagong,*** পৃঃ ৫।

(২৫) তদেব টীকা।

(২৬) ১৭৮৬-র ২৫শে মে Kinloch গভর্ণর জেনারেলকে জানিয়েছিলেন, *B.P.P.* Vol. VI, No. 13, Oct-Dec 1910, পৃঃ ২২৯-এ R.J. Hirst-এর **'The Early Collectorate Records of Burdwan, 1768-1790**-তে পাওয়া যায়।

(২৭) "মোগল শাসকেরা কখনই জমিদারদের তাঁদের জমির তত্ত্বাবধানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন নি। রাজস্ব বকেয়া পড়লে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হোত। এটা নিষ্ফল হলে তাঁর জমি ক্রোক করা, মূল্য নিরূপণ করা এবং তাঁর কোন সম্পদ থাকলে তা থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য শাসকগণ কর্তৃক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পাঠানো হোত। উৎপাদন কম হলে জমিদার ছাড় পেতেন" — N.K. Sinha, ***Economic History of Bengal***, Vol. II, পৃঃ ৪।

(২৮) আলমগীরের নির্দেশে মুর্শিদকুলি খান কিভাবে বাংলাকে রাজস্ব প্রদানকারী অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য ***HB*** পৃঃ ৪১৩, N.K. Sinha-র ***Economic History of Bengal, Vol. II***, পৃঃ ৩, আবদুল করিমের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৪-৯৩ এবং Ranjit Sen, ***Economics of Revenue Maximization, 1757-1793***, Ch. 1 দ্রষ্টব্য।

(২৯) দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মুর্শিদকুলি খান (আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৬) এবং মীরকাশিম আমিলদের নিয়োগ করেছিলেন। শেষোক্ত জন দিনাজপুর অঞ্চলের রাজস্বের সম্ভাব্যতাকে খুঁজে বার করার জন্য রামনাথ ভাদুড়ীকে সেখানকার একজন আমিল হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

(২৯ক) মুর্শিদকুলি খানের আমলে জমিদারেরা নির্মমভাবে অত্যাচারিত হতেন এবং কখনো কখনো তাঁদের ধর্মান্তরিত করা হোত (সরকার, কর্তৃক সালিমুল্লাহর বিবরণ থেকে উদ্ধৃত, ***HB***; Vol II, পৃঃ ৪১০-৪১১ দ্রষ্টব্য।)

(২৯খ) বিশদ বিবরণের জন্য এন. মজুমদারের ***Justice and Police in Bengal*** দ্রষ্টব্য।

(৩০) এই অধ্যায়ের শেষে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

(৩১) বিশেষ শুল্ক থেকে প্রাপ্ত আয় সেয়ার শুল্ক নামে পরিচিত, এর দ্বারা জমিদারদের পুলিশী ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য তহবিল গঠিত হোত। কোম্পানী এইটি বন্ধ করে তাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিল।

(৩২) Prodgs. C.C.R., ১লা এপ্রিল, ১৭৭১।

(৩৩) সামুয়েল লুইসকে লেখা কলকাতা কাউন্সিল-এর পত্র, ১৫ই নভেম্বর, ১৭৭৩।

(৩৪) ভান্সিটার্টকে ফার্গুসন, ২৬শে জানুয়ারী, ১৭৬৮, *Midnapur Dist. Recds.*, পৃঃ ৩৭।

(৩৫) তদেব।

(৩৬) জমিদারেরা কৃষকদের তাকাভি (Taqavi) ঋণ দিতেন। তাকাভি ও পুলবন্দী বা বাঁধ নির্মাণে জমিদারদের অর্থলগ্নী ছাড়া কৃষিকার্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। সরকারী কর হিসাবে মূলধনের একটা অংশ যা, তা সে যত কমই হোকনা কেন, গ্রামের বাইরে চলে যেত তাই আবার এইভাবে গ্রামে ফিরে আসত। গ্রামের আর্থিক ক্ষেত্রে এই অর্থকে ফিরিয়ে এনে তাকে সচল রাখার এবং গ্রাম-সমাজকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিহীন হয়ে যাবার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কর্তা ছিলেন জমিদারেরা। এইভাবে সম্পদ আদায়কারী ও মূলধন প্রদানকারী এই দুই পরস্পর বিবাধী ভূমিকার সমন্বয় ঘটেছিল জমিদারদের মধ্যে।

(৩৭) পি. জে. মার্শাল, ***East Indian Fortunes : The British in Bengal in the Eighteenth Centrury***, Oxford, ১৯৭৬, পৃঃ ৩০।

(৩৮) পি. জে. মার্শাল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১।

(৩৯) লঙ্, ***Selections***, নং ৩৫৮ এই সঙ্গে ফারমিঙ্গারের ***Fifth Report*** দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২৪।

(৪০) তদেব।

(৪১) ফারমিঙ্গারের ***Fifth Report***, পৃঃ ১২৫-১২৬ দ্রষ্টব্য। ফ্রান্সিসকে উদ্ধৃত করে ফারমিঙ্গার দেখাতে চেয়েছেন যে, মীরকাশিমের শাসনটা ছিল "নিয়মিত লুঠতরাজের" ঘটনা।

(৪২) এক সময়ে মীরকাশিম ইংরেজদের লিখেছিলেন ঃ "আমার উদ্দেশ্য হোল পুরনো জমিদারকে ডেকে পাঠানো ও তাঁকে একটা সারপান (Surpan : শিরোপা) দেওয়া এবং জমিদারিতে পুনর্বহাল করে তাঁকে খুশী করা" (Long, ***Selections***, নং ৫০৮)। কোম্পানীকে বর্ধমান সমর্পণের জন্য মীরকাশিম প্রদত্ত সনদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ঃ "তাঁরা (ইংরেজ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী) জমিদার এবং প্রজাদের তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে বহাল রাখবেন ....." (লঙ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নং ৪৮১)।

(৪২ক) জমিদারদের সম্পর্কে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মীরকাশিম নিজেই লিখেছিলেন ঃ "তাঁরা (জমিদারেরা) সকলেই ডাকাত এবং অতর্কিতে আপনাদের আক্রমণ করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছেন" — Long, ***Selections***, নং ৫১৬।

(৪৩) ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ রেজা খানের সঙ্গে নবাবের বৃত্তি হ্রাসের বিষয় উত্থাপন করেছিলেন আর তা করেছিলেন, "নবাবের সঙ্গে নয়, এটা খেয়াল রাখতে হবে, যাকে ক্লাইভ তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন", তাঁর অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে (আবদুল মাজেদ খান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২১)।

(৪৪) দেওয়ানি লাভের ন'দিন আগে ক্লাইভ লিখেছিলেন ঃ "তরুণ নবাবের এত বেশী সিপাই রাখার সামান্যতম প্রয়োজনীয়তাও আমি দেখি না এবং তাদের একটা অংশ যদি হ্রাস করা যায় তবে তাঁর বৃত্তিরও একটা অংশ কমিয়ে দেওয়া যায় . . . " (Forrest, ***Clive***, II, ২৮২)। ১৭৯০-এ নিজামতের মাসিক ব্যয় ছিল ১,২৭,৪৯২—১৫—৫—০ টাকা। এই অঙ্ককে ১৪,৪৪৯—১—৭—০ টাকায় কমিয়ে আনার এবং এইভাবে ১,১৩,০৪৩—১৩—১৮—০ টাকা বাঁচাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল (*C.P.C.* IX, নং ৬০১, পৃঃ ১৪৪)। এইভাবে দেওয়ানি লাভের ঠিক পরে নিজামতের ব্যয়ের যে ক্ষমতা ছিল কোম্পানী তাকে খর্ব করেছিল। তার ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছিল। তারাই নতুন জীবিকার অভাবে ডাকাতিকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিল।

(৪৫) ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভের নির্দেশে রেজা খান নিজামতের সরকারি তহবিলের ১২ লক্ষ টাকা ছাঁটাই-এ সম্মত হয়েছিলেন, ক্লাইভের ধারণানুযায়ী এই অর্থ "অপ্রয়োজনীয় অশ্ব, হস্তী, মহিষ, উট ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হোত "(আব্দুল মাজেদ খান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২১)। ক্লাইভ এবং অন্যান্যরা চিন্তা করেছিলেন যে নবাবের বাহিনী প্রাচ্যদেশীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা — একটা "অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্খলাহীন বাহিনী" (a "useless military rabble") (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)।

(৪৬) আব্দুল মাজেদ খান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২১-১২২।

(৪৭) সিলেক্ট কমিটিকে লেখা গ্রাহামের পত্র, Prodgs. Sel. Com. ১৪ই অক্টোবর, ১৭৬৬।

(৪৮) তদেব।

(৪৯) বীরভূম রিপোর্ট, Prodgs. C.C.R ৩১শে ডিসেম্বর, ১৭৭০।

(৫০) ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবরের ভান্সিটার্টের পত্র। Prodgs. C.C.R. ২৩শে নভেম্বর, ১৭৭০।

(৫১) মুর্শিদাবাদে রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদকে লেখা ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিলের পত্র, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৭৭১, Prodgs. C.C.R., Vol. IX. ৪ঠা জানুয়ারী, ১৭৭২; Prodgs C.C. at Krishnagar, ১০ই জুন, ১৭৭২, একই তারিখের নদীয়ার কালেক্টরের পত্রের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য; *Mid. Dist. Recds*, Vol. III, পৃঃ ৯১।

(৫২) *Rungpore Dist. Recds.*, Vol. II, পৃঃ ১৫৫।

(৫২ক) দিনাজপুরের কালেক্টর জর্জ হ্যাচকে (George Hatch) বোর্ড অফ রেভিনিউ একথা জানিয়েছিলেন, ১৬ই আগস্ট, ১৭৮৭, Dinaj. Dist. Recds.. Vol. I, পৃঃ ৪৭।

(৫২খ) ঐ একই নথিতে পাওয়া যায়।

(৫৩) McNeils. ***Report on the Village Watch***, পৃঃ ৮২।

(৫৪) কোর্টের প্রেরিতপত্র, তাং ২৪শে ডিসেম্বর, ১৭৬৫, ***Fort William Indian House Corresponcence***, Vol. IV.

(৫৫) *Select Comm. Prodgs*, ২৮শে অক্টোবর, ১৭৬৬।

(৫৬) সিলেক্ট কমিটিকে ভেরেলস্ট লিখেছিলেন, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৬, Prodgs. of Sel. Com. ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৬।

(৫৬ক) ভান্সিটার্টকে লিখেছিলেন, ফার্গুসন, ১লা জুলাই, ১৭৬৭, *Mid. Dist. Recds.*, Vol. I, পৃঃ ১৫৯।

(৫৬খ) কোম্পানীকে থ্যাকারে লিখেছিলেন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭২, Prodgs. of C.C., ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২।

(৫৬গ) ১৭৭২ Prodgs. of C.C. ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২।

(৫৬ঘ) ঢাকায় নিয়ন্ত্রক পরিষদকে লিখেছিলেন, কলকাতা কাউন্সিল, ২৭শে অক্টোবর, ১৭৭২, Prodgs. of C.C. at Dacca, ৩রা নভেম্বর ১৭৭২।

(৫৭) Long, Selections, No. 954। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখের সিলেক্ট কমিটির কার্যবিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, 'থানার কর্মচারী' কিংবা 'বিভিন্ন দুর্গ ও সড়কের পাহারাদাররা' কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। সম্ভবত এর অর্থ হোল জেলার অখ্যাত অঞ্চল থেকে থানাগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

(৫৮) ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে কোর্ট তাঁদের চিঠিতে লিখেছিলেন :

"আমরা জানতে চাই কেন (বর্ধমানের রাজার) সৈন্য হ্রাসের আদেশ পালন করা হয়নি এবং কেন (পুলিশ বাহিনীর) এই ব্যয় পুরোপুরি বন্ধ হয়নি আর ঐ অঞ্চল আমাদের নিজস্ব বাহিনীর দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি, এসবের কোন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।" "বর্ধমানে ইংরাজদের সামরিক ব্যবস্থা বাড়িয়ে ২ ব্যাটেলিয়ান সিপাই আনা হয়েছিল কারণ

থানার কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়েছিল। পরিবর্তে বর্ধমানের রাজার মর্যাদা রক্ষা ও তাব অপ্রয়োজনীয় সৈন্য কমানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে দুই কোম্পানী সিপাই দেওয়া হয়েছিল।" Select Comm. Prodgs., ২৮শে অক্টোবর ১৭৬৬। ***Calendar of Records of the Select Committee at Fort William in Bengal,*** কলকাতা, 1915, p. 69 দ্রষ্টব্য।

(৫৯) ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৬০) তদেব।

(৬১) দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা, ব্যধি, যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাহ কর ও বিবাহের ব্যয় ইত্যাদি এমন কিছু কিছু বিষয় ছিল যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। হালদারি ছিল এমন এক শুল্ক যা বিবাহের জন্য দিতে হোত। এছাড়া যাঁরা বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন সেই মুফতি ও কাজীদেরও উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিতে হোত। কখনো কখনো পুরোহিতদের দেয় দানটাও অনেক বড় আকার নিত। বিবাহ-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বহুজনকে আপ্যায়িত করতে হোত বলে প্রায়ই তাঁর পক্ষে বিবাহ করার মতন অর্থ থাকত না।

(৬২) বাংলার নবাবরা দিল্লীতে বার্ষিক যে রাজস্ব পাঠাতেন তা-ই বাংলা থেকে বাৎসরিক স্বর্ণ ও রৌপ্য নিষ্কাশনের আকার নিয়েছিল। এর ফলে প্রায়ই স্বর্ণ ও রৌপ্য দেশে দুর্লভ সামগ্রী হয়ে উঠত এবং সেই কারণে মুদ্রাও তৈরি করা যেত না। বাংলায় মুদ্রা স্থায়ীভাবেই কম ছিল। ***H.B.*** II, পৃঃ ৪১৭। ।

(৬৩) কমিটি অফ সার্কিটকে W.M.Thackeary ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭২; Prodgs. of C.C. at Dacca (Vol. IV), ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২।

(৬৪) ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭১ থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭২ পর্যন্ত শ্রীহট্টে থানাদারের ব্যয়ের হিসাব যা ঢাকার কমিটি অফ সাকিটকে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল টাকা ১২৫৫০-১৪-১৫-২, Prodgs. of C.C. at Dacca ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২-এ তা দেখানো হয়েছে। ১৭৭৮-'৭৯-তে শ্রীহট্টের লাহোর ও বনগঞ্জ থানা দুটির জন্য ব্যয় ছিল মাসিক ৮২৮-৯-৬ টাকা বা বার্ষিক ৯৯৪২-১৫-১৩ টাকা — (MRR 95)। এর অর্থ হোল ১৭৭৮-এ শ্রীহট্টের একটা থানার জন্য গড়ে ৪০০ টাকার ওপর ব্যয় হোত। কিন্তু মেদিনীপুরে একটা থানার জন্য গড় ব্যয় ছিল মাত্র ৩৫ টাকা। আর রঙপুরে সেটা ছিল মাত্র ৩০ টাকা। (৭৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

(৬৫) Prodgs. of C.C. at Dacca, ১০ই অক্টোবর, ১৭৭২।

(৬৬) শ্রীহট্টের কালেক্টরকে ঢাকার Controlling Council Revenue (নিয়ন্ত্রক পরিষদ), ১৯শে অক্টোবর, ১৭৭২। একই নথি।

(৬৭) মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদকে (C.C.R.) ম্যারিয়ট, তারিখ দিনাজপুর, ১লা মার্চ, ১৭৭২। Prodgs. C.C.R. at Murshidabad, ৫ই মার্চ, ১৭৭২।

(৬৮) মারিয়টকে রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদ, ৫ই মার্চ, পূর্বোক্ত নথি।

(৬৮ক) দিনাজপুরের সুপারভাইজারকে লিখেছেন মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদ (Controlling Council of Revenue at Murshidabad) ৭ই মার্চ, ১৭৭১। Prodgs. C.C.R. (Vol. IV), ৭ই মার্চ, ১৭৭১।

(৬৮খ) R.J. Hirst, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৫। ১৭৮১ থেকে ১৭৮৪-র মধ্যে কালেক্টর গুডল্যাডের কর্মকালে (Collectorship of Goodlad) রঙপুরের ফৌজদার ও থানাদারের দেশীয় কর্মচারীরা কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। E.G. Glazier. ***A Report on the District of Rungpore***, পৃঃ ৪৫।

(৬৮গ) তমলুকে চারটি 'শহর, গঞ্জ বা বাজার' — সাহেবগঞ্জ, নারায়ণপুর, মানিকগঞ্জ ও গেয়োখালি — থেকে বছরে ৭৮৭ টাকা আদায় হোত। পুলিশখাতে জমা হওয়া এই কর মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে রাজস্ব দপ্তরের তমলুকের প্রতিনিধি উইলিয়াম ডেন্ট আদায় করতেন, ২৩শে এপ্রিল, ১৭৯৩। Jud. (Criminal) Prodgs. ৩রা মে, ১৭৯৩।

(৬৯) একই নথি।

(৭০) ৫ই এপ্রিল, ১৭৯৩-এর নির্দেশ। ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ কার্যকরী করেছিলেন ১১ই এপ্রিল। একই নথি।

(৭১) দুটি থানা তুলে দেবার পর ম্যাজিস্ট্রেটের নিজের অধীনে মাসিক মোট সিক্কা টাকা ৪১৫ বা বার্ষিক ৪,৯৮০ টাকা ব্যয়ে আরো পাঁচটি থানা ছিল। একই নথি।

(৭২) একই নথি।

(৭৩) Prodgs. of C.C. at Krishnagar and Kasimbajar (Vol. I, II, III, Combined) পৃঃ ১১।

(৭৪) রাজস্ব দপ্তরকে নদীয়ার সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত (Acting) ম্যাজিস্ট্রেট, ২৪শে এপ্রিল, ১৭৯৩। Jud. (Crim). Prodgs. ৩রা মে, ১৭৯৩।

(৭৫) একই নথি।

(৭৫ক) ১৭৭৮-'৭৯-তে বর্ধমানে থানাদার ও পাইকদের খাতে মোট ব্যয় হোত মাসিক ১,৯৯১-৪-৫ টাকা, বার্ষিক ২৩,৮৯৫—৩ টাকা। এ ছাড়া মাসিক ৪৫০ টাকা বা বার্ষিক ৫,৪৭২ টাকা বরকন্দাজদের ভাতা বাবদ ব্যয় হোত। MRR, 95.

(৭৬) এইসব থানাগুলো ছিল ফারোকাবাদ, প্রতাপগঞ্জ, পুলসাহ, নলহাটি এবং দুনগাঁও। প্রথম থানার অধীনে ছিল রোকনপুর পরগণার একাংশ এবং চারটি মৌজা; দ্বিতীয় থানা চাকলা দৌনাপুরের, তৃতীয় থানা রাজশাহীর, চতুর্থ থানা পরগণা ধাওয়ার এবং পঞ্চমটি চারটি পরগণার সমস্তটা, চারটি পরগণার অংশবিশেষ, দুটি মৌজার কিছু অংশ এবং বত্রিশটা মৌজার সম্পূর্ণ অংশ দেখাশুনা করত। Jud. (Crim) Prodgs. ১০ই মে, ১৭৯৩।

(৭৭) একই নথি।

(৭৮) ১৭৭২-এ নদীয়ার একটা থানায় ২ জন জমাদার, তিনজন অশ্বারোহী পুলিশ

৪৪ জন রাজপুত, ৫ জন পাইক এবং একজন বক্সী থাকতেন। মাসে মোট ব্যয় হোত ৪১-১০-১৩-২ টাকা। ৭৩ দ্রষ্টব্য। ১৭৮১-তে মেদিনীপুরের চারটি থানা ছিল নিম্নরূপঃ

থানা জেলাসোব (জালেশ্বর) ঃ	১ জন থানাদার	
থানা জানপুব ঃ	১ জন মোহরার	মাসিক ৩০ টাকা
	১ জন থানাদার	
	২ জন মোহরার	
	১ জন জমাদার	মাসিক ৪৭ টাকা
	১ জন পোদ্দার	
থানা বলরামপুর ঃ	১ জন থানাদার	
	২ জন মোহরার	মাসিক ৪৭ টাকা
	২ জন জমাদার	
ঘাটশীলা পরগণার থানা ঃ	১ জন থানাদার	
	১ জন মোহরার	মাসিক ৩২ টাকা
	১ জন জমাদার	
বেলারিছোড় পরগণার থানা ঃ	১ জন থানাদার	মাসিক ২৫ টাকা
	১ জন মোহরার	

(পাঁচটি থানার জন্য মাসে গড় ব্যয় হোত ৩৫ টাকা ৩ আনা। ১৭৭২-এ নদীয়ার একটা থানার ব্যয়ের থেকে এটা ছিল কম।) মোহরার-এর অর্থ মুহুরি।

(M.R. পৃষ্ঠা ৮৮)

Prodgs. of C.C. at Rungpur, ২১শে ডিসেম্বর, ১৭৭২ থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রধান 'থান্নাদার' (থানাদার)-এর অধীনে সাত মাসে ব্যয় হোত মাত্র ৩০ টাকা।

(৭৯) থানাগুলোর ডাকাতি সমস্যা মোকাবিলা করতে না পারার একটা কারণ ছিল এই যে, ডাকাতেরা বিপুল সংখ্যায় আসত। ১৭৮৬-তে বাহারবন্ধের যে অর্থ লুঠ হয়েছিল তার পিছনে প্রায় দু'শ লোক ছিল, তাদের মধ্যে কিছু গুপ্তচর হিসাবে, কিছু গোপন সংবাদদাতা হিসাবে, কিছু অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আর বাকিরা আক্রমণকারী দলের সদস্য হিসাবে কাজ করেছিল। এরই চার বছর পরে ঐ একই জেলা রাজশাহীতে কোম্পানীর অর্থ আবার লুঠ হয়েছিল, আর সেটাও হয়েছিল একটা থানার কাছে (C.P.C. Vol. IX, No. 1494)।

(৮০) এ ছিল এক প্রাচীন মোগল প্রথা এবং এক্ষেত্রে ইংরেজের একগুয়েমি কোম্পানী প্রশাসন এবং জমিদারদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল।

(৮১) এই অধ্যায়ের শেষের দিকে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

(৮২) মহঃ রেজা খান চেয়েছিলেন নিজামতের অংশ হিসাবে থানাগুলো একটা জেলার

ফৌজদারেব অধীনে থাকুক। ১৭৭৬-এ হুগলী জেলার থানাদারিকে তিনি ফৌজদার মাহাদী নিসার খানের অধীনে রেখে দিয়েছিলেন (C.P.C Vol. V. No. 174)। একইভাবে যে দুটো থানা বীরভূমের বনাঞ্চলের ওপব নজব বাখত তাদেরও তিনি একজন ফৌজদারের অধীনে রাখতে চেয়েছিলেন। এই দুই অঞ্চল ছিল ক্যাপ্টেন ব্রাউনের অধীন। রেজা খানেব পবামর্শ অগ্রাহ্য করে চলতি ব্যবস্থাকেই বজায় রাখা হয়েছিল। "জঙ্গলের অধিবাসীরা কর্তৃত্ব পরিবর্তনেব কারণকে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে . . " এই যুক্তিতে রেজা খানেব পরামর্শকে বাতিল করা হয়েছিল (C.P.C . Vol. V, No. 170)।

(৮৩) এমনই একটা আদালত বা কোর্ট হল বক্সী দপ্তর। এই আদালত বা কোর্ট সম্পর্কে ভেরেলস্টের মতকে ফাবমিঙ্গার এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন (*Fifth Report*, পৃঃ ১৫৬) : "এই কোর্ট সমস্ত রক্ষীবাহিনী, সকল পাহারাদার এবং সাধারণভাবে অঞ্চলের আরক্ষার কাজে ও অধিবাসীদের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার ও চুরির ঘটনা প্রতিবোধেব কাজে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিদের আচবণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদেব চালনা কবাব আদেশ এই দপ্তর থেকেই দেওয়া হয়; একই সঙ্গে এই দপ্তর তাদেব বেতন ও আজ্ঞানুবর্তিতারও ব্যবস্থা করে।"

(৮৪) C.P.C. Vol IX. No. 1494.

(৮৫) *Seebundee Account of the Chucklah of Jehangiernagar As Established In the year 1771, Prodgs. of C.C. at Dacca (Vol. IV).* কার্যবিবরণীব তারিখ নেই, কিন্তু এটা অবশ্যই ১৭৭২-এর ১০ই অক্টোবর থেকে ১৩ই অক্টোবরের মধ্যে।

(৮৬) উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মোট কর্মচারী সংখ্যা পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি দপ্তব বা সংস্থার কর্মচারী সংখ্যাকে যোগ করা হয়েছে। যেমন সমস্ত দেওয়ানি কাছারিগুলির কর্মচারী সংখ্যাকে যোগ করে ৩৮ সংখ্যাটি পাওয়া গেছে।

(৮৭) সুপারভাইজারের দপ্তরের কাঠামোটা ছিল নিম্নরূপ :

মিঃ হ্যারিস সুপারভাইজার (ইংরাজ কর্মচারীদের বেতন এত কম হত না তাই অঙ্কটা সন্দেহজনক)	১৫০ টাকা (মাসিক)
তাঁর কর্মচারীদের	১৫০ টাকা (মাসিক)
মাসচুক্তিতে একজন করণিক	১০০ টাকা (")
সুপারভাইজারের দেওয়ান	১০০ টাকা (")
সুপারভাইজারের সেরেস্তাদার সরকার প্রভৃতি	২০০ টাকা (")

অতএব, ৫৫০ টাকা ভারতীয় কর্মচারীদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে "কর্মচারী", "সরকার" ইত্যাদি অভিধাগুলি একাধিক কর্মচারীর উপস্থিতি নির্দেশ

করছে। তাই উপরে মূল আলোচনার প্রদত্ত সারণিতে ৬ জন কর্মচারী ন্যূনতম সংখ্যা হিসাবে দেখানো ১৪২ হয়েছে।

(৮৮) নিম্নবর্ণিতেরা ছিলেন মুর্শিদাবাদে কর্মরত পদস্থ কর্মচারী :

রায় সুন্দরসিংহ	৫০০-x-x
আত্মারাম ইত্যাদিরা যারা	
ছিলেন ভকিল বা উকিল	৮০-x-x
যুগল রিশ্বিন ইত্যাদিরা	৪৫-x-x
রামনারায়ণ মোহরার (বা মুহুরি)	১৭-x-x
রামশঙ্কর	১০-x-x
মোরাদ-উৎ-দৌলাহ	৪০০-x-x
মহম্মদ ইসমাইল আলি খান	৫০০-x-x

'vacquils' অর্থাৎ ভকিলরা বা উকিলরা — এই শব্দের ব্যবহারের ফলে বোঝা যাচ্ছে যে বেতনভুক্ত অনেক উকিলই ছিলেন। অতএব মূলরচনার সারাণিতে ন্যূনতম সংখ্যা ৮-কেই ব্যবহার করা হয়েছে।

(৮৯) *Statement of Establisjments of the Present Chiefs and Collectors with Proposed Encrease or Decrease*, Prodgs. BOR, 12 June, 1786.

(৯০) ৮৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯১) ৮৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯২) ৮৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯৩) এখানে ভারতে ভূমির ওপর অধিকার ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে Kaye-র মতকে উদ্ধৃত করা দরকার (***The Administration of the East India Company : A History of Indian Progress***, p. 162)। "ভারতের ভূমিরাজস্ব এক বিশাল আলোচনার বিষয়। সাধারণের থেকে বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ কোনরকম অমর্যাদার আশঙ্কা না করেও স্বীকার করে নিতে পারেন যে, তিরিশ বছর অধ্যয়নের পরও তিনি এর সমস্ত অংশ ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি। আমি খুব কম লোককেই চিনি যাঁরা অসম্পূর্ণ উপলব্ধির বাইরে (এ বিষয়) কিছু বুঝেছেন। এটা এমনই একটা বিষয় যার ওপর অনেককিছু লেখা গেলেও তো শেষপর্যন্ত আগের মতনই দুর্বোধ্য থেকে যায়।"

(৯৪) উদাহরণস্বরূপ — কুমিল্লা জেলার রৌশনাবাদ পরগণার জমিদার "প্রকৃত রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহকারীদের ষষ্ঠন্তর দূরে সরে গিয়েছিলেন" — সিরাজুল ইসলাম, ***The Permanent Settlement in Bengal : A Study of its Operation, 1790-1819***, ঢাকা, ১৯৭৯।

(৯৫) সাধারণভাবে একজন কোতোয়াল নিজামতের কর্মচারী হওয়ায় জমিদারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতেন। কিন্তু এমন ঘটনাও ছিল যেখানে জমিদারেরা (যেমন, বর্ধমানে) কোতোয়াল নামের কর্মচারী নিয়োগ করতেন।

(৯৬) লেফটেন্যান্ট গুডয়ারকে (Goodyar) লিখেছেন জে. পিয়ারস্ (J. Peiarce). ১৩ই এপ্রিল, ১৭৭০, Mid. Dist. Recds., Vol. IV, p. 1.

(৯৭) একই নথি।

(৯৮) ইংরেজের নথিতে ফুলকুসুমকে মাঝেমধ্যেই ফুলকিসন্ (অর্থাৎ ফুলকিষাণ বা ফুলকৃষ্ণ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৯৯) নরেন্দ্রনাথ দাস, ***A History of Midnapore***, Vol. I, p. 11.

(১০০) আমিল, ইজারাদার এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীদের কাছে দেওয়া লিখিত আদেশ বা কমিশনকে (Commission) আমিলনামা বলা হত।

(১০১) Prodgs. of C.C. at Krishnagar and Kasimbazar (Combined Vols. I, II & III), 10 June, 1772. p. 16-18.

(১০২) ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে কবুলিয়ত এবং আমিলনামা একই নথির নাম হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহৃত হোত।

(১০৩) MR, p. 18.

(১০৪) R.J. Hirst, 'The Early Collectorate Records of Burdwan, 1768-1790' in ***BPP***, Vol. VI, Oct-Dec., 1910, No. 13, p. 235.

(১০৫) একই নথি।

(১০৬) Hirst, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৫।

(১০৭) Hirst, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

(১০৮) Hirst, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৫-২৩৬।

(১০৯) Hirst, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩০।

(১১০) Hirst, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩১।

(১১১) একই গ্রন্থ।

(১১২) Hirst, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। প্রায় একই সময়ে দিনাজপুরের রাণীর ভাই ও জমিদারির ম্যানেজার জানকীরাম জমিদারি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কলকাতায় আটক ছিলেন এবং ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দিনাজপুররাজের সম্বন্ধে বিষদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য ***The Calcutta Review***, Vol. 55, 1872-এ প্রকাশিত E.V. Westmacott-এর 'The Territorial Aristocracies of Bengal : The Dinajpur Raj,' p. 28 দ্রষ্টব্য।

(১১৩) "সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হল রাজস্ব . . . যা সরকারের লক্ষ্য, যার ওপর অবশিষ্ট সবকিছু নির্ভরশীল এবং যার নীচের অন্য সবকিছুরই অবস্থান" — Prodgs. of C.C. at Kasimbazar, ২৮শে জুলাই, ১৭৭২।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট

১৭৮৫-'৯৫-এর মধ্যে বাংলায় ডাকাতি সমস্যার প্রতি ইংরেজের প্রতিক্রিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর আলোকপাত

১৭৮৫ — "তাঁদের কোষাগার রক্ষার্থে একজন জুম্মাদার (জিম্মদার বা জমাদাব) এবং ২৫ জন বরকন্দাজ নিয়োগ করার জন্য" কালেক্টবদের ১২৫ টাকা দেওয়া হত।

. ১৭৮৬ — বর্ধমানের কালেক্টর জৌন (জান) সিং 'জেমাইদারের' (জমাদার) নেতৃত্বে একদল সিপাই-এব পাহাবায় ১,৭৪,৪৮৬ টাকা কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন।

১৭৮৬ — ডাকাত সর্দার মজনু শাহকে দমন করার জন্য দিনাজপুরে লেঃ ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ইংবেজ সৈন্য সমাবেশ করা হযেছিল। ব্রেনানকে সাহায্য করাব জন্য বক্সীগঞ্জ থেকে একজল সৈন্য পাঠানো হয়েছিল।

Dinaje. Dist. Records. Vol. I.. p. 18.

১৭৮৭ — সংখ্যায় যারা ছিল প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার, সেই কুচবিহারেব সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিলবেরীজ থেকে লেঃ ব্রেনানের এবং দিনাজপুর থেকে লেঃ হিলের বাহিনীকে চালনা করা হয়েছিল। — "Naga Sannyasi Ganeshgeer and the Kuchbihar Disturbances of 1787 A.D." by N.B. Roy in *Sir Jadunath Sarkar Commemoration, Volume II*. (Punjab University).

১৭৮৭ — বীরভূমের কালেক্টর "বরগানদাজদেব (বরকন্দাজ)" "সম্পদের রক্ষক ও পাহারাদার হিসাবে" নিয়োগ করেছিলেন। বরকন্দাজদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "এই বাহিনী বহু পুরনো। আগে পাহাড়ী মানুষদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনকে প্রতিরোধের জন্য তাদের অধিকাংশ পাহাড়ের কাছে নিয়োগ করা হোত" — ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে লিখেছেন বীরভূমের কালেক্টর, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৭। Rev. (Jud.) Prodgs. Vol. I.

১৭৮৮ — দিনাজপুরে 'ডাকাতি খরচা' নামে একধরনের কর মানুষদের ওপর ধার্য করা হয়েছিল। এটা ছিল "জগেরনাউতপুর (জগন্নাথপুর) কুঠিতে ডাকাতির ক্ষতিপূরণের জন্য আদায় করা কর"। Dinage Dist. Recds. Vol. I, p. 130.

১৭৯০ — ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত উত্তরশাহপুর ও নোয়াবাদের নবম ও পঞ্চদশ অংশের জমিদাররা "১১৯৬-এর ১৫ই জ্যৈষ্ঠের হাঙ্গামার নায়ক হিসাবে" অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা হয়েছিল। এর পরিণামে তাঁদের নিয়ে "তদন্তের ফল না জানা পর্যন্ত তাঁদের জমি খাস করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং "জমিদারদের আটকের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এসব জমি অধিগৃহীতই থাকবে" বলে বলা হয়েছিল। জমিদারদের চারবছর হাজতবাস এবং মেয়াদ অন্তে মুক্তির জন্য মুচলেকা দিতে হয়েছিল। এরই সঙ্গে জমিদার মানিক বিশ্বাসকে একবছরের হাজতবাসের সঙ্গে ৫৯ ঘা বেতও সহ্য করতে হয়েছিল।

Rev. (Jud.) Prodgs.. 8 Oct. 1790)

উল্লেখ করা দরকার যে, জমিদারদের শাস্তির ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ছিল একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।Rev. (Jud.) Prodgs গুলোতে এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে বিচারকেরা জমিদারদের "বেত্রাঘাতের" আদেশ দিয়েছিলেন।

১৭৯০ — রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের শক্তিবৃদ্ধির জন্য একমাসে (আগস্ট, ১৭৯০) ২৪৪-৭ টাকা এবং দু'মাস নদীতে শত্রুর সন্ধানে নৌকাযোগে তল্লাশির জন্য ৩৭৮ টাকা ব্যয় করেছিলেন। Rev. (Jud.) Prodgs 8 Oct., 1790.

১৭৯০ — ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট "ডাকাতেরা যেমন ব্যবহার করত তারই অনুরূপ কিন্তু সিপাইদের দ্বারা সুরক্ষিত" চারটি বড় নৌকা তৈরীর সুপারিশ করেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের ওপর সর্বক্ষণ নজরদারি করাই ছিল এইসব নৌকাগুলোর কাজ। এই নৌকাগুলোর কর্মচারীদের জন্য মাসে ৭০ টাকার বেশী ব্যয় হবে না বলে ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন।

Rev. (Jud) Prodgs. 8 Sept., 1790

১৭৯০ — ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর সরকার আদেশ জারি করে সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের তাদের অধীনস্থ জলাগুলোর পুলিশ সংগঠনের বিষয়ে তথ্যাদি জানাতে বলেছিলেন। ১৭৯১-এর ১৮ই এপ্রিল সমস্ত তথ্য নিজামত আদালতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

Rev. (Jud.) Prodgs.. 8 April, 1791

১৭৯০ — নদীয়ার জমিদারির মধ্যে 'পুলিশী ব্যয়' নির্বাহের জন্য জনসাধারণের ওপর কর ধার্য করার কথা বলা হয়েছিল। কথা ছিল এটা হবে ২০,০০০ টাকার এক স্বতন্ত্র আদায়। "এই তহবিলের আয় ও ব্যয় জমিদারদের হাতে থাকবে নাকি তা সরকারের তরফে কালেক্টরদের দ্বারা আদায় করা ও ব্যয় করা হবে" সে ব্যাপারে সরকার প্রথমদিকে মনস্থির করতে পারেন নি। পরে বোর্ড অফ রেভিনিউ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে "নদীয়ার কালেক্টরের চিঠিতে লেখা পুলিশী ব্যয়ের জন্য আদায় এখনকার মতন জমিদারেরাই করবেন কিন্তু জমিদারদের পুলিশ অফিসারদের কাজকে আরো দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও স্থিরিকৃত আদায় যাতে সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদা সম্পন্ন কালেক্টরদের সক্ষম করার জন্য ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বর্ধমানের থানাদারি ব্যবস্থার জন্য প্রণীত আইন নদীয়ার কালেক্টরীর ক্ষেত্রে কাজে লাগান হবে।"

Rev (Jud.) Prodgs. 8 Oct.. 1790

১৭৯১ — যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশদের সংরক্ষণের জন্য "থানা বা পুলিশ স্টেশন স্থাপনের" জন্য সুপারিশ করেছিলেন। "আপন আপন জেলার শান্তিরক্ষার জন্য জমিদারেরা দায়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন যেসব জায়গার কথা আমি বলছি, এটা সম্পূর্ণভাবেই অবাস্তব ব্যাপার, কারণ এইসব ছোট ছোট জেলাগুলোর (অর্থাৎ অঞ্চলের) কোন একটাতে একটা অপরাধ সংঘটিত হলে এক ঘণ্টার সিকিভাগ সময়ের মধ্যেই অপরাধীরা সেই অঞ্চলের বাইরে চলে যেতে পারে।" — ফোর্ট উইলিয়ামের নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রারকে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট আর. রক (R. Rocke) লিখেছিলেন।

Rev. (Jud.) Prodgs., 1 April, 1791

১৭৯১ — সরকারের ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অক্টোবরের চিঠির উত্তরে ১৭৯১ এর ২০শে এপ্রিল ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন পুলিশ সংগঠনকে অর্থ যোগানোর একমাত্র উপায় হোল "ভোগ্যপণ্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে কর বসান কারণ আরো বেশী মাত্রায় অসুবিধায় পড়ার ফলে করপ্রদানকারী মানুষদের মধ্যে এর অপব্যবহার কম হবে বলেই আমার মনে হয়। যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হবে তা সাধারণভাবে জানা থাকবে এবং তার ফলে কর্মরত অফিসারদের পক্ষে অবৈধ বোঝা চাপানোর সুযোগও বেশী থাকবে না, যদিও আমি নিশ্চিত যে বিষয়টির প্রতি সবিশেষ সতর্কতা ও মনোযোগ সত্ত্বেও এটাই শেষপর্যন্ত ভোগ্যপণ্যের মূল্যকে দশগুণ বৃদ্ধির ওজর হিসাবে কাজে লাগান হবে।"

Rev. (Jud.) Prodgs., 29 April, 1791

১৭৯১ — সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে লেখা ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ২২শে এপ্রিলের চিঠিতে রঙপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে, যদিও লোকজন হাটবাজার পাহারার ব্যয় বহনে রাজি ছিল তবু এমনকিছু হাট ছিল যেগুলো "এত ছোট এবং একটা থেকে আর একটা এত দূরে অবস্থিত যে যেসব মানুষ সেখানে ঘনঘন যাতায়াত করে তারা পুলিশী সংগঠনের ব্যয় বহনে সক্ষম হয় না।"

Rev. (Jud.) Prodgs., 18 April, 1791

১৭৯১ — কোর্ট অফ সার্কিট ১৭৯১ সালে ২৬শে মার্চ কলকাতা কাউন্সিলকে তমলুকে একটি ফৌজদারি জেল গঠনের কথা বলেছিলেন। সরকার ১৭৯১ সালের ১৮ই এপ্রিল তমলুকে একটা "পাক্কা জেল" নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৭৯১ — "একজন অতিরিক্ত জমাদার এবং তিরিশজন সাধারণ সৈনিকের সাহায্যে মফঃস্বলে আমার নিয়োগ করা পাহারাদারদের শক্তিবৃদ্ধির" জন্য সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের কাছে ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট আবেদন জানিয়েছিলেন।

Rev. (Jud.) Prodgs., 13 May, 1791

সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল পাহারাদারের শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন।

১৭৯১ — বাখরগঞ্জের ফৌজদারি আদালতের সঙ্গে ৮০ জন বরকন্দাজ এবং একজন "জাম্মাউতদার" (Jammautdar) (জমাদার) যুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক বরকন্দাজের মাসিক বেতন ছিল ৫ টাকা এবং "জাম্মাউতদারের" (জমাদার) ৬ টাকা।

Rev. (Jud.) Prodgs., 7 January, 1791

১৭৯১ — রঙপুরের ফৌজদারী জেল মেরামতের জন্য ২,০৫২ জন 'কুলি' বা শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল।

Rev. (Jud.) Prodgs., 18 April, 1791

১৭৯১ — বাখরগঞ্জের কমিশনারের নিম্নলিখতি ব্যবস্থা ছিল ঃ

৮টি ছোট পাহারাদারি নৌকা (প্রতিটি ২৫ টাকা হিসাবে)	২০০ টাকা
এর জন্য ৬ জন জমাদার (প্রত্যেকে ৮ টাকা হিসাবে)	৪৮ টাকা
এখান থেকে দেড় কোম্পানী সিপাই সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায়	
৮০ জন বরকন্দাজ (প্রত্যেকে ৫ টাকা হিসাবে)	৪০০ টাকা
মোট	৬৪৮ টাকা

Rev. (Jud.) Prodgs., 8 July, 1791

১৭৯১ — ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের কাছে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট "পাহারাদারি নৌকার" দ্বারা সজ্জিত পাহারা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। জেলার শান্তিরক্ষার জন্য ৮টি পাহারাদারি নৌকা ব্যবহার করা হোত — প্রতিটি নৌকায় ৪ জন সশস্ত্র মানুষ হিসাবে মোট ৩২ জন সৈনিক থাকত। প্রত্যেক অস্ত্রধারী মাসে ৪ টাকা হিসাবে বেতন পাওয়ায় বেতন বাবদ মাসে ব্যয় হোত মোট ১২৮ টাকা। মাথাপিছু মাসে ১৫ টাকা হিসাবে দুজন দারোগাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, ফলে দু'জনের জন্য মাসে মোট খরচ হোত ৩০ টাকা। প্রতিটি নৌকায় মাথাপিছু ২ টাকা ৮ আনা হিসাবে দাঁড়ি ('Dandies') নিয়োগ করা হয়েছিল বলে ১১২ জন দাঁড়ির জন্য মাসে ব্যয় হোত ২৮০ টাকা। প্রতিটি নৌকা ৭ টাকা করে ভাড়া করায় ৮টি নৌকার জন্য মাসিক খরচ ছিল ৫৬ টাকা। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই থেকে দশ মাসেব জন্য এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুলাই সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল এটা অনুমোদন করেছিলেন।

Prodgs. the G.G. in Council, 8 July, 1791 এবং Rev. (Jud). Prodgs., 8 July, 1791.

১৭৯৩ — তমলুকে একটা পুলিশ কর বসান হয়েছিল। এই করের বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হয়েছে ঃ

যেসব শহর, গঞ্জ বা বাজারের ওপর কর ধার্য হয়েছিল	যেসব বণিক ব্যবসায়ী বা দোকানদারের ওপর করধার্যের ভার পড়েছিল	প্রতিটি শহর, বাজার বা গঞ্জের ওপর ধার্য করের বার্ষিক পরিমাণ	প্রতিটি শহরে, বাজার বা গঞ্জের ওপর কিভাবে কর ধার্য হোত এবং কোন ধরনের মানুষ তা দিত
সাতেবগঞ্জ	ব্যবসায়ীদের কেউই আদায়ের দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। নিতাই	৫০৯ -X X	আনুষঙ্গিক ব্যয় অনুসারে এই কর কম বা বেশী হয়
নারায়ণপুর	(অস্পষ্ট) নামে এক ব্যক্তি	৮৬ X-X	এটা ব্যবসায়ী ও মুদিদের
মানিকগঞ্জ	মাসিক ৫ সিক্কা টাকায়	৩০ -X-X	কাছ থেকে মাসে আদায় করা
গেওখালি	সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন	১৬২ -X-X	হয় এবং এইভাবে আদায়ীকৃত অর্থ যেভাবে নির্দেশ দেওয়া
		৭৮৭ -X-X	হয়েছে সেইভাবে পুলিশ খাতে জমা হবে।

এটা লক্ষ্য করা দরকার "যে পুলিশী সংগঠনের ব্যয় নির্বাহের জন্য বসান করের কোন অংশই ইংরেজ নাগরিকদের ওপর ধার্য করা হবে না" — নির্দেশ ছিল এই মর্মে।

১৭৯৩ — বাখরগঞ্জে নিম্নলিখিত পাহারাদার ফৌজ এবং আনুষঙ্গিক পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল ঃ

মাসিক ২৫ টাকা হিসাবে ভাড়া করা ৮টি ছোট পাহারাদারি নৌকা —	২০০ টাকা
মাসিক ৬ টাকা বেতনে ৮ জন জমাদার --	৪৮ টাকা
মাসিক ৫ টাকা বেতনে ৮০ জন বরকন্দাজ --	৪০০ টাকা
মোট	৬৪৮ টাকা

Jud. (Crim) Prodgs., 10 May, 1793

১৭৯৩ — একজন ডাকাত বুদানকে (বদনকে) গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যয় হয়েছিল ২০০ টাকা। গোবিন্দ নামে এক ব্যক্তি যিনি ডাকাত ধরেছিলেন তাঁকে পুরস্কার হিসাবে এই টাকা দেওয়া হয়েছিল। আরো ৮ জন ডাকাতকে, যাদের মধ্যে অন্তত একজন মাঝি (কীর্তি মাঝি) এবং দু'জন মুসলমান (মোরাদ ও গোলোম আহোমেদ) ছিল, তাদের ধরার জন্য ঐ একই ব্যক্তিকে ৮০ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

Jud. (Crim) Prodgs., 10 May, 1793

১৭৯৩ — প্রতিটি থানার মাসিক ব্যয় ৫০ টাকা ধার্য ছিল।

Jud. (Crim) Prodgs.. 3 May, 1793

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

যশোর

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচার হয়েছে আর ছাড়া পেয়েছে এমন সব বন্দীদের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিশদ হিসাব

[Judicial (Criminal) Prodgs., 10 May, 1793]

বন্দীদের নাম	অপরাধ	গ্রেপ্তারের তারিখ	মুক্তির তারিখ	দৈনিক আহারের জন্য বরাদ্দ	মোট ব্যয় টাকা আনা
সামবু	ডাকাতি	৭ই জানুয়ারী, ১৭৯৩	৭ই জানুযারী, ১৭৯৩	১ আনা	X-১
পুত্তিরাম	ডাকাতি	৭ই জানুযারী, ১৭৯৩	১৫ই ফেব্রুযারী ১৭৯৩	১ আনা	২-৬
খোদা বক্স	চুরি	১৫ই ফেব্রুযারী ১৭৯৩	২০শে ফেব্রুযারী, ১৭৯৩	১ আনা	X-৬
চিন্তারাম	ডাকাতি	৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	২০শে ফেব্রুযারী ১৭৯৩	১ আনা	X-১৪

বন্দীদের নাম	অপরাধ	গ্রেপ্তারের তারিখ	মুক্তির তারিখ	দৈনিক আহারের জন্য বরাদ্দ	মোট ব্যয় টাকা আনা
মোহন বানিয়া	ডাকাতি	৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	X ১২
রমজান গাজী	চুরি	১১শে ফেব্রুয়ারী ১৭৯৩	২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	X ২
সবাজ খান	চুরি	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৭৯৩	১ আনা	X ৬
গোপাল	চুরি	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৭৯৩	১ আনা	X ৭
বাড্ডি	চুরি	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	X ৬
মুসুগা	চুরি	১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	X ১০
আনন্দীরাম	চুরি	১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৩	২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	X ৮
টোটোরাম	চুরি	১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	X ১৪
ভগীরথ	চুরি	৫ই মার্চ ১৭৯৩	৬ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	X ১
জোয়াল গালি	চুরি	৫ই মার্চ ১৭৯৩	৬ই মার্চ ১৭৯৩	১ আনা	X ২
লাকি	চুরি	৫ই মার্চ ১৭৯৩	৬ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	X ২
শাকির মহম্মদ	চুরি	১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৩	৭ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	১-৭
গঙ্গারাম	চুরি	২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১৯শে মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	১ ৬
গঙ্গারাম গোয়ালা	চুরি	২৮শে ডিসেম্বর ১৭৯২	৩০শে মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৫ ১৩
রামকিশোর	চুরি	২৮শে ডিসেম্বর, ১৭৯২	৩০শে মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৫ ১৩
বুদান (বদন)	চুরি	২৮শে ডিসেম্বর ১৭৯২	৩০শে মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৫-১৩
রামহরিদেব	চুরি	১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১৮ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	৩ ৬
রামকুমার	ডাকাতি	৪ঠা এপ্রিল, ১৭৯৩	৯ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	X ৬
বরকতউল্লা	চুরি	৯ই এপ্রিল ১৭৯৩	৯ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	X ১
যুগল	চুরি	৩০শে জানুয়ারী ১৭৯৩	৯ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	৪-১১
ভকতরাম	ডাকাতি	১৭ই মার্চ, ১৭৯৩	৯ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১ ৭
কামু	ডাকাতি	১৭ই মার্চ, ১৭৯৩	৯ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১ ৭

"১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত যশোরের নিজামত জেলে পাঠানোর আগে বন্দীদের খাদ্যের বিশদ হিসাব"

[Judicial (Criminal) Prodgs., 10 May, 1793]

বন্দীদের নাম	অপরাধ	গ্রেপ্তারের তারিখ	মুক্তির তারিখ	দৈনিক আহারের জন্য বরাদ্দ	মোট ব্যয় টাকা আনা
গোবিন্দরাম	ডাকাতি	১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	৭ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	১-৭
আদু সরদার	ডাকাতি	৫ই মার্চ, ১৭৯৩	১১ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	-৭
ফুলোহ	ডাকাতি	৫ই মার্চ, ১৭৯৩	১১ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	-৭
ভোলানাথ	হত্যা	৫ই অক্টোবর, ১৭৯৩	৩০শে মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৯-৬

সিক্কা টাকা ১১-১১

"যশোরের ফৌজদারী জেলে আটক যেসব ব্যক্তির তদন্ত এখনো শেষ হয়নি তাদের জীবনধারণার্থে প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য প্রদত্ত অর্থের বিবরণ"

Jud. (Crim) Prodgs., 10 May, 1793

ব্যক্তিদের নাম	অপরাধ	গ্রেপ্তারের তারিখ	দৈনিক আহারের জন্য বরাদ্দ	মোট ব্যয় টাকা আনা
(১) সানফাৎ	চুরি	২৭শে নভেম্বর, ১৭৯২	১ আনা	৯-১০
(২) ভিকে গোয়ালা	চুরি	১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	৪-১২
(৩) দুবা	চুরি	২৭শে নভেম্বর, ১৭৯৩	১ আনা	৯-১০
(৪) কোরেশ	চুরি	১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৩	১ আনা	৪-১২
(৫) আলম শিকারী	ডাকাতি	২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	৪;
(৬) তাঁতিরাম	ডাকাতি	২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩	১ আনা	৩-৫
(৭) রামা জেলিয়া	ডাকাতি	৯ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৩-৫
(৮) বুল্লা জেলিয়া	ডাকাতি	৯ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৩-৫
(৯) গোবিন্দ জেলিয়া	ডাকাতি	৯ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৩-৫
(১০) রাম্মু জেলিয়া	ডাকাতি	৯ই মার্চ, ১৭৯৩	১ আনা	৩-৫
(১১) ঠাকুর দাস	ডাকাতি	৪ঠা এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১-১১

ব্যক্তিদের নাম	অপরাধ	গ্রেপ্তারের তারিখ	দৈনিক আহারের জন্য বরাদ্দ	মোট ব্যয় টাকা আনা
(১২) রাজু গোয়ালা	ডাকাতি	৪ঠা এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১ ১১
(১৩) মনোহব গোয়ালা	ডাকাতি	৪ঠা এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১ ১১
(১৪) গৌরাঙ্গ শর্মা	ডাকাতি	৮ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১ ৭
(১৫) কাউমু গাউমু	চুরি	৮ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১ ৬
(১৬) রামতনু পাল	ডাকাতি	৯ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১-৬
(১৭) পদ্মলোচন	ডাকাতি	৯ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১ ৫
(১৮) হারানিয়া	চুরি	১৬ই এপ্রিল, ১৭৯৩	১ আনা	১-১৫
(১৯) জন ফ্রাগ আর বেরোকান	বলপূর্বক দখল এবং (অস্পষ্ট) তিলকঁচাদ রাযেব	১৫ই এপ্রিল, ১৭৯৩	২ ৮	২ ১০ ৮
(২০) ফ্রান্সিস বোজিরো (রোজরিও)	"	১৫ই এপ্রিল, ১৭৯৩	২-৮	২-১০-৮
(২১) টমাস রোজিরো (রোজরিও)	"	১৫ই এপ্রিল, ১৭৯৩	২-৮	২ ১০-৮

সিক্কা টাকা ৬৮-১৪

চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিশিষ্ট

নদীয়া জেলার জন্য প্রস্তাবিত পুলিশী অধিকার ক্ষেত্র (Jurisdiction)

Jud. (Crim) Prodgs., 3 May, 1793

থানার সংখ্যা	থানার নাম	কোথায় অবস্থিত	মাসিক ব্যয় টাকা আনা
১	হারদি	পরগণা বাজপুর	৮৩
২	মেহারপুর	পরগণা বাজপুর	৮৩
৩	কোট চাঁদপুর	শাউজল	৮৩
৪	আগর দ্বীপ ও পলাশী	বিলগাঙ	৯৯
৫	সুমন্তগাড়	সাতসিকা	৮৩
৬	নাউপাড়া	বোগওয়ান	৮৩
৭	কৃষ্ণনগর ও হাঁসখালি	কৃষ্ণনগর	১১৫
৮	দুবিতগঞ্জ	মুক্তিয়ারী	৮৩

থানার সংখ্যা	থানার নাম	কোথায় অবস্থিত	মাসিক ব্যয়	
			টাকা	আনা
৯	বাগদা	হালদা	৮৩	
১০	সিরিনগর (শ্রীনগর)	সিরিনগর (শ্রীনগর)	৮৩	
১১	উলাসি	মুলগর	৮৩	
১২	প্রাণপুর	বুরোন	৮৩	
১৩	বুরনহাট	মাইহাট্টি	৮৩	
১৪	বাদামগাছি	আনওয়ারপুর	৮৩	
১৫	জোগোলি	উক্রা	৮৩	
১৬	শান্তিপুর	শান্তিপুর	৮৩	
১৭	সুকসাগর	পাজানোর	৮৩	
১৮	হাফলি	মহম্মদ আমেনপুর	৮৩	
১৯	বৈদ্যবাটি	মহম্মদ আমেনপুর	৮৩	
২০	সালকা	মহম্মদ আমেনপুর	৮৩	
২১	উলবেড়িয়া	কোলোরাহ	৮৩	

[illegible]

সাকুল্যে ৯৯১ টাকা অনুমোদন করেছিলেন এবং মাসে ৩৯৭ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আগরদ্বীপ (অগ্রদ্বীপ) নাউপাড়া (নবপাড়া)।

জিলা মুরর্শিদাবাদের কালেক্টরশিপের অন্তর্গত পুলিশী অধিকারের তালিকা এবং তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার বিবরণী, মুরশিদাবাদ শহরে অবস্থিত গঞ্জগুলি জন্য থানাদারি ব্যবস্থার তালিকা থেকে জানা যায় যে সেয়র (শুল্ক) তুলে দেবার আগে এখানে শুল্ক জেলার রাজস্বের সঙ্গে আদায় হত।

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিশিষ্ট

আঠারো শতকের শেষে ডাকাত নিয়ন্ত্রণে পুলিশি ব্যবস্থার অধিকার ক্ষেত্র (Jurisdiction)

Jud. (Crim) Prodgs., 19 May. 1793

অধিকার ক্ষেত্রের সংখ্যা ও নাম	অধিকার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত পরগণা বা পরগণা-সমূহের নাম	প্রতিটি অধিকার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির হিসাব	কর্মচারীবর্গ	জমাদার	বরকন্দাজ	মোহুরার বা মুহুরি
কাশিমবাজার নদীর পশ্চিমদিকে						
(১) ফারোকাবাদ	পরগণা রোকনপুরের অংশ					
	বিশেষ মৌজা জামালপুর	৯ ক্রোশ	শিউলাল	১	১০	১
	মৌজা শাজাহানপুর সুজাপুর					
	মৌজা শিবপুর					
	মৌজা দুমাপাড়া					

অধিকার ক্ষেত্রের সংখ্যা ও নাম	অধিকার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত পরগণা বা পরগণা-সমূহের নাম	প্রতিটি অধিকার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির হিসাব	কর্মচারীবর্গ	জমাদার	বরকন্দাজ	মোহরার বা মুহুরি
(২) প্রতাপ	চাকলা দৌনাপুর	১০ ক্রোশ	মহম্মদ সাদ্মী	১	১০	১ (অস্পষ্ট)
(৩) পুলসা	পরগণা রাজেশাহী	১০ ক্রোশ	জৌবউদ্দিন খান	১	১০	১
(৪) নলহাটি	পরগণা ধাওয়া	১০ ক্রোশ	ফতেজঙ খান	১	১০	১
(৫) দুনগাঁও	পরগণা দিয়ানগরের	১০ ক্রোশ	মুর রফিউদ্দিন	১	১০	১
	অংশবিশেষ পরগণা ধাওয়া					
	পরগণা শাহজাহানপুরের অংশ					
	বিশেষ পরগণা শাজাদপুর অংশ					
	পরগণা রাধাবল্লভপুরের অংশ					
	পরগণা আকবরশাহী					
	কিসমৎ পরগণা নওযানগর					
	পরগণা মুজকুরী মজুরীর অংশ					
	মৌজা ভূধরপুর					
	মৌজা বুশওয়া					
	মৌজা রঘুনাথপুর বুশোয়া					
	মৌজা বেগুউৎপুর					
	মৌজা দেওগঙ্গ					
	মৌজা শ্রীকৃষ্ণপুর					
	মৌজা পিলসাম্মার অংশ					
	মৌজা হরিশবাটি					
	মৌজা কনতাব					
	মৌজা কৌমিচা					
	মৌজা সন্তবাটি					
	মৌজা সেরিয়া					
	মৌজা জেমিনবামকিসেন					
	মৌজা হরিশ হারা					
	মৌজা বুইনচা					
	মৌজা বাউলিকুণ্ড					
	মৌজা চিৎপুর					

অধিকার ক্ষেত্রের সংখ্যা ও নাম	অধিকার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত পরগণা বা পরগণা-সমূহের নাম	প্রতিটি অধিকার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির হিসাব	কর্মচারীবর্গ	জমাদার	বরকন্দাজ	মোহ্‌রার
	মৌজা সিদাউন্তবাটি					
	(সিদ্ধান্তবাটি)					
	মৌজা মুকুন্দবাটি					
	মৌজা মহাদেববাটি					
	মৌজা মনোহরপুর					
	মৌজা জান্দুরপুর					
	কিস্‌ত মৌজা দুবাল্লি					
	কিস্‌ত মৌজা পাউরঘুবিয়া					
	কিস্‌ত মৌজা দেসোলা					
	কিস্‌ত মৌজা বুরলা					
	মৌজা লক্ষণপাড়া					
	মৌজা কুয়ামগঞ্জ					
	মৌজা সানফেরপুব					
	মৌজা শ্রীকৃষ্ণপুর					
	মৌজা সিমলান্দি					
	মৌজা নিমদ্দিগাকাগ					
	মৌজা পাবনা					
	মৌজা রামোহান্দবাটি					

চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিশিষ্ট

হাকিকৎ-মুসলমান-ই-বাঙ্গালা থেকে খোন্দকর ফাজলি রুব্বীর দেওয়া নিষ্কর ভোগদখলের বিবরণ

বিভিন্ন ধরন	অধিকারীদের বিবরণ	অধিকারের প্রকৃতি
জায়গির	মুসলমান ও হিন্দু	সারা জীবনের জন্য দখলীস্বত্ব দেওয়া হলেও তা হস্তান্তর করা যেত না বা পুরুষানুক্রমে বর্তাত না। জায়গির ছিল দু'ধরনের শর্তাধীন এবং শর্তহীন
আলতামঘা	হিন্দু	চিরদিনের জন্য দেওয়া হোত।

বিভিন্ন ধরন	অধিকারীদের বিবরণ	অধিকারের প্রকৃতি
মাদাদ ই-মাশ	মুসলমান	শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নেতা, সৈয়দ এবং উচ্চকুলোদ্ভব মুসলমানদের দেওয়া হত।
আইমা	মুসলমান	ধর্মীয় নেতা ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।
নজরৎ	মুসলমান	আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক ও সৈয়দদের দেওয়া হোত।
খানকা	মুসলমান	খানকা নির্মাণের জন্য দেওয়া হত।
ফকিরান	মুসলমান	মুসলমান ফকিরদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।
ফকিরাজ	মুসলমান	পবিত্রস্থানের রক্ষণাক্ষেণের জন্য দেওয়া হোত।
নজর ই-দরগা	মুসলমান	পবিত্রস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।
জামিন-ই ইমামি	মুসলমান	মহরম পালনের জন্য।
জামিন-ই-মসজিদ	মুসলমান	মসজিদের নিত্যকার খরচের জন্য।
নজর-ই-হজরত	মুসলমান	কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য।
খরচ-ই-মেসোফিরান	মুসলমান	মুসাফির বা পথিকদের পরিচর্যার জন্য।
মরাম্মাত-ই মসজিদ	মুসলমান	মসজিদের মেরামতি বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
মা-আফি	মুসলমান	অভিজাত মুসলমানদের জীবনধারণের জন্য।
পিরান	মুসলমান	আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক ও শিক্ষিত জনেদের জন্য।
খয়রাতি	মুসলমান	দরিদ্র মুসলমানদের জন্য।
ব্রহ্মোত্তর	হিন্দু	বিশেষত ব্রাহ্মণের জন্য।
মেহত্রাণ (মহত্তারান)	হিন্দু	ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য।
দেবোত্তর	হিন্দু	হিন্দুদের মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।
শেওয়াত্তর (শিবোত্তর)	হিন্দু	হিন্দুদের দেবস্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।
ইনাম		কাজের পুরস্কার হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানদের দেওয়া হোত।

পঞ্চম অধ্যায়

অরাজকতার বিশ্লেষণ

(১) শোষিতের মিলন — সম্মিলিত শ্রেণী উগ্রতা — অরাজকতা

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে দেখা দেওয়া সুসংগঠিত সামাজিক উগ্রতা ও হিংসা তিনটি দিক দিয়ে বিশিষ্ট রূপলাভ করেছিল ঃ প্রথমত, এটা সমাজভুক্ত সকল পর্যায়ের মানুষকে এর সঙ্গে জড়িত করেছিল, সমস্ত পদের (rank) প্রতিনিধি মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং রায়ত থেকে আমলা আর চুয়াড়দের মতন উপজাতীয় মানুষ থেকে *সন্ন্যাসীদের* মতন ভবঘুরে ভিক্ষুক পর্যন্ত মানুষজনকে জমিদারদের নেতৃত্বে সমবেত করেছিল; দ্বিতীয়ত, পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে পূর্বে চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণে সুন্দরবন থেকে উত্তরে কুচবিহার ও রঙপুর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের সর্বত্র এটা ছড়িয়ে পড়েছিল; তৃতীয়ত, একে নিয়ন্ত্রণের জন্য কোম্পানী প্রশাসনের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময়টা ধরে এটা অদমিতই থেকে গিয়েছিল। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অসংখ্য মানুষের দাবী উত্থাপনের ব্যাপক আন্দোলন ইংরেজদের হতবুদ্ধি করেছিল এবং তাদের আন্দোলন দমনের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এ কথা মেনে নিলে বলতে হয় যে, প্রত্যক্ষ ও সাময়িকভাবে শ্রেণী ঘৃণা কিন্তু অপ্রত্যক্ষ ও স্থায়ীভাবে বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এই দুই আবেগকে এই আন্দোলন এক বৃত্তের মধ্যে এনেছিল। এক নিরঙ্কুশ-নীতির দ্বারা ভীষণভাবে নিষ্পেষিত মানুষের একধরনের সংগঠিত ঐক্যের দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল; কাজেই বলা যেতে পারে যে, আমাদের আলোচনায় অষ্টাদশ শতকের যে উগ্রতা আর হিংসার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি তাকে সমকালীন ইংরেজ নথিতে বর্ণিত অরাজকতা হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। এখানে এবং অন্যত্রও ইতিহাসের পালাবদল কালের ঘটনার মধ্যে অরাজকতা কোন বিরল ব্যাপার নয়। কিংবা আমাদের আলোচ্য সময়ে যখন মোগল শাসন বাংলাদেশে ইংরেজকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল তখন অরাজকতা দেখা যায়নি এমনও নয়। সে অরাজকতা ছিল শাসন পর্যায়ের অরাজকতা কিন্তু জীবিকার অন্বেষণে, স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধে এবং এক জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসা জগতে প্রাণশক্তিকে ধরে রাখার সাধারণ প্রয়াসে যেখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঐক্যবোধ, জীবিকার তাড়না ও আত্মপরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল সেখানে সমস্ত পরিস্থিতিটাই অরাজক ছিল না। তা হতেও পারে না। ভবঘুরে সন্ন্যাসী ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষ, সংখ্যালঘু জমিদার আর সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়তদের মতন বিপরীত গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য মোগল যুগের সমাজে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল না। তবে সেই সামাজিক ঐক্য কিন্তু কখনই রাষ্ট্রের কাছে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। আর যদি সেই সামাজিক ঐক্য উত্তেজনা সৃষ্টি করত তবে তাতে কিছু গ্রাম বা পরগণা প্রভাবিত হোত মাত্র। মোটের ওপর উত্তেজনা তখন সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। অস্ত্র ও সঙ্গতির অধিকারী জমিদারদেরই সীমান্ত ও স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সীমান্ত-বিরোধ ও আঞ্চলিক উত্তেজনা উপশমের মধ্যেই তাদের লড়াইয়ে ও হিংসার ক্ষমতা লোপ পেত। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দস্যু তস্করদের

অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার করার কাজে রাষ্ট্র জমিদারের শক্তি প্রয়োগকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত। মুর্শিদকুলি খানের সময়কার যশোরের সীতারাম রায় এবং রাজশাহীর উদয়নারায়ণের বিদ্রোহের মতন বড় আকারের জমিদার-বিদ্রোহ ছিল অষ্টাদশ শতকের বাংলার ইতিহাসের বিরল ঘটনা। একদম প্রাথমিক পর্যায়েই *জমিদার* কিংবা তাঁর একটু ওপরের স্তরের কর্মচারী ফৌজদারেরা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতেন বলে খুব কম ক্ষেত্রেই স্থানীয় বিক্ষোভ নিয়ে মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে বিচলিত হতে হোত। মোগল আমলেও পীড়ন, শোষণ ছিল, কিন্তু নীচের তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা তখন কদাচিৎ দেখা গিয়েছিল। জমিদারদের পেষণ ক্ষমতায় দলিত কৃষক নিজের শ্রেণী ঐক্য ও সঙ্ঘশক্তিকে জাগ্রত করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। যখন পারত তখন তার অপ্রতিরোধ্য শক্তি জমিদারের দুর্ভেদ্য ক্ষমতার বাতাবরণ ভেদ করে রাষ্ট্রের নিপীড়নকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করত। সেটি ছিল বিরল ঘটনা। ফলে অরাজকতার উত্থান তখন হয়নি।

(২) অরাজকতার পুনর্বিচার

এই কথা মেনে নিলে ইংরেজরা যাকে বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন সেই অরাজকতার সম্বন্ধে পুনর্বিচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। নীচে ইংরেজের সরকারী নথি থেকে দু'একটা অংশ উদ্ধৃত করে আমরা দেখব এই সময়কার অরাজকতা সম্বন্ধে ইংরেজদের যুক্তি কী ছিল। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ দস্যুদের সম্বন্ধে কোর্ট অফ সার্কিট তার অভিমত, যা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল, প্রকাশ করার ছ'মাস পরে এডওয়ার্ড বেবার মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের জমিদারদের সম্বন্ধে কলকাতা কাউন্সিলকে লিখেছিলেন ঃ

"এইসব জমিদারেরা হলেন অবাধ লুণ্ঠনকারী (mere freebooters) মাত্র যাঁরা তাঁদের প্রতিবেশীদের এবং একে অন্যের ওপর লুঠতরাজ চালান আর তাঁদের প্রজারা হোল দস্যুকুল (banditti) যাদের তাঁরা মূলত এইসব গর্হিত কাজের জন্যই নিয়োগ করেন — এইসব লুণ্ঠন কার্য জমিদার ও তাঁর প্রজাদের সবসময় সশস্ত্র রাখে কারণ তাঁদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা শস্য সংগ্রহের পর নিজেদের সম্পদ রক্ষা বা প্রতিবেশীদের আক্রমণ করার জন্য রায়তদের ডেকে পাঠান না — আমি বলতে পারি যে এই সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতার ফলে রাজস্ব খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে — জমিদারেরা হয়েছিল দুর্দান্ত আর প্রজারা দুর্বিনীত আর অবাধ্য"।[২]

এটাই ছিল ১৭৭০-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ঠিক পরবর্তী সময়। জমিদারদের পারস্পরিক সংগ্রাম ও একের দ্বারা অন্যের এলাকা লুণ্ঠনের ফলে রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছিল এই সময়ে। এটাই কোম্পানীর শাসনকে গভীরভাবে আঘাত করছিল। কোম্পানী এর অনেক আগে থেকেই মেদিনীপুরের রাজস্বকে চাঙ্গা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছিল।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বরের চিঠিতে কোম্পানী মন্তব্য করেছিল ঃ

"ভাতার জন্য আমাদের কর্মচারীদের রাজার ওপর নির্ভরশীল রাখাটা আমাদের কাজের

প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং অবমাননাকর, কোম্পানীকে তাদের রাজস্বের একটা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া অন্য কোন আলোকে একে আমরা দেখতে পারি না, কারণ রাজাকে যদি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কিছু আমাদের কর্মচারীদের দিতে না হোত তবে তিনি তাঁর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের সঙ্গে ঐ পরিমাণ অর্থ (সরকারকে) দিতে পারতেন। কাজেই আমরা আদেশ দিচ্ছি যে কোম্পানীর কাছে প্রদেশ হস্তান্তরিত হওয়ার সময় থেকে সেখানে নিযুক্ত কোম্পানীর যে সকল কর্মচারীরা আছেন তারা রাজার কাছ থেকে যা পেয়ে থাকেন তা আমাদের তহবিলে ফেরত দেবেন।"[৩]

(৩) রাজস্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অরাজকতার বিচার

আইন-শৃঙ্খলা কিংবা মানুষের দুঃখ-কষ্ট নয়, রাজস্ব ক্ষতির দৃষ্টিকোণ থেকেই কোম্পানী-প্রশাসন সে সময়কার অরাজকতাকে দেখেছিলেন। রাজস্বের জন্য কোম্পানীর উদ্বেগের কারণে একে রাজস্বের বিচারে অরাজকতা বলা যেতে পারে। সে সময় মেদিনীপুরে যা ঘটেছিল তার প্রেক্ষাপটে এটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রায় এই সময়ে অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ একটা রেসিডেন্সি মেদিনীপুরে রাখা হয়েছিল ঃ[৪]

প্রধান (Chief)	মাসিক ৩,০০০ টাকা
দ্বিতীয়	মাসিক ১,৫০০ টাকা
তৃতীয়	মাসিক ১,৩০০ টাকা
সামরিক অফিসার	মাসিক ৫০০ টাকা

বছরের ৭৫,০০০ টাকার এই ব্যয় মেদিনীপুরের রাজার রাজস্বের ওপর চেপেছিল।[৫] মেদিনীপুর কখনোই কোম্পানীর ভাল রাজস্বপ্রদানকারী অঞ্চল ছিল না। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে কাশিজোড়ার রাজার কাছে প্রায় ৬০,০০০ টাকার রাজস্ব বকেয়া পড়ে ছিল।[৬] মেদিনীপুরের *জমিদারের* অবস্থাও ছিল খুবই শোচনীয় ঃ

"সে সময় মেদিনীপুর জমিদারির রাজস্ব নগদ অর্থের বদলে শস্যের মাধ্যমে আদায় হোত, অর্থাৎ রায়তরা তাদের জমির উৎপন্ন শস্যের একাংশের সাহায্যে জমিদারের খাজনা মেটাত, পাইকান জমির অধিকারী পাইকরা যথাযথভাবে তাদের নির্দিষ্ট খাজনা দিত না। এই অবস্থায় রানীর (মেদিনীপুরের) পক্ষে রায়তদের কাছ থেকে সরকারকে দেয় রাজস্বটুকু আদায় করাও দুঃসাধ্য ছিল। এই সব বিষয়ের কথা বিবেচনা করে সরকার জমিদারির ওপর ধার্য রাজস্বকে ১,১১,৭৯৭-৮-৮ টাকা থেকে কমিয়ে ৮৫,০০০ টাকা করেছিলেন।"[৭]

গোড়া থেকেই কোম্পানী-প্রশাসন মেদিনীপুরের রাজস্ব সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরে গ্রাহামকে ভেরেলস্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন "মেদিনীপুর ও জালাসোর (জলেশ্বর) অঞ্চলের জমির সম্পূর্ণ ও যথাযথ মূল্য নির্ধারণের জন্য জমিদারদের ব্যক্তিগত হিসাব পরীক্ষায় বিচক্ষণ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে যার জন্য আপনাকে বিভিন্ন পরগণা সফর করতে হবে কারণ নির্দিষ্ট অঞ্চলে আপনার উপস্থিতি আরো বেশী করে উদ্দেশ্যের

তাৎক্ষণিক ফল দেবে"।[৮] চার-পাঁচ বছর আগে মীরকাশিম যখন সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন তখন মোগল সরকার জমিদারদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তবে তখনও জমিদারদের ব্যক্তিগত হিসাব পরীক্ষার জন্য কোনরকম চেষ্টা করা হয়নি। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় জমিদারদের চাপ দিয়ে অর্থ আদায় করা আর সেই উদ্দেশ্যেই রামনাথ ভাদুড়ীকে তিনি দিনাজপুরে পাঠিয়েছিলেন। সে সময়ে ছোট ছোট জমিদাররা নাকাল হননি যা এখন কোম্পানীর আমলে হচ্ছেন। ছোট ছোট জমিদারদের ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর অবৈধ সরকারী হস্তক্ষেপ আগে কখনো হয়নি। সাধারণ জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বারে এসে থেমে যেত রাষ্ট্রের চাপ। রাজস্ব প্রদানই ছিল কোম্পানীর মূল বিবেচ্য বিষয়, তাই জমিদারদের পাবস্পরিক বিবাদ ও তাঁদের পতাকাতলে যুদ্ধার্থে রায়তদের সমাবেশ জেলার রাজস্ব ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেওয়ায় কোম্পানীর প্রশাসকেরা প্রচণ্ড অসুবিধার মুখে পড়েছিলেন। এই রাজস্ব ক্ষমতার বিনাশকেই ইংরেজরা প্রাচ্যদেশীয় অরাজকতার মূল বিষয় হিসাবে দেখেছিলেন। আর সেজন্যই দেওয়ানীলাভের ঠিক পরবর্তী পর্বে জমিদারগণ কর্তৃক একে অন্যের অঞ্চল আক্রমণের অসংখ্য উদাহরণ আমরা সরকারী নথিপত্রে দেখতে পাই। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে ফার্গুসন প্রতিবেশী অঞ্চলের ওপর বিষ্ণুপুরের রাজার আক্রমণের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। ঘাটশীলার জমিদারের কুজঙ্গ (Cudjung) আক্রমণের কথাও তিনি বলেছেন। ১৭৬৭-তে ফার্গুসন লিখেছিলেন ঃ "... বর্তমানে তাঁদের (মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশের জমিদারদের) এলাকা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে এবং তাঁদের একের ওপর অন্যের ডাকাতি এবং পূর্বতন রাজস্ব সংগ্রাহক টোডরমলের পীড়নের ফলে অনেকেরই সত্যিসত্যিই বেশী পরিমাণ রাজস্ব দেবার ক্ষমতা নেই"।[৯] ভ্যান্সিটার্টকে লেখা অন্য এক চিঠিতে ফার্গুসন জানিয়েছিলেন যে, আমেনগরের (আমনগরের) জমিদার তাঁর এলাকায় বিষ্ণুপুর থেকে পরিচালিত আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁর কাছে বারবার নালিশ জানিয়েছিলেন।[৯ক] সুতরাং জমিদারদের একের অন্যের ওপর ডাকাতি এবং রাজস্ব ক্ষতি এই সময়কার ইংরেজের নথিপত্রের দুটো অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। একই বছরে গ্রাহামকে লেখা অন্য আর একটা চিঠিতে বলা হয়েছিল ঃ "তাঁদের (জমিদারদের) মনে ভীতি উদ্রেকের জন্য তাঁদের নিকটবর্তী অঞ্চলে সামরিক বাহিনী মোতায়েন না থাকলে তাঁদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়াবে"। এইভাবেই রাজস্ব আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের মতন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রাজস্ব নিয়ে মোগলরা খুব বেশী মাথা ঘামান নি। জঙ্গী জমিদারদের মারদাঙ্গা করার মনোভাবকে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন কারণ মোগলদের ধারণানুযায়ী মারাঠাদের মতন বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এইসব জমিদারেরাই ছিলেন সবথেকে বড় প্রতিরোধ শক্তি ঃ

"জেলা হস্তান্তরকালে জমিদারদের বহু শক্ত ঘাঁটি ছিল যা তখন এবং আজও গড় (দুর্গ) নামে মর্যাদা পেয়ে থাকে। মোগল শাসকদের দুর্বলতায় মেদিনীপুর ও হিজিল্লী (হিজলি) সব সময়ে তাঁদের জঙ্গল ও প্রতিবেশী মারাঠাদের আক্রমণের মুখে পড়তে হোত এই যুক্তিতে ঐগুলির অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়;ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য ... বড় বড় জমিদারদের কাছে একটা শক্ত ঘাঁটি সবসময়ই অপরিহার্য ছিল।"[১১]

ইংরেজদের মেদিনীপুরের কর্তৃত্বলাভের সময় তাঁদের দুর্গ[১২] আর লড়াই প্রবণতার চরিতার্থতা-য় প্রজারাই ছিল সেখানকার অবাধ্য জমিদারদের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। মেদিনীপুর থেকে পাওয়া রিপোর্টেই এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ঃ

"আমাদের সঠিক তথ্যানুযায়ী ঐসব জমিদারদের কারুরই তাঁদের পরগণায় ২,০০০-এর কম লোক নেই যাদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা।"[১৩]

এইসব জমিদারদের দূর্গ কমাবার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ ছিল ঃ "যতশীঘ্র সম্ভব পশ্চিমদিককার জমিদারদের শক্তিহ্রাসের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে এবং তাঁদের দূর্গগুলো (অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য যেগুলোকে আপনি প্রয়োজনীয় মনে করবেন সেগুলো ছাড়া) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতেই হবে।"[১৪]

যেসব বিষয়কে ইংরাজরা বাংলার অরাজকতা আখ্যা দিয়েছিলেন সেগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য এসবই ছিল তাদের প্রাথমিক পর্বের প্রয়াস।

(৪) অরাজকতা বিষয়ক দু'টি ধারণা

অরাজকতা বিষয়ক দু'টি পরিপূর্ণ ধারণা ইংরেজের নথিতে খুব বেশী রকম গুরুত্ব পেয়েছিল ঃ সাধারণ লুণ্ঠন বৃত্তির জন্য জমিদার ও রায়তদের মধ্যে ঐক্য এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের সাহায্যে নিজেকে ধনশালী করার উদ্দেশ্যে এক জমিদারের সঙ্গে আর এক জমিদারের বিরামহীন সংগ্রাম। অথচ নিশ্চিতভাবেই এটা সে সময়কার সাধারণ বিষয় ছিল না। মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকালে দু'ধরনের জমিদার ফার্গুসনের চোখে পড়েছিল। একদল জমিদারেরা সবসময়ই "একটা যুক্তিগ্রাহ্য আশঙ্কায় ভুগতেন যে তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে ছেড়ে যাবে।" আর একদল জমিদার ছিলেন যাঁদের "কৃষকেরা ... সম্পূর্ণভাবে জমিদারের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।"[১৫] এর ফলে অবাধ্য জমিদারদের এলাকার মধ্যেও এমন জমি ছিল যেখানে কৃষিকার্য ব্যাহত হোত না। ফার্গুসন নিজেই লিখেছিলেন ঃ "এখনো পর্যন্ত জঙ্গলে আমার দেখা সবথেকে ভাল আবাদী এলাকা হোল রায়পুর পরগণা।"[১৬] অথচ রায়পুরের জমিদার একজন অবাধ্য ব্যক্তি ঃ "রায়পুর ও ফুলকিস্‌মার (ফুলকুসুম) জমিদারেরা তাঁদের বশ্যতা স্বীকারের ব্যাপারকে এড়িয়ে যাবার জন্য পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন।"[১৭] ফার্গুসন লিখেছিলেন ঃ "রায়পুর ও ফুলকিস্‌মার জমিদার এবং শেষোক্তজনের এক ভায়ের সম্বন্ধে আমাকে বলা হয়েছে যে এই তিনজন কোম্পানীকে বছরের কমপক্ষে ৩,০০০ আল্লাহ সিক্কা টাকা দিতে পারে।"[১৮] এই রাজস্ব ক্ষতি কোম্পানী মেনে নিতে পারেনি।

জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার না করার পিছনে অন্য একটা কারণ অর্থাৎ বিদেশী শাসনকে প্রতিরোধ করার তাগিদও কাজ করেছিল। ঘাটশীলার জমিদার ফিরিঙ্গীদের[১৯] আগমনকে প্রতিহত করার জন্য "তাঁর পরগণার সমস্ত প্রবেশ পথে ও অভ্যন্তরগামী জলপথে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন"। যা ছিল "আমাদের পশ্চিমের জঙ্গলসমূহের অন্তর্ভুক্ত প্রধান পরগণা" সেই ঘাটশীলার জমিদার বর্ষাকালে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে

মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ[20] হয়েছিলেন। ১৭৮০-র দশকে লাহাপুর পরগণার জমিদার আশারাম (চৌধুরী) "জাগীরের (সাহবন্দরের) সীমানার একটা বড় অংশ তাঁর নিজের পরগণার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন"। ইংরেজরা একজন "মুৎসুদ্দিকে জমিদারের কাছে পাঠিয়েছিলেন যিনি তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি কিন্তু গোপনে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধ্য না হলে তিনি তা কখনোই ছাড়বেন না ..."।[21] এই আশারাম প্রতিদিন তিন মণ করে শষ্য বাজারে পাঠাতেন এবং এর থেকেই জেলাসোরের (জলেশ্বরের) সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী সংগ্রহ করতেন। আশারাম এটা বন্ধ করে দেওয়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিপদে পড়েছিলেন। ইংরেজের শোষণ ও দমন নীতির বিরুদ্ধে বনিয়াদি পর্যায়ে এটাই ছিল এক ধরনের প্রতিরোধ এবং সেই সঙ্গে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস। ঘাটশীলার রাজার অবাধ্যতার সমুচিত জবাব দেবার জন্য সৈন্য-পরিচালনা করা হলেও আশারামের ক্ষেত্রে একবছর আটক কিংবা জরিমানা ধার্য করে তা করা হয়েছিল।[23] আলোচ্যসময়ে জমিদারদের মধ্যেকার আত্মসংহারক যুদ্ধবিগ্রহ অরাজকতার একমাত্র দিক ছিল না যার প্রতি ইংরেজমন এত স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। কোম্পানীর শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং অবাধ্যতা, মেদিনীপুরের জমিদারদের মধ্যে যা ইংরেজরা খুব বেশী মাত্রায় লক্ষ্য করেছিলেন, একই রকম ভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হোত। ইংরেজের নথিতে আমরা দেখি আশারাম চৌধুরী যে শুধুমাত্র দখল করা জমি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন তা-ই নয়, ইংরেজদের কাছ থেকে দান হিসাবে রামবদরপুরের তালুকদারি নিতেও রাজী হননি।[24] কখনো কখনো কোম্পানীর অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার জন্য মারাঠাদের সাহায্যও চাওয়া হোত। এইভাবেই মেদিনীপুরের জমিদারির দাবীদার একজন যুগলচরণ মারাঠাদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেখানকার ইংরেজ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।[25]

মেদিনীপুরের জমিদারেরা যে ভুঁইফোড় ছিলেন না ১৭৬৫-তেই কোম্পানীর প্রশাসন তো উপলব্ধি করেছিলেন ঃ "জমির কোন অংশই কৃষকদের অধিকারভুক্ত নয়, সমস্তটাই পূর্বপুরুষদের পাওয়া মূল সনদ থেকে প্রাপ্ত অধিকার বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারদের দখলে রয়েছে।"[26] আপন আপন এলাকায় এই ধরনের জমিদারেরা শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রাম-সমাজে তাঁদের শিকড় ছিল গভীর। ইংরেজরা এঁদের মধ্যে বিরুদ্ধ আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন। এঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতেন কিংবা প্রতিবেশীর এলাকাতে লুঠ করতেন। প্রজাদের সমর্থন পেলে এঁরা ভীষণ রকম সরকার বিমুখ ও দুর্দান্ত হয়ে উঠতেন। তাঁরা তাঁদের প্রজাদের বিরোধী করে তুললে এলাকার চিত্র পাল্টে গিয়ে তা বসতিহীন উষর রূপ নিত। তবে এইসব পরিস্থিতিগুলোর কোনটাই অবশ্য ইংরেজদের পক্ষে সুখকর ছিল না। কারণ উপরিউক্ত কোন পরিস্থিতিতেই এইসব জমিদারদের এলাকাগুলো কোম্পানীর উন্নতিশীল, সুস্থিত, রাজস্বপ্রদানকারী এলাকা হিসাবে বিবেচিত হোত না। বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিককার বছরগুলোতে রাজস্বের ওপর প্রভাব ফেলে এমন যে-কোন পরিস্থিতিকেই অরাজকতা আখ্যা দেওয়া হোত। এইসব জমিদারদের কাছ থেকে পাওয়া বার্ষিক রাজস্বে ইংরেজরা খুশী হলে তাঁরা আর অরাজকতা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। এইসব জমিদারদের ক্ষেত্রে মোগলেরা অন্তত এটাই করতেন ঃ

"বাংলায় মুসলমান অধিকারের গোড়ার দিককার বছরগুলোতে অনুগত থাকার এবং সরকারকে রাজস্বদানের প্রতিশ্রুতিতে বিষ্ণুপুর, পাচেৎ, ত্রিপুরা ও কুচবিহারের মতন সীমান্ত অঞ্চলের রাজাদের জমিদারি শাসকেরা তাঁদের হাতেই রেখে দিয়েছিলেন।"[২৭]

অথবা

"আমাদের (আলোচ্য) সময়ে (ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে) বিষ্ণুপুর, বীরভূম, পাচেৎ ও ত্রিপুরার রাজাদের এলাকা ঘন জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের দ্বারা সুরক্ষিত থাকার জন্য মোগল শক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। সীমান্ত এলাকার প্রধান হিসাবে সীমান্ত রক্ষায় তাঁদের এতই গুরুত্ব ছিল যে মোগল নবাবরা তাঁদের সঙ্গে প্রজার বদলে মিত্রের মতন আচরণ করতেন।"[২৮]

(৫) সম্পূর্ণ অধীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ

এইসব জমিদারদের পুরোপুরি অধীনে আনার ইংরেজের নীতিই তাঁদের ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল। এমন কি ইংরেজরা যখন নিজেদেরই লোকজনকে বসিয়েছিলেন তখনো তাঁরা হতবাক হয়ে দেখছিলেন যে বছর কয়েকের মধ্যেই তাঁরাও তাঁদের প্রভুদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। ঘাটশীলার রাজার ঘটনাটা এরই একটা উদাহরণ। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে একজন কুনু ডালিকে (কানু ঢালি) ঘাটশীলার জমিদারি দেওয়া হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, কোন ব্যক্তি জমিদারি পেলে তাঁর নাম পাল্টে যেত। এইভাবে কুনুডালিও (কানু ঢালিও) জমিদার হবার পর জগন্নাত ডাল (জগন্নাথ ঢাল) হন। ঘাটশীলার জমিদারি নিয়ে এই মানুষটি নিশ্চিতভাবেই ইংরেজদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন। কারণ সেখানকার প্রকৃত জমিদারকে দমন করার পর সে অঞ্চলের কোন মানুষই ইংরেজদের কাছ থেকে এই জমিদারি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না ঃ

"আমাদের মেদিনীপুরের জমিদারেরা সকলেই বলেন যে, তাঁরা অঞ্চলটি নেবেন না (অর্থাৎ ইংরেজদের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করবেন না), ফলে বিকল্প পথ একটাই থাকে ... অন্য নতুন অধীনস্থদের ভয় দেখিয়ে বশে আনার নীতি অনুসারে তাঁদের অঞ্চলের দুর্গ ভেঙ্গে দেওয়া এবং অঞ্চলটি অগ্নিসাৎ ও ধ্বংস করা।"[২৯]

কানুঢালি অর্থাৎ এখনকার জগন্নাথ ঢালের বার্ষিক রাজস্ব ধার্য হয়েছিল ৫,৫০০ টাকা। বন্দোবস্তের সময় "উপস্থিত প্রধানরা" তাঁদের "তাকসিম জুম্মা" (জমা) অত্যন্ত বেশী বলে তাতে সম্মতি দিতে পারেন নি। তবে নতুন জমিদার পেয়ে ইংরেজরা কিন্তু খুশী হয়েছিলেন এবং জমিদারি দেবার সময় তাঁকে একটা "ঘোড়া, তলোয়ার, দামামা এবং অন্যান্য নানান জিনিষপত্র" দিয়েছিলেন।[৩১] রায়তদের ওপর কিছুটা প্রভাব ছিল এমন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উপঢৌকন দিয়ে রায়তদেরও বন্দী হিসাবে মেদিনীপুরে পাঠনো ও শান্ত করার চেষ্টা হয়েছিল।[৩৩] পুরানো জমিদারকে বন্দী করে মেনদিনীপুরে পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কোম্পানী আশা করেছিল যে, জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে তারা ৫,০০০ টাকা পাবেন। তাঁর চারটি ঘোড়া ও তিনটি ঘোটকী ছিল। এর থেকে একটা ঘোড়া নতুন জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল।[৩৪]

ইনিই তাহলে ছিলেন সেই নতুন জমিদার ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী যাঁকে ঘাটশীলার জমিদারিতে বসিয়েছিলেন। এর ঠিক সাত বছর পরে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের কোম্পানী-প্রশাসন এই জগন্নাথ ঢালের সম্বন্ধেই এক অত্যন্ত তিক্ত রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন ঃ

"আজ পর্যন্ত আমি এই জেলার জমিদারের কাছ থেকে ঐ রাজার (ঘাটশীলার রাজার) লোকজনের প্রায় নিত্য প্রর্দশিত ঔদ্ধত্য ও বর্বরতা সম্বন্ধে অসংখ্য অভিযোগ বারবার পেয়েছি।"[৩৪ক] এক মাস যাওয়ার আগেই জগন্নাথ ঢালের সম্বন্ধে আরো তিক্ত রিপোর্ট ঘাটশীলা থেকে এসেছিল ঃ "জগরনাত ডালকে (জগন্নাথ ঢালকে) দমন না করা পর্যন্ত ... সৌরবানরিকা (সুবর্ণরেখা) নদীর এদিক থেকে মাননীয় কোম্পানী কখনোই এক আনাও পাবেন না।"[৩৫] এইভাবেই মেদিনীপুরে ইংরেজের নতুন জমিদার নিয়োগের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

(৬) বিদ্রোহ

জগন্নাথ ঢালের বিদ্রোহের সঙ্গে ময়নাচৌরার রাজা নামে মেদিনীপুরের আর একজন বিখ্যাত রাজার বিদ্রোহের মিল পাওয়া যায়। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে থেকে এই রাজা ও কোম্পানীর মধ্যে এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। রাজা রাজস্বপ্রদানে তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানী তাঁর কথায় বিশ্বাস করেনি। ১৭৬৭ খ্রীঃ রাজা ভান্সিটার্টকে লিখেছিলেন ঃ

"এ বছর উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয়নি, চাষের সময় খানিকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যাইহোক, সারাটা কালের মধ্যে এখন কিছুটা বৃষ্টি নেমেছে। চাষের জন্য একমাস সময় আছে। আমি তাই রায়তদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রাম থেকে গ্রামে, কুটির থেকে কুটিরে ঘুরছি যদিও তা সত্ত্বেও এখানে সেখানে সামান্য কিছু এলাকা ছাড়া পরগণায় পুরোপুরি চাষের সম্ভাবনা নেই। ফলে আমি ভীষণ দুর্দশার মধ্যে পড়েছি। আমার খাওয়ার কিংবা ঘুমাবার সময় নেই। একদিন, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই এবং তখন আমি উপস্থিত থেকে চাষ আবাদ ও বাঁধ নির্মাণের তদারক না করলে পুরো বছরটাই এভাবে নষ্ট হয়ে যেত।"[৩৬]

রাজার এই চিঠির বিষয়ে ভান্সিটার্ট মন্তব্য করেছিলেন ঃ "এই চিঠি লেখার সময় রাজা তাঁর দুর্গে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করছিলেন। না তিনি মেদিনীপুরের দিকে গিয়েছিলেন, না রায়তদের কৃষিকাজে উৎসাহিত করার ব্যাপারে এক পা এগিয়েছিলেন। বাঁধ দেবার সমস্ত সময়টাই চলে গিয়েছে এবং পরগণার প্রায় সর্বত্রই ধান বোনা হয়ে গিয়েছে, কাজেই প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একথা প্রায় সবটাই মিথ্যায় ভরা।"[৩৮]

রাজার উপরিউক্ত চিঠির উত্তরে ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুলাই ভান্সিটার্ট তাঁকে একটা কড়া চিঠি লিখেছিলেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ফলে রাজা সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। ১৭৬৭-র ২৩শে জুলাই তিনি ভান্সির্টাটকে লিখেছিলেন ঃ

"আমার আগের চিঠি থেকে আপনি আমার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা জানতে পেরেছেন, আন্তরিকভাবেই কোম্পানীর রাজস্ব প্রদানে ইচ্ছুক আমি ঐ উদ্দেশ্যে (কৃষকের খাজনা) ...থেকে সংগৃহীত অর্থকেই শুধু কাজে লাগিয়েছি তাই নয় ... আমার গৃহস্থালির জিনিষ ও আসবাবপত্র

বিক্রি করেছি এবং বেশকিছু পরিমাণ অর্থ ঋণও করেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং যেমন আমি জানি তার থেকেও বেশী অনুগ্রহ দেখিয়েছেন (ছিঁড়ে গিয়েছে) ... এসত্ত্বেও পাওনার বকেয়া অংশ (দেওয়ার) ... কোন সঙ্গতি আমার ছিল না ... এ বছর 'হালবানজান'[৩৯] আদায় করা যায়নি। আমার এই দুর্গতি অবস্থার মাঝে আপনি একজন তহশীলদার, কিছু সিপাই আর পিয়ন পাঠিয়েছেন। কাজেই আমার সম্মান বাঁচাতে আমি অবশিষ্ট জিনিষপত্র ও লোকজন নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি।"[৪০]

অর্থসংগ্রহের জন্য রাজার কলকাতা যাত্রা সম্বন্ধে ভান্সিটার্ট নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন : "ময়নাচৌরার রাজা মেদিনীপুরে যাওয়ার জন্য আমার আদেশ দু'বার অগ্রাহ্য করেছেন ... তাঁকে জোরকরে ধরে আনার জন্য আমি একদল সিপাই পাঠিয়েছিলাম। এতে করে নিজের টাসকিস পূরণ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন এমন কথা তিনি বললেও আমার ধারণানুযায়ী মেদিনীপুরে নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পুরানো পরিকল্পনাকেই তিনি নতুনভাবে চিন্তা করেছিলেন।"[৪১] এসব কিছুর আগে রাজা মেদিনীপুরে অর্থসংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেও সফল হননি। এ বিষয়ে রাজার বক্তব্যটা ছিল সেইরকম :

"কোম্পানীর রাজস্ব প্রদানের জন্য আমি আমার সামর্থের শেষটুকু পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছি। পরগণা থেকে সকল রকম আদায় ছাড়াও আমি কোম্পানী, ফৌজদার, ক্যাপ্টেন দ্যু গ্লোস এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি কিন্তু তবুও আমি তা দিতে পারিনি। সেজন্য ল্যামর্বার্টের বেনিয়ান কিষাণ চরণ ঠাকুরের কাছে আমি আমার জমি বন্ধক রেখেছি।"[৪২]

রাজা ও ল্যামবার্টের বেনিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ, রাজা ল্যামবার্টকে জানান নি। ল্যামবার্ট তাই ভান্সিটার্টকে লিখেছিলেন : "... গোমস্তার উপস্থিতিতে আমি তাঁর (রাজার) সম্পর্কে তদন্ত করে কর্মপরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য কিনা দেখতে পারি..."[৪৩] ভান্সিটার্টের উত্তর ছিল খুবই কঠোর : "... এটা এমনই পরিকল্পনা যা বাস্তবায়িত হতে পারে না।"[৪৪]

জমিদারদের ওপর এধরনের অবিশ্বাসের যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি ছিল এইরকম :

"... যদি রাজা তাঁর জমিদারির পরিচালন ক্ষমতা ছেড়ে দেবার কথা ভেবে থাকেন তবে অন্যকে অধিকার হস্তান্তরে অনুমতি দেওয়ার বদলে কোম্পানী বোধ হয় তা তাঁদের নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়াকেই পছন্দ করবে।"[৪৫]

কোম্পানী জানত যে একজন জমিদার যখন বাধ্য হয়ে জমিদারি ছেড়ে দিতেন তখন নতুন করে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আর একজনকেও পাওয়া যেত না। ঘাটশীলায় তাদের এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। আর তাই এ অবস্থায় জমিদারিগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নেওয়ার কথা চিন্তা করা ছাড়া তাঁদের অন্য কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের কোন বেনিয়াকে জমিদারির বা পত্তনির অধিকার দানেও তাঁদের আপত্তি ছিল। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী কোর্টকে লেখা এক পত্রে কোম্পানীর কর্মচারীদের ওপর বেনিয়ানদের কর্তৃত্বলাভের বিরুদ্ধে কলকাতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। একজন

জমিদারের সঙ্গে বেসরকারী বেনিয়ানদের সম্পর্ককে কোম্পানী ভালচোখে দেখতেন না। তাঁদের ধারণানুযায়ী এসবই ছিল রাজস্বকে কোম্পানীর দৃষ্টির আড়ালে রাখার কৌশলমাত্র। ময়নাচৌরার রাজা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না। কিন্তু তাঁর রাজস্ব না দেওয়াটাই কোম্পানী কোনভাবেই মেনে নিতে রাজী ছিলেন না, তা এক ধরনের বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হয়েছিল ঃ

"এই মানুষটির বিদ্রোহ ও উদ্ধত স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে এবং এই বিশ্রী প্রবণতা ও স্বভাবের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তিনি তাঁর জমিদারি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎখাত হবেন, অধিকন্তু জনসাধারণের সামনে নজির হিসাবে তাঁর পরিবারকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং সর্বোচ্চ নজরানার জন্য বিক্রি করা হবে।"[৪৬]

জমিদারদের উৎখাত করাটা কোম্পানীর কাছে কোন নতুন ব্যাপার ছিল না। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগণার জমিদারেরা অধিকারচ্যুত হয়েছিলেন। এমন কি মেদিনীপুরের ছোট ছোট জমিদারেরাও অধিকারচ্যুত হয়েছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীঃ ভান্সিটার্ট কালেক্টর জেনারেলকে লিখেছিলেন ঃ "কাজেই তাঁদের সমর্থনের বিনিময়ে এইসব জমিদারদের আমি জাগির দান করেছি এবং জেলার পরিচালন কার্য থেকে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছি।"[৪৭] ঘাটশীলার প্রকৃত জমিদারকেও কোম্পানী সরিয়ে দিয়েছিলেন। একটা নথিতে বেশ জোর দিয়েছ বলা হয়েছিল যে, আত্মগোপনকারী জমিদারকে ইংরেজ যে শুধু অধিকারচ্যুতই করেছিল তা-ই নয় তাঁর রায়তদেরও তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল ঃ

"(ঘাটশীলার) দুর্গের অধিকারলাভের সময় থেকে আমি গ্রামের মানুষকে বিদ্রোহী জমিদারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং কোথায় তিনি আত্মগোপন করে আছেন সেই খবর জানার জন্য আমার সমস্ত সময়কে কাজে লাগিয়েছিলাম। এতে আমি এতই সফল হয়েছিলাম যে তিনি যে শুধু তাঁর নিজের মানুষজনের একটা বড় অংশ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন তা-ই নয়, তিনি যে কোথায় আছেন তার সঠিক খবরও আমি পেয়েছিলাম ..."[৪৮]

বাংলাদেশে অরাজকতার অন্যতম উপাদান জমিদার রায়ত ঐক্যকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এ ছিল এক অত্যন্ত সফল পদক্ষেপ। যুক্তিশীল বিচারে এ ধরনের ঐক্য একজন ক্ষুদ্র জমিদার ও তাঁর প্রজারা যেখানে পরস্পরনির্ভর জীবন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করে এমন এক পশ্চাৎপদ ও কৃষিভিত্তিক জীবনের যোগসূত্রকেই নির্দেশ করে। ইংরেজের লক্ষ্য ছিল ঐসব বন্ধনকে ধ্বংস করা যা ছাড়া স্থায়ীত্ব লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত কোন প্রয়াসই সফল হতে পারত না।

জমিদার ও কৃষকের গ্রাম্য বন্ধনের নিবিড়তাকে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজরা বুঝতে পারেনি। পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার রশিতে অসংখ্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বন্ধন পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছিল গ্রাম জীবনের দুই সঙ্গীকে, পালক ও সেবক, শাসক ও আশ্রিত, শোষক ও উৎপাদক — শেষপর্যন্ত জমিদার ও কৃষক। ইংরেজের মুখোমুখি এই দুই সঙ্গী তাদের বৈরিতা ভুলেছিল, গড়ে তুলেছিল ঐক্য — মাত্রাহীন শোষণের বিপরীত দিক থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল তাদের প্রতিরোধের বর্শাফলক। এই প্রতিরোধ ছিল রাষ্ট্রিক অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগঠিত জনসমাজের উদ্বেলিত হিংসা। বাংলার কৃষক আঠারো শতকে কোন বিধিবদ্ধ প্রতিরোধ জানত

না। তাই সমাজের বিধিহীন আক্রোশ সমাজ বিধানের সযত্নলালিত পারিপাট্যকে ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই রকম এক চেষ্টাকেই ইংরেজরা বলত ডাকাতি।

পাঠটীকা

(১) জঙ্গলমহলের বর্ণনা পাওয়া যাবে একটি সমকালীন দলিলে। সেটি হল এডওয়ার্ড বেবারকে লেখা কলকাতা কাউন্সিলের চিঠি, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৩, Mid. Dist. Recds., Vol. IV, p. 106. এছাড়া দ্রষ্টব্য M. V. Bayly, ***Memoranda of Midnapur, Calcutta,*** 1902, p. 2.

(২) তদেব।

(৩) Mid, Dist. Recds., Vol. II, p. 27.

(৪) তদেব।

(৫) তদেব।

(৬) উইলিয়াম আলডারসে-কে লেখা এডওয়ার্ড বেবারের চিঠি, ৭ই জুলাই, ১৭৭২, Mid. Dist. Recds., Vol. II, p. 59.

(৭) Raja Mahendra Lall Khan. ***The History of the Midnapore Raj,*** Calcutta, 1889, pp. 5-6.

(৮) গ্রাহামকে লিখেছেন ভেরেলস্ট, ১৭ই মার্চ, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. 1.

(৯) গ্রাহামকে লিখেছেন ফার্গুসন ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. 1.

(৯ক) ফার্গুসন লিখেছেন ভ্যান্সিটার্টকে, ১৯শে জুলাই, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. II, p. 109.

(১০) গ্রাহামকে লেখা চিঠি (কে লিখেছেন জানা যায়নি), ৬ই মার্চ, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. II, p. 109.

(১১) H. V. Bayley, ***Memoranda of Midnapore***, p. 3.

(১২) Bayley (উপরে উল্লিখত গ্রন্থ) ময়না চৌরার গড় সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়েছেন : "এটি দুটি পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। তাদের একটি জলপূর্ণ, আরেকটি শুকনো। এক সময়ে দুটোই খুব গভীর ও চওড়া ছিল আর তার ভেতরে ভর্তি ছিল কুমীর। যে খালটি গড়ের সামনের দিকে ছিল তার ছিল আরেকটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা — ঘন আচ্ছাদিত বাঁশবন— এত নিবিড় যে তার ভেতর তীর ছোঁড়া যেত না এবং অশ্বারোহীবাহিনী প্রবেশ করতে পারত না। মারাঠাদের প্রধান বাহিনীই ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। এইভাবে ঘেরা যে স্থান তার ভেতরটা ছিল প্রশস্ত এবং সেখানে অনেক বাড়িঘর ছিল। ময়নার জমিদার, তখন জঙ্গলের অন্যান্য জমিদারদের মতন (সরকারের) শান্ত প্রজা ছিল না। যখনই তাঁকে জমির বন্দোবস্ত করতে বা রাজস্ব দিতে বলা হত, তখনই তিনি গড়ের মধ্যে ঢুকে বসে থাকতেন।"

(১৩) গ্রাহামকে লেখা চিঠি, ৬ই মার্চ, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I, p. 109.

(১৪) গ্রাহামকে লেখা ভেরেলস্টের চিঠি, ১৭ই মার্চ, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(১৫) ভ্যান্সিটার্টকে লেখা ফার্গুসনের চিঠি, ২৬শে জানুয়ারি, ১৭৬৮, Mid. Dist. Recds., Vol. I. p. 27.

(১৬) গ্রাহামকে লেখা ফার্গুসনের চিঠি, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(১৭) ফার্গুসনকে লেখা গ্রাহামের চিঠি, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(১৮) গ্রাহামকে লেখা ফার্গুসনের চিঠি, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I, ".... রায়পুর, ফুলকিসম (ফুলকুসুম) এবং পরের ব্যক্তিটির এক ভাই যারা এই থানার (বলরামপুর) একটা বড় অংশ দখল করে আছে অথচ নিজেদের বলছে বাংলাওয়ালা (অর্থাৎ বাঙালী)" — গ্রাহামকে লেখা ফার্গুসনের চিঠি, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(১৯) ফার্গুসনকে লেখা গ্রাহামের চিঠি, ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(২০) বেচারকে লেখা ভ্যান্সিটার্টের চিঠি. ১লা জুন, ১৭৬৮, Mid. Dist. Recds., Vol. II.

(২১) জন ডাইনলি এস্কোয়ারের চিঠির সংলগ্ন কাগজ, কলকাতা ১৩ই অক্টোবর. ১৭৮৩, *MR*. (J. C. Sengupta), p. 134.

(২২) কালেক্টর কসবি বারোসকে লেখা লেফটেন্যান্ট এ. অ্যাডামসের চিঠি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২, *MR*. p. 408.

(২৩) মেদিনীপুরের কালেক্টর কসবি অ্যাডামসকে বোর্ড অফ রেভেনিউ ২৫শে মে, ১৭৯২ সালে লিখেছিলেন ঃ "আশারাম চৌধুরীর বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য আমরা চাই যে আপনি তাঁর জমি বন্দোবস্তের সময়েই বিক্রী করে দেবেন — যেটুকু দরকার তাই দেবেন। তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য অতিরিক্ত শাস্তি হিসাবে আমরা চাই যে ১৭৮৭ সালের ৮ই জুনের আইনের ১১ নং ধারা অনুযায়ী আপনি তাঁকে এক মাসের কারাদণ্ড দেবেন অথবা তাঁর উপর অনধিক ২০০ টাকার জরিমানা আরোপ করবেন" — *MR*, p. 493.

(২৪) Mid. Dist. Recds., Vol. III, p. 139. আশারাম চৌধুরী কেন রামবদরপুর (আরেকটি নথি অনুযায়ী রামবদাশোর, কিন্তু রামবদরপুরই হয়ত ঠিক) তালুকদারি নিতে চাননি তার একটা কারণ এই যে এই তালুকটি নিতান্তভাবেই হতশ্রী ও দীন হয়ে পড়েছিল আর

তা নেওয়াটা কোন তালুকদার, ঠিকাদার, জমিদারের পক্ষে লাভজনক ছিল না। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুন স্যামুয়েল লুইস কাউন্সিল অফ রেভেনিউ বা রাজস্ব পর্ষদকে লিখেছিলেন : "রামবদরপুর এতখানি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে-কেঁউই তাকে গ্রহণ করতে (অর্থাৎ বন্দোবস্তে যেতে) এবং মলগুজারি (সেই তালুকের দেয়-রাজস্ব) দিতে সম্মত হচ্ছে না", Mid. Dist. Recds., Vol. IV, p. 137.

(২৫) বেচারকে লেখা ভ্যান্সিটার্টের চিঠি, ১৯শে জুলাই, ১৭৬৮, Mid. Dist. Recds., Vol. I, p. 89.

(২৬) সিলেক্ট কমিটিকে লেখা জন গ্রাহামের চিঠি, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৭৬৫, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(২৭) Anjali Chatterjee, ***Bengal in the Reign of Aurangzib, 1658-1707***, p. 250.

(২৮) অঞ্জলি চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

(২৯) গ্রাহামকে লেখা ফার্গুসনের চিঠি, ২২শে মার্চ, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I, p. 125.

(৩০) ভ্যান্সিটার্টকে লেখা ফার্গুসনের চিঠি, ৯ই এপ্রিল, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I, p. 133.

(৩১) তদেব।

(৩২) তদেব।

(৩৩) তদেব।

(৩৪) তদেব।

(৩৪ক) স্যামুয়েল লুইসকে লেখা সিডনি স্মিথের চিঠি ১০ই এপ্রিল, ১৭৭৪, Mid. Dist. Recds., Vol. III.

(৩৫) স্যামুয়েল লুইসকে লেখা সিডনি স্মিথের চিঠি, ৬ই মে, ১৭৭৪, Mid. Dist. Recds., Vol. III.

(৩৬) ভ্যান্সিটার্টকে লেখা ময়নাচৌরার রাজার চিঠি, ১৮ই জুলাই, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(৩৭) ভ্যান্সিটার্ট মেদিনীপুরের রাজাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন — রাজাকে লেখা ভ্যান্সিটার্টের চিঠি, ১২ই জুলাই, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. II. রাজা এই নির্দেশ এড়িয়ে গেছিলেন।

(৩৮) Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(৩৯) হালভঞ্জন (ইংরাজ দলিলে Halbanjun) হল পরবর্তী বছরে কৃষকের কাছ থেকে প্রাপ্য খাজনার কিছু অংশ অগ্রিম নিয়ে নেওয়া।

(৪০) ভ্যান্সিটার্টকে লেখা ময়নাচৌরার রাজার চিঠি, ২৩শে জুলাই, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(৪১) ভেরেলস্টকে লেখা ভ্যান্সিটার্টের চিঠি, ৩রা আগস্ট, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(৪২) জগুরাম দত্তকে (অন্যত্র যদুরাম দত্ত নামটি পাওয়া যায়) লেখা ময়নাচৌরা রাজার চিঠি, ৮ই জুলাই, ১৭৬৭, Mid, Dist. Recds., Vol. I, p. 170.

(৪৩) ভ্যান্সিটার্টকে লেখা ল্যামবার্টের চিঠি, তারিখহীন, Mid. Dist. Recds., Vol. I, p. 170.

(৪৪) ল্যামবার্টকে লেখা ভ্যান্সিটার্টের চিঠি, ১৩ই জুলাই, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

(৪৫) তদেব।

(৪৬) Mid. Dist. Recds., Vol. III. p. 78.

(৪৭) কালেক্টর জেনারেল জেমস আলেকজান্ডারকে লেখা ভ্যান্সিটার্টের চিঠি, ২৪শে জানুয়ারি, ১৭৬৮, Mid. Dist. Recds.. Vol. I.

(৪৮) ঘাটশীলা গড় থেকে ভ্যান্সিটার্টকে লেখা ফার্গুসনের চিঠি, ২৯শে মার্চ, ১৭৬৭, Mid. Dist. Recds., Vol. I.

ষষ্ঠ অধ্যায়
কলকাতায় ডাকাতি

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর যখন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা কায়েম হল তখন দেশের সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যে নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। শাসকের অর্থগৃধ্নুতা ফলে সরকারের আর্থিক নীতি এক নিঃসীম শোষণের রূপ নিয়েছিল। শাসনব্যবস্থায় বিকৃতি দেখা দিলে সমাজও অনেক সময় বিকৃত পথে তার মোকাবিলা করে। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার তথা সমস্ত বাংলাদেশে যে ডাকাতির নিরঙ্কুশ প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা এই শাসন-বিকৃতিজনিত সামাজিক বিপন্নতার ফল।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই কলকাতায় ডাকাতির বৃদ্ধি হয়। তখন থেকেই কলকাতার ইংরাজ কাউন্সিলের সঙ্গে ইংলন্ডের কোর্ট অফ ডিরেকটরস-এর ডাকাতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে পত্র বিনিময় হত। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩ মার্চ তারিখের লেখা চিঠিতে (১২২ নং অনুচ্ছেদে) কোর্ট অফ ডিরেকটরস স্পষ্ট করে কলকাতা কাউন্সিলকে জানিয়ে দিলেন যে ডাকাতদের মোকাবিলা করতে একটি এনসাইন বা নৌপতাকাসম্বলিত ইউরোপীয় বাহিনী গঠন করতে হবে। তারা রাত দশটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত কলকাতাকে পাহারা দেবে ('an European guard with an Ensign to patrol constantly from ten at night to five in the morning')। বিশেষ করে কলকাতার পশ্চিমদিকে গঙ্গার পাড়ে পাহারা দেবার পরামর্শ হয়ত কোর্ট অফ ডিরেকটরস দিতে চেয়েছিলেন। এর একটি বড় কারণ হল যে ডাকাতরা যাতে নদী পেরিয়ে হাওড়া-হুগলীর দিকে যেতে না পারে। কলকাতা তখন ছিল ইংরাজদের শাসনাধীন অঞ্চল। কলকাতায় দুস্কৃতি করে নদী পেরিয়ে ওপারে চম্পট দেওয়াটা তখন ছিল স্বাভাবিক। হুগলীর ফৌজদার যেমন কলকাতার অধিবাসী কোন মানুষের বিচার করতে পারতেন না ঠিক সেইরকম এপারের ইংরাজ কর্তারাও ফৌজদারের এলাকাভুক্ত কোন মানুষের বিচার করতে অগ্রসর হতেন না। ফলে নদীর এপার ওপারের বহু দুস্কৃতিকারী নিজের কাজ সম্পন্ন করে নদী পেরিয়ে অন্যদিকে সরে পড়ে চমৎকার গা-ঢাকা দিতে পারত। অতএব নৌবাহিনীর লোকজন দিয়ে নদীর তীর সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা করতে থাকেন ইংরাজ কর্তৃপক্ষ।

শুধু নদীর তীরকে সুরক্ষিত রেখে কাজ সমাধান করা সহজ ছিল না। মেদিনীপুর থেকে কলকাতা যাওয়া-আসার সারা পথটা ছিল দস্যু তস্করে ভরা। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরের ফৌজদার কলকাতার গভর্ণরকে চিঠি লিখলেন যে কলকাতা থেকে মেদিনীপুরের সারা পথ এতখানি ডাকতদলে ভরে গেছে যে তিনি বের হতে সাহস করছেন না, পাছে ডাকাতরা তাঁকে হত্যা করে। ঠিক একই সময়ে কলকাতায় ইংরাজ কর্তৃপক্ষের কাছে খবর আসতে থাকে যে কলকাতা আর হুগলীর মাঝে সমস্ত পথই তাদের নিরাপত্তা হারিয়েছে। এমনকি কলকাতা থেকে চোবদার, পিওন নামে যে সব লোক নানাবিধ কাজে হুগলীতে যাতায়াত করছে তারা সরকার নামক কর্তৃপক্ষকে প্রায় লোপাট করে দিয়েছে। তারাই আবার সুযোগ বুঝে নানাবিধ সমাজবিরোধী

কাজে লিপ্ত হচ্ছে। প্রায় একই অবস্থা হয়েছিল কলকাতা থেকে যশোহরে যাওয়ার পথটা। কলকাতার গভর্ণর এবং তাঁর কাউন্সিল আক্ষেপ করতে লাগলেন যে কোন শহরে কোন কোতোয়ালই আর কাজ করছেন না। হুগলীর ফৌজদারকে এই মর্মে চিঠি লেখা হল যে তিনি যেন চন্দননগরের কোতোয়ালকে ডেকে আচ্ছা করে তিরস্কার করে দেন। যশোহরের জমিদারের নায়েব বাবুরাম স্পষ্ট করে কলকাতার কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে কলকাতার পিওন ও সিপাইরা যশোহরে গিয়ে লুঠতরাজে নেমেছে। কলকাতা ও তার পাশের বহু এলাকাকে নিয়ে এক বিরাট অঞ্চলের উপর মনে হতে লাগল ডাকাতরাজ কায়েম হয়েছে। সমস্ত অর্থে এটি একটি ডাকাতরাজই বটে। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড মিন্টো ডাকাতদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে তারা সুচারুভাবে এক নতুন সরকার সারা দেশে কায়েম করেছে। যে সূক্ষ্ম সন্ত্রাসবাদ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদ সেই সন্ত্রাসবাদই তারা এদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। এক একটি ডাকাত দলের সর্দারদের পেছনে ছিল বড় মাপের মদত। তাদের কখন কখন সম্মান জানিয়ে বলা হত 'হাকিম' বা ক্ষমতাশীল শাসক। জনগণ নিজেদের নিরাপত্তা গঠনের জন্য প্রকৃত সরকারকে সাহায্য করত না। জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও সরকারের ছিল না ঃ[১]

এই যদি সারাদেশে ডাকাতদের দাপট হয় তবে কলকাতায়ও তাদের অবস্থা কি ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। হেস্টিংস-এর জীবনীকার গ্লেগ (Gleig) লিখেছেন যে এই সময়ে কলকাতা ছাড়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কোথাও আইন ছিল না, বিচার ছিল না, ব্যক্তির অস্তিত্ব ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা ছিল না। অথচ এই কলকাতার অবস্থা কি ছিল তা বলতে গিয়ে বাস্তিদ (Busteed) লিখেছেন যে হেস্টিংস ও ফ্রান্সিস-এর সময়ে এবং তার অনেক পরেও ডাকাতি ও বড় রাস্তায় দস্যুবৃত্তির মত অপরাধ একেবারে সরকারের মূল দপ্তরের কাছেই ব্যাপকভাবে দেখা যেত।[২]

কলকাতার রাস্তাঘাট ডাকাতে পরিকীর্ণ ছিল। বর্তমান শিয়ালদহর কাছে বৈঠকখানা নামক স্থানে একটি বড় বটগাছ ছিল। সেখানে সেই গাছের চারপাশে দিনের বেলায় 'বেনিয়ান' নামে ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক ও রাজকর্মচারীদের সহযোগী দালাল-গোমস্তা-মুন্সি-তহবিলদাররা বৈঠক বসাত। তার থেকে সেই অঞ্চলের নাম হয়েছে বৈঠকখানা এবং বটগাছের নাম ইংরাজরা দিয়েছিল 'বেনিয়ান ট্রি'। যে ক'টি রাস্তা সেই বৈঠকখানা গাছের দিকে গিয়েছিল সেই সবকটি রাস্তায় সন্ধ্যার পর আর লোক চলাচল করা সম্ভব ছিল না। সন্ধ্যা আটটা থেকে সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণ ডাকাতদের ভয়ে বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়ে যেত এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের মানুষ সন্ত্রস্ত থাকত। ডাকাতরা কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশজনের এক একটি দল করে সমস্ত রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াত।[৩]

কলকাতার ডাকাতরা যে সব কলকাতারই মানুষ ছিল তা নয়। কলকাতার আশেপাশের জেলাগুলির থেকে নিজেদের জীবিকা ও বসতি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষেরা কলকাতায় ডাকাতি করতে আসত। অনেক সময় কলকাতার উপকণ্ঠের কোন অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন জেলার ডাকাতরা ধরা পড়লে তাদের হুগলীর ফৌজদারের আদালতে বিচারের জন্য আনা হত। তারা কেউ কেউ সুযোগ বুঝে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে পলায়ন করে কলকাতার

ডাকাতদলের ভিড়ে মিশে যেত। যাদের এই সৌভাগ্য হত না তারা দণ্ড ভোগ করত। তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের অঙ্গচ্ছেদ করা হত। সেই অবস্থায় তারা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। তখন তাদের পেশা হত ভিক্ষাবৃত্তি। একবার নদীয়ার জেলাশাসক রেডফার্ন (Redfern) কৃষ্ণনগর থেকে চোদ্দজন ডাকাতকে সালকিয়ায় পাঠিয়েছিলেন ফৌজদারি আদালতে বিচারের জন্য। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ক্যালকাটা ক্রনিকল (Calcutta Chronicle) পত্রিকায় এদের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ। চোদ্দজন ডাকাতকে সালকিয়ার ফৌজদারি আদালতে বিচার করার পর দোষী সাব্যস্ত করা হল। কাজীর বিচারে তাদের এই দণ্ড দেওয়া হল যে তাদের প্রত্যেকের ডান হাত ও বাঁ পা কেটে ফেলা হবে। কলকাতার কাছে হাওড়ার দিকে শেয়ার-বাজারে তাদের আনা হল। তারপর হাত-পা-মুখ বেঁধে তাদের মাটিতে ফেলা হল। একটা বাঁকা খাঁড়া দিয়ে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হল। প্রত্যেকের অঙ্গ ঠিক সন্ধির স্থান থেকে কাটা হল এবং এক একটি অঙ্গ কাটতে সময় লাগল প্রায় তিন মিনিট। এইভাবে এক এক করে প্রতিটি অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হল। অতি অপরিচ্ছন্নভাবে এই কাজটি সমাধা করা হল। তারপর অপরাধীদের অঙ্গসন্ধির কর্তিত স্থানটি গরম ঘির মধ্যে ডুবিয়ে তাদের নিজেদের ভাগ্যের কাছে ফেলে রাখা হল। অঙ্গচ্ছেদের সময় কেউ মারা গেল না। চারজন মারা গেল ঠিক অঙ্গচ্ছেদের পরেই — যে বীভৎসতা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল সম্ভবতঃ তার থেকে নয়, বরং রোদ আর অবহেলা থেকে।[x]

এই ঘটনার উল্লেখ করে ক্যালকাটা ক্রনিকল মন্তব্য করেছেঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই (বীভৎস) ঘটনা ইংলন্ডের আইনের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি ("but we bless God, they are not authorised by the laws of England")। অঙ্গচ্ছেদের পর ডাকাতরা অথর্ব হত এবং তারা আর তাদের স্বস্থানে ফিরে যেতে পারত না। কলকাতায় ও তার চারপাশে তারা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে থেকে যেত। প্রায়ই দেখা যেত হাত-পা কাটা ভিক্ষুকের দল হামাগড়ি দিয়ে বা অনুরূপ প্রক্রিয়ায় শহরের ভেতর প্রবেশ করছে এবং ভিক্ষা করছে। এদের মধ্যে অনেকেই ডাকাতদলের হয়ে কাজ করত। যারা কিছুই করতে পারত না তারা শেষপর্যন্ত রাস্তায় মরে পড়ে থাকত। আঠার শতকের শেষদিকে কলকাতার রাস্তায় শববহনের একটি দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত। একটি বাঁশের দুদিকে নগ্ন একটি শবের হাত এবং পা বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নদীর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কখন কখন হয়ত দড়ি ছিঁড়ে সেই দেহটা মাটিতে পড়ে যেত। এমনিতেই শহরে মরা প্রাণীর ও জীবজন্তুর দেহ রাস্তাঘাটে ইতস্তত ছড়ান থাকত, শেয়াল ও শকুনে তা খেত। তার উপর আবার দিনের যে-কোন সময়ে মানুষের শব নিয়ে এই ঘুরে বেড়ান — এ একটা বীভৎস দৃষ্টিকটু ব্যাপার হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত বাঁশে ঝোলান মৃতদেহটি হল কোন ডাকাতের শব কিংবা এমন সব নিঃস্ব মানুষের শব যারা অনাহারে, অনটনে থেকে অবাঞ্ছিত জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি ভোগ করত। সমকালীন পত্রপত্রিকায় এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনেক আলোচনা, চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতায় ডাকাতির সমস্যা ইংরাজ শাসনের সময় থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ মন্তব্য করেছেন ১৮০২ সালে কলকাতার কোর্ট অফ সার্কিট ঃ

> The crime of dacoity has, I believe, increased greatly since the British administration of Justice and I know not that it has yet diminished.

একজন ইংরাজ বিচারক স্বীকার করেছেন যে ডাকাতরা এসেছে সমাজের ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয় ঃ

> But it is very well known that in many of the districts the banditti spring from the bosom of the community.

এর ফলে সারা দেশে ও কলকাতায় ডাকাতি বন্ধ করতে ইংরাজ শাসকরা নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরাজভক্ত বাঙালীরা কলকাতার ইতিহাস লিখতে বসে হাততালি দিয়েছিলেন হেস্টিংস-এর শাসনব্যবস্থাকে এই বলে যে তিনি নাকি দু বছরের মধ্যে সারা দেশে ডাকাতি উচ্ছেদ করেছিলেন। এ মন্তব্য করেছেন স্বয়ং রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব।[৫]

কলকাতায় বসে হেস্টিংস ডাকাতদের নাকি এমন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিলেন যে তাদের উৎপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৬] ইংরেজদের বশম্বদ রাজার কথা যে আদৌ ঠিক নয় তা উপরে উল্লিখিত লর্ড মিন্টোর বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি দলবদ্ধ ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। উনিশ শতকের আশির দশকে ভূপেন্দ্রনাথ বসুও ডাকাতি বৃদ্ধির কথা কবুল করেছেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকদ্বয় টমসন এবং গ্যারেট ত স্বীকার করলেন যে কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গের পেছনে একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি দমন।[৭] কলকাতায় ডাকাতি বৃদ্ধি হওয়ার একটি বড় কারণ হল পরিপার্শ্বের জঙ্গল ও জলাভূমির অবস্থান। কলকাতার ইতিহাস রচয়িতারা ত বলে থাকেন যে চোরবাগানের জঙ্গলে চোর-ডাকতের আস্তানা ছিল, তাই তার নাম চোরবাগান। বৈঠকখানার কাছে এখন যে গলিকে ফরডাইস লেন বলা হয় তাকে বলা হত 'গলা কাটা গলি'। এ জায়গাগুলি ছিল ডাকতদের আড্ডা।[৮]

আঠার শতকের শেষপর্যন্ত কলকাতায় বড় বা কোন ভাল রাস্তা ছিল না। পুলিসী ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত দুর্বল। সরকার জনগণকে নিরাপত্তা দিতে পারত না বলে একসময়ে কেল্লার ভেতরে তাদের বাড়িঘর করার অনুমতি দিয়েছিল।[৯] এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে শহরে চোর-ডাকাত ধরা পড়ত না। ধরা অবশ্যই পড়ত এ কথা বিদেশী পর্যটকরা স্বীকার করেছেন।[১০]

ধরা পড়লে কি হবে তাদের আটক রাখা হবে কোথায়? সরকারের কাছে এটি ছিল বড় সমস্যা। তখনকার দিনে কলকাতা শহরে কারাগার বলতে ছিল দুটি —— একটি লালবাজারে, আরেকটি বড়বাজারে। প্রথমটি সামান্য প্রশস্ত, দ্বিতীয়টি ঘিঞ্জি। কিন্তু দুর্ধর্ষ ডাকাতদের আটকে রাখার মত কোন ব্যবস্থা তখন কলকাতায় ছিল না। মোটের উপর পুলিশি নিরাপত্তা একেবারে ছিল না। একজন বিদেশীর ভাষায় ঃ

> So considerable a town ought to possess a vigilant police; but in this respect it is very defective.[১১]

কলকাতায় যে দুটি অঞ্চলে ডাকাতি বেশি ছিল তা হল শোভাবাজার ও বৈঠকখানা। শহরের সবচেয়ে কুখ্যাত গণিকালয় ছিল সেখানে এবং ইউরোপীয় নাবিকরা দল বেঁধে সেখানে ঘোরাফেরা করত। শোভাবাজার সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল এই ঃ

> The noted place of residence of the black ladies of pleasure.[১১]

বৈঠকখানায় ডাকাতির বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হল সেখানে ছিল ঘোড়ার জকিদের বাস, বণিকদের বৈঠক, বেনিয়ানদের আড্ডা। এখান থেকে সাহেবরা ও দেশীয় বাবুরা দমদমে শিকার করতে যেতেন। যাওয়ার সময় এখানে জকিদের ক্লাব ('Jockey Club') থেকে ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার নিয়ে যেতেন তারা। কলকাতার খেলোয়াড়রাও এখানে আড্ডা দিত। বৈঠকখানা আর শিয়ালদহের মাঝখানে ছিল কিছু খানাপিনার জায়গা। সবচেয়ে বড় কথা ব্যবসায়ীরা দলবেঁধে এখানে তাদের পণ্যদ্রব্য এনে জড়ো করত। ফলে এখানে যেমন অনেক টাকা-পয়সার আদান-প্রদান হত ঠিক তেমনি শিকারির দল ও খেলোয়াড়দের খানাপিনার মধ্য দিয়ে আমোদ-প্রমোদও চলত এখানে। বৈঠকখানা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এই রকম ঃ

> "Opposite Baitakhana, in the south corner of Sealda, is the site of the House which formed the Jockey Club and refreshment place of the Calcutta sportsmen. when in former days. they went tiger and boar hunting in the neighbourhood of Dum Dum."

বৈঠকখানা গাছের চারপাশে থাকলে ব্যবসায়ীরা নিরাপদ বোধ করত। এখানে একটি থানা ছিল। পরিপার্শ্বের জঙ্গলের মধ্যে ছিল ডাকাতদের বাস। ফলে ব্যবসায়ীরা এই স্থান থেকে সঙ্ঘবদ্ধ হত। এইখান থেকে বামাল তারা দলবদ্ধভাবে যাত্রা করত তাদের বিভিন্ন মালখানা, কারখানা ইত্যাদির দিকে। বৈঠকখানা গাছটির কথা এইভাবে বলা আছে ঃ

> "Here the merchants met to depart in bodies from Calcutta to protect each other from robbers in the neighbouring jungle. and here they dispersed when they arrived (at) Calcutta, with merchandise, for the factory."

বৈঠকখানা থেকে কিছু দূরে ছিল সিমলা। সেখানে ছিল ডাকাতদের আরেকটা বড় আড্ডা। সূর্যাস্তের পর সিমলার চারপাশে জঙ্গল দিয়ে কেউ যাতায়াত করত না। সিমলাতে ছিল বড় বড় তাঁতিদের বাস। শহরের ধনী ব্যক্তিদের কাপড় সেখানে বোনা হত। ফলে বড় বড় কাপড়ের আড়তও ছিল সেখানে। ডাকিতিও এই কারণে বেশি ছিল সেখানে। ১৮২৬ সালের সিমলার সম্বন্ধে যে বর্ণনা আমরা পাই তা এই রকম ঃ

> No native for love or money could be got to go this way after sunset. It was once the abode of the weavers, and the produce of their loom was used by the fashionable native gentry. The site of the Cornwallis Square and of the Circular Canal was long noted for the murders committed there.[১৩]

আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় সিমলাতে ছিল কিছু ধানক্ষেত ও জলাভূমি। আর চারপাশটা ঘিরে ছিল জঙ্গল। ডাকাতরা ঘাঁটি বেঁধেছিল এই জঙ্গলে। কলকাতা থেকে সে যুগে পূর্ববঙ্গের ঢাকা (কাপাশিয়া) অঞ্চলে যাওয়ার পথছিল দমদমের ভেতর দিয়ে। আরেকটি পথ ছিল লবণ হ্রদ দিয়ে। ফলে এ পথে মাল চলাচল করত প্রচুর। চলমান বণিকদের উপর ডাকাতরা যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এইটাই ছিল সে যুগে স্বাভাবিক। বৈঠকখানা থেকে সিমলা পর্যন্ত পথটা আদৌ নিরাপদ ছিল না।

এ সব অঞ্চলে আঠার শতকের শুরুতেও বড় বড় ডাকাতি হত। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে দেশীয় মানুষদের বসতিতে পর পর কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি হয়। তার আগের বছরই শহরের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য স্থির হয় যে পুলিসবাহিনীতে একজন প্রধান পিয়ন, পঁয়তাল্লিশজন সাধারণ পিয়ন, দুজন চোবদার এবং কুড়িজন গোয়ালা নিযুক্ত করা হবে। গোয়ালারা ছিল শক্তিশালী ভোজপুরী মানুষ। লম্বা-চওড়া দীর্ঘদেহী মানুষ বলে কখনো কখনো তাদের পাহারাদারের কাজে নিয়োগ করা হত। যাইহোক, কলকাতা কাউন্সিলের এই নির্দেশ কার্যকরী হতে না হতেই পরের বছর একগুচ্ছ ডাকাতি হল। তখন কর্তৃপক্ষ বিশেষ নির্দেশ দিলেন যে এরপর থেকে কোতোয়ালের হাত শক্ত করতে হবে — একজন কর্পোরাল ও ছয়জন সৈন্যকে কোতোয়ালের সঙ্গে মোতায়েন করতে হবে। কিন্তু এর দ্বারাও কলকাতায় ডাকাতি বন্ধ হল না। তখন আবার কলকাতা পুলিসের শক্তি বাড়ানোর জন্য স্থির হল যে আরও ৩১ জন পাইককে নিয়ে একটি সুসংগঠিত দল করতে হবে।

আঠার শতকে কলকাতার ডাকাতি নিয়ে আলোচনা করলে একটি ছবি স্পষ্ট হয় — ডাকাতির ক্ষেত্রগুলি ছিল সব 'ব্ল্যাকটাউন' বা দেশীয় মানুষদের বসতির চারপাশে। সাদা চামড়ার মানুষরা থাকতেন দক্ষিণে — কেল্লা থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সার্কুলার রোড-এর মাঝে পরিব্যাপ্ত স্থানে। সেখানে ডাকাতির প্রাদুর্ভাব ছিল কম। অথচ দেশীয় মহল্লার পূর্বে — যেমন বৈঠকখানা বা সিমলায় এবং পশ্চিমে — যেমন শোভাবাজারে — ডাকাতদের আড্ডা গড়ে উঠেছিল। সাহেবরা কলকাতার যে অঞ্চলে থাকত তাঁর সঙ্গে দেশীয় মানুষদের বসবাসের কলকাতার কোন যোগ ছিল না। শহরের এই দুই অংশের মধ্যে ছিল সাদা-কালোর ফারাক। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে তিরহুতের একজন নীলকর সাহেব উইলিয়াম হাগিনস (William Huggins) লিখেছিলেন যে শ্বেত মানুষ অধ্যুষিত শহর ছিল প্রাসাদের এলাকা — City of Palaces — আর তারই পাশে দেশীয় মানুষের শহর ছিল অন্য ছবি — a very different spectacle.

তিনি লিখেছেন :

> Take it all in all, perhaps no city in the world deserves to be called a mass of misery and magnificence more justly.[১৪]

কলকাতায় ডাকাতি ও পতিতাবৃত্তি দুই-ই আঠার শতকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে-কোন সমাজে ডাকাতি ও পতিতাবৃত্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে কারণ ডাকাতরা অনেক সময়েই নারীলোলুপ হয়। ডাকাতি নিয়ে গবেষণা করে জগৎবিখ্যাত হয়েছেন যিনি—এটি সেই হবসমেরই (Hobsbawm) বলা কথা :

> Since bandits are notoriously given to womanizing, and both pride and status require such demonstrations of virility, the most usual role of women in banditry is as lovers.[১৫]

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে এসেছিলেন একজন পর্যটক-নাবিক — অ্যাডমিরাল স্ট্যাভোরিনাস (Admiral Stavorinus)। তিনি দেশের নারীদের অবস্থা নিয়ে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে সার্বিকভাবে নৈতিকতার এমন অবনমন ঘটেছিল যে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে অনেক সময়ে লজ্জাবোধও থাকত না।[১৬]

পতিতাবৃত্তির স্থানগুলিও ছিল মূলত দেশীয় মানুষদের বসতির কাছাকাছি অর্থাৎ 'কালা শহরে' (Black Town)। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে পতিতাবৃত্তির সঙ্গে গভীর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ডাকাতিও বৃদ্ধি পেয়েছিল 'কালা শহরে' যদিচ ডাকাতি বৃদ্ধির অন্য কারণও গভীরভাবে চালু ছিল। কলকাতার অনুন্নত রাস্তাঘাট ও জঙ্গল ডাকাতি বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে মিসেস কিন্ডারলী (Kinderley)-র লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে ঃ

"বেলিয়াঘাটা হইতে চৌরঙ্গী পর্যন্ত ভূমিটি সে সময়ে জলাময় ছিল। স্থানে স্থানে দুই-একখানি বাঙ্গলা (Bunglow) ঘর দৃষ্ট হইত মাত্র। ঐ বাঙ্গালায় ইংরেজ ও শেঠ বসাকেরা বাস করিত। যাতায়াতের জন্য পাল্কীই একমাত্র যান ছিল। ডাকাইত ও হিংস্রক জন্তুর ভয়ে কেহই ঐ স্থানে দিয়া যাতায়াত করিতে সাহস করিত না। ইংরাজ কুঠির কর্ম্মচারীরা দলবদ্ধ হইয়া ঐ স্থানে যাতায়াত করিত।"

কলকাতার চারপাশের জঙ্গল শুধু রাস্তাঘাটের ও জনজীবনের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়নি, জনস্বাস্থ্যের হানিও ঘটিয়েছিল। তাই ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দের ১২ জুলাই কলকাতা কাউন্সিল কলকাতার চারপাশে বনজঙ্গল কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। কলকাতার জঙ্গলে মাঝে মাঝে বাঘের উৎপাতও ঘটত। কিন্তু ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্যের কারণেই জঙ্গল কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশটি ছিল এই রকম ঃ

> The Board being of opinion that clearing the town of all plantain trees, underwood or any other kind of jungle, would be greatly conducive to the healhiness of the town and of the inhabitants. Ordered that the Surveyor be directed immediately to cut down all that sort of growth throughout the town and within the limits of the Mahratta ditch.

ইতিমধ্যে অন্য কারণেও কলকাতার জঙ্গল কাটা হচ্ছিল। কলকাতায় তখন বাড়িঘর খুব হচ্ছিল এবং তার জন্য প্রয়োজন ছিল ইটের। ইট পোড়ানোর জন্য প্রয়োজন হত জ্বালানী কাঠের। সেই কাঠ সংগ্রহ করা হত বনজঙ্গল কেটে।

যদি বনজঙ্গল কাটাই হচ্ছিল তবে হেস্টিংসের শাসনকালে এত ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হল কেন? এর একটি কারণ নিশ্চয় এই যে আঠার শতকের মধ্যভাগ থেকে কলকাতায় দ্রব্যমূল্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ফলে শহরে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে খেটে-খাওয়া দিনমজুরদের অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটছিল। কলকাতায় তখন বিপুল পরিমাণ কুলি-মজুর শ্রেণীর লোকের ভিড় বাড়ছিল। তারা চারদিকে তাদের মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন করছিল। এদিকে পাঁচের দশকের শুরু থেকেই কলকাতায় নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। প্রতি দশকের শুরুতেই একবার করে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ

দেখা দিতে থাকে কলকাতায়। দলে দলে নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষ কলকাতার পথে পথে ঘুরতে থাকে। এর মধ্যে কলকাতায় মাদকদ্রব্য সেবন ও জুয়াখেলার প্রকাশতা বেড়ে যায়। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে জুয়ার আসক্তি বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর তাদের কাছ থেকে তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয়দের মধ্যে। ফলে সার্বিকভাবে একটি সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি সারা শহরে ফুটে উঠেছিল। কলকাতায় ডাকাতি একদিক থেকে এই সামাজিক অবক্ষয়ের ফল।

কলকাতায় ডাকাতির একটি অন্য দিক ছিল। এই সময় সারা বাংলাদেশে যে ডাকাতির প্রবণতা বেড়েছিল কলকাতায় ডাকাতি তারই অংশ। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সারা বাংলাদেশে সদ্য কায়েম হওয়া ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক গভীর প্রবণতা নানা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইংরাজ শোষণে মার খাওয়া মানুষ ইংরাজ শাসনকে পাল্টা মার দেওয়ার যে মানসিকতা দেখিয়েছিল তার একটি প্রকাশ ডাকাতি। গ্রাম বাংলায় এই সময়ে ইংরাজ সরকারের রাজস্ব লুঠ করা, ইংরাজ কুঠি বা কারখানায় হানা দিয়ে তাদের পণ্য লুঠ করা, ইত্যাদি ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুযোগ বুঝে স্থানে স্থানে ইংরাজদের হত্যাও করছিল ডাকাতরা। এই ডাকাত দলের মধ্যে সন্ন্যাসী-ফকির ছিল, জমিদারের আমলারা ছিল, গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া কৃষকরা ছিল, জীবিকাচ্যুত সৈনিকরা ছিল, সর্বস্বান্ত হওয়া ঠিকাদার ও নষ্টবিত্ত জমিদাররা ছিল, আর ছিল অসংখ্য পাইক-পেয়াদা, মাঝি-মল্লা, শ্রমিক, খেতমজুর ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। অতএব ইংরাজ যুগের শুরুতে ডাকাত বলতে আইনের শাসনের বাইরে, সমাজবিরোধী, অপরাধ জগতের স্থায়ী বাসিন্দাদেরই যে বোঝাত তা নয়। একটি বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে সে যুগের ডাকাতদের বিচার করতে হবে। উপর থেকে নেমে আসা বিদেশী শাসনের প্রারম্ভিক পর্বের হৃদয়হীন অত্যাচারের মধ্যে যে সন্ত্রাস ক্রমশ সমাজ শরীরে ঘনীভূত হচ্ছিল তার মোকাবিলা করার জন্য সমাজের ভেতর থেকে ছিন্নমূল মানুষের বদ্ধমুষ্টি-দৃঢ়তাও এক নতুন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশে ইংরাজ শাসনের সূচনা পর্বে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে নেমে আসা সন্ত্রাসকে রুখে দেওয়ার জন্য সমাজের তৃণমূল থেকে উঠে আসা জনতার রুদ্ররোষ আরেক সন্ত্রাসের রূপ নিয়েছিল। ডাকাতি একদিক থেকে এই সন্ত্রাসের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকমাত্র।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজরা বাংলাদেশে যে সমস্ত জিনিস নিয়ে বেশি ব্যবসা-বাণিজ্য করত তার মধ্যে অন্যতম প্রধান পণ্যটি হল বস্ত্র। ফলে দেখা গেছে ইংরাজদের যে কুঠি বা কারখানায় কাপড় বোনা হত এবং কাপড় মজুত করা হত সেইসব কারখানায় বা কুঠিতে ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। এমনিতেই ইংরাজরা তাঁতিদের উপর যে অত্যাচার করছিল তাতে তাঁতিরাও মারমুখী হয়ে উঠেছিল। সমাজের এই রকম একটি প্রতিবাদী মানসিকতার সুযোগ নিয়ে দেশে ডাকাতি বাড়ছিল। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্মীপুরের ইংরেজ কারখানায় ডাকাতির খবর নবাব-বাহাদুর মীর কাশিমকে জানাতে গিয়ে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার জানালেন যে সেখানে ডাকাতরা কোম্পানীর সঙ্গে জড়িত তাঁতিদের ঘরবাড়ি লুঠ করছে। যে রিপোর্ট কোম্পানীর তরক থেকে নবাব-বাহাদুরের কাছে পেশ করা হয়েছিল তা ছিল এই রকম :

> At this time Mr. Billers, Chief of Luckypore Factory, is arrived here, and has informed that Pergunnahs about Luckypore for want of capable commanders are ruined, that thieves and robbers

> and wicked men commit every violent act of thievings, &c that to this pitch it is now arrived that they come to the houses of the weavers. who have concerns with the Company and inhabitants, break into their homes and plunder them.[১১]

শুধু লক্ষ্মীপুরেই নয়, মালদহতেও কোম্পানীর কারখানা লুট করা হয়েছিল এবং তখন সে কারখানার প্রধান চার্লস গ্রান্ট তদন্ত করিয়ে দেখেছিলেন যে আঞ্চলিক জমিদাররাও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতাতেও ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাঁতি বসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। এমনিতেই সূতানুটী অঞ্চলে তাঁতিদের বসতি ছিল অনেকদিন আগে থেকেই। এখানে শেঠ-বসাকরা প্রধানত কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংরাজরা ক্ষমতায় আসার পর কলকাতায় কাপড়ের আদান-প্রদান খুব বাড়ছিল। বৈঠকখানা অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা কাপড় এনে মজুত করত। সেখান থেকে মাল গাঁঠরি বেঁধে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। এইখানেই বেনিয়ান নামক পুঁজিপতি দালালরা তাদের দপ্তর চালাত। ফলে কাপড়ের আড়ত, টাকা-পয়সা লেনদেনের কাছারি, ব্যবসায়ীদের আড্ডা—এ সবের ফলে বৈঠকখানা অঞ্চল সে যুগে জমজমাট ছিল। কোম্পানী ও তার সঙ্গে জড়িত ব্যবসাদারদের আড়তে ডাকাতি করা ছিল সে যুগের একটি বড় ঘটনা, যেমন বড় ঘটনা ছিল সুযোগ পেলে ইংরাজদের হত্যা করা বা ইংরাজ কোম্পানীর রাজস্ব লুঠ করা। এই সময়ে ডাকাতি সম্বন্ধে যে কথাটি লক্ষণীয় তা হল এই যে কলকাতায় যারা ডাকাতি করত তারা দল বেঁধে ডাকাতি করত — বিশ, পঁচিশ, তিরিশজনের দল ডাকাতি করার জন্য ঘুরে বেড়াত। গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি সংখ্যায় ডাকাত দলবদ্ধ হত। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনশ চারশজন মানুষ দলবদ্ধ হয়ে ডাকাতি করত। ইংরাজ দলিলে robber, bandit, dacoit ইত্যাদি শব্দের দ্বারা এইসব দলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এরা কি সত্যি ডাকাত? অন্তত আজকের সমাজতত্ত্বে যাকে আমরা ডাকাত বলি এরা সেই রকম ডাকাত কিনা বলা কঠিন। যামিনীমোহন ঘোষ তার *The Sanyasi and Fakir Raiders of Bengal* গ্রন্থে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহকে বিহার ও বাংলার বাইরে থেকে আসা ভোজপুরী ও নাগা দস্যু-ডাকাতদের আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর *Dawn of New India* গ্রন্থে এ রকমের একটি মতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু তাঁর দ্বারা ত আর এরা প্রকৃত দস্যু-ডাকাতে পরিণত হচ্ছে না। ব্রিটিশ শাসনে উৎখাত হয়ে যাওয়া ছিন্নমূল বুভুক্ষু মানুষ যখন বিপুল সংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে জীবিকা অর্জনের এই সর্বশেষ ও চরম উপায়টি গ্রহণ করে তখন তা সমাজের নিম্নবর্গের সমবেত শক্তিতে যূথবদ্ধ জীবিকা-নির্বাহের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতায় ও গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি যে সবসময়ে সঙ্ঘবদ্ধ সন্ত্রাসের রূপ ধরে ব্রিটিশ শাসনের দৌরাত্ম্যকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই। তবে বেশির ভাগ সময়ে যখন ক্ষয়িষ্ণু নিম্নবর্গের মানুষ বিপুলভাবে দলবদ্ধ হয়ে ডাকাতি করতে যেত তখন তারা সঙ্ঘশক্তিকে কাজে লাগাত আত্মসংরক্ষণের তাগিদে। আর সঙ্ঘশক্তি যখন সমাজসন্ত্রাসের রূপ নিত তখন পরস্বাপহারী উদ্ধত বিদেশী শক্তির কাছে পরাভূত মানুষের লাঞ্ছিত আত্মচেতনা যে গর্জে উঠত না, তা কে বলতে পারে?

পাঠটীকা

(১) They had established terrorism as perfect as that which was the foundation of the French republican power, and in truth the sirdars, or captains of the band, were esteemed and even called the hakim or ruling power, while the real Government did not possess either authority or influence enough to obtain from the people the smallest aids towards their own protection.[১]

Thompson and Garratt, *The Rise and Fulfilment of the British Rule in India.*

(২) In the times of Hasting and Francis, and for a long time after, dacoity. and highway robbery close to the seat of Government were crimes exceedingly prevalent.

Busteed, *Echoes From Old Calcutta,* 4th edn., pp. 164-165.

(৩) The native inhabitants on the roads leading to the Boitakhana tree are in such general alarm of decoits that from eight or nine o'clock at night they begin to fire off matchlock guns till day break at interval. The dacoits parade openly on the different roads about Calcutta in parties of twenty, thirty or forty at so early an hour as eight p.m.

তদেব।

(৪) None died under the operation. Four died soon after, but more (it is said) from the effects of the sun and neglect than from the savage severity which was applied.

Busteed, *op. cit.*, p. 158.

(৫) Bands of robbers wandered over the face of the country, setting the resistance of a wretched police at defiance, while proverty and sickness, the results of a terrible famine, appeared to paralyse the exertion of the scanty population that remained...Within the limited space of two years Mr. Hastings entirely reversed this picture. From the outrages of dacoits (robbers), and sånnyasis, and other marauders, the Provinces were gradually delivered.

Raja Binaya Krishna Deb, *The Early History and Growth of Calcutta,* p. 146.

(৬) He hunted them down wherever they showed themselves, and in the end they ceased to be troublesome.

তদেব।

(৭) The prevalence of dacoity was one of the main arguments used

in favour of the Partition of Bengal, and the revival of political dacoities during recent years shows how strong is the tradition.

Thompson and Garratt, *op. cit.* p. 196.

(৮) Chore-bagan was so named from the fact of its dense jungle affording a place of hiding to thieves.

Murders were common and one of the roads of the quarter—Fordyce's Lane—is still known by its old name of Galakata gully.

A. K. Roy, *A Short History of Calcutta*, p. 152 & 200.

(৯) Permission has likewise been given to every inhabitant of Calcutta. to build if he choose it, a house in the fort...

P. Thankappan Nair. *Calcutta in the Eighteenth Century*, p. 163.

(১০) Those who disturb the public tranquility are indeed apprehended...

P. Thankappan Nair, *op. cit.* p. 231.

(১১) তদেব।

(১২) S. Dasgupta ed. *Echoes From Old Calcutta*, p. 85.

(১৩) Raja Binaya Krishna Deb, *op. cit.* p. 252.

(১৪) Ketaks Kushari Dyson. *A various Universe*. p. 219.

(১৫) E. J. Hobshawn, *Bandits*, p. 135.

(১৬) Prostitution is not thought a disgrace; there are everywhere licensed places, where a great number of loose women are kept; it is a livlihood that is allowed by law...

P. Thankappan Nair, *op. cit.* pp. 160-161.

(১৬ক) (নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত প্রাচীন কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত বিহারীলাল আঢ্য রচিত 'কালীঘাটের ইতিবৃত্ত'। পৃঃ ৮১)

(১৭) Long, *Selections From Unpublished Records of Government*. No. 557.

1. Understanding Indian History
2. Metamorphosis of the Bengal Polity 1700-1793 [Published by Rabindra Bharati University]
3. Economics of Revenue Maximization 1757-1793
4. Social Banditry in Bengal : A Study in Primary Resistance
5. New Elite and New Collaboration
6. The Twin in the Twist : Bose and Gandhi
7. Calcutta in the Eighteenth Century, Vol. I
8. স্বদেশ ও সমকাল
9. আবহমান ভারত
10. মহাবিদ্রোহ ও ভারতীয় উদাসীনতা (সহলেখক ডঃ স্নিগ্ধা সেন)
11. ভাবিত পুরুষ ও অ-ভাবিত নারী ঃ নারী প্রশ্নের সেকাল ও একাল
12. The Captive Lady (যন্ত্রস্থ)
13. The Stagnating City : Calcutta in the Eightenth Century [Barpujari Endowment Lecture delivered at the Institute of Historical Studies Kolkata]
14. Swadesh O Savyata (Motherland & Civilization in Bengali)
15. Caste, Class and the Raj [Co-author Dr. Snigdha Sen]
16. লুপ্তশতক (যন্ত্রস্থ)
17. Property Aristocray and the Raj [A Visvabharati Publication]
18. বাংলার রাজস্ব শাসন ঃ ১৮ শতক